দিনে দিনে
নতুন রেক্সোনার
পরশে ত্বকে নবীন
লাবণ্য আসে

Rexona

আধুনিক পরিবারে প্রতিদিন সার্ফ...
'নতুনকে পরখের আনন্দ'...
বাঙালী গৃহিণী শ্রীমতী নন্দিতা রায় বলেন
"...এই সার্ফের কথাই বলব, নতুন নতুন এলো, ব্যবহার করে তবেই না বুঝলাম এর কত গুণ। এখন আমি বাড়ীর সব কাপড়জামা সার্ফে কাচি।" শ্রীমতী রায় সময় করে নতুন জিনিষ কিনে তার পরখ নিতে ভালবাসেন। তিনি বলেন, "সত্যিই সার্ফের তুলনা হয় না। এতে কাচাও কত সহজ। আর কাপড়ও কত ধবধবে ফরসা হয়।"
Surf
সার্ফে কাপড়জামা
সবচেয়ে ফরসা করে কাচে
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সূচীপত্র

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩১ : সংখ্যা ৪
কার্তিক, ১৮৮৩ : ১৩৬৮

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

অশোককুমার দত্ত

শ্রদ্ধাভাজন রাজশেখর বসু যাকে "পরিপূর্ণ সাহিত্য" বলেছেন আমাদের এতো গৌরবের ভাষা বাংলা আজো তা দাবি করতে পারে নি। কবিতা উপন্যাস বা গল্প সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মোটেই অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু শুধুমাত্র রস সৃষ্টির প্রতিভা তাকে পূর্ণরূপ দেয় না। সাহিত্য কথাটার মধ্যে যে একটা সহিতত্ব বোধ আছে, আমাদের দেশের বিজ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যার কর্মীদের সাথে সে যোগ বড় ক্ষীণ। যে কোনো বছরের বাংলা বইয়ের তালিকা বিশ্লেষণ করলেই হিসাবটা আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত মোট ২২৫০টি বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ বিদ্যার আলোচনা ছিল মাত্র ১৬৫টিতে, শতকরা হিসাবে এ হল মাত্র ৭·৩ ভাগ (তুলনীয়: জর্মান বা ফরাসী ভাষায় প্রায় ২০ ভাগ)। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পরিচিত সমস্যাটি হল পরিভাষা, অর্থাৎ যে শব্দ বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রে এসে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে এবং সে অর্থ সহসা বিকৃত বা পরিবর্তিত হবে না। যে বিজ্ঞান আমাদের ভাষার কাছে এতদিন প্রায় অপরিচিত ছিল তার আলোচনায় আমরা যে উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করব এতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু শুধু সমস্যার কথা ভেবে যদি নিষ্ক্রিয় থাকি, তাবা তার সৃষ্টির কাজ সংগ্রহের কাজ চালাতে পারে না। আজকের এই বাংলা ভাষাও তার প্রাথমিক অবস্থায় বিপুল শব্দ সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয় নি, কিন্তু নদী যেমন আপন প্রয়োজনে বেগকে সঞ্চিত করে ক্রমশ বিস্তৃত হয়, ভাষাও তেমনি বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনে আপন শব্দকে

আহরণ করেছে, আবার বাতিলও করেছে—এভাবে নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব এক ভঙ্গি গড়ে ওঠে। আজকের যুগের বিশেষ প্রয়োজনের চাপে পড়ে বিজ্ঞানাশ্রয়ী বাংলা ভাষাকে আবার তেমনি নতুন করে তৈরি হতে হবে। এজন্য সবচেয়ে আগে দরকার বিজ্ঞান-অভিজ্ঞ লেখকদের দ্বারা ভাষা অনুশীলন। যারা তাঁদের বিষয়কে জানেন এবং সাধারণ লোকের জন্য তা প্রকাশ করতেও পারেন, এমন লোকের সংখ্যা মণিকাঞ্চনযোগের মতোই দুর্লভ। অতীতে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে আমরা এ যোগাযোগ লক্ষ্য করেছিলাম। দুঃখের বিষয় সে ধারা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নি। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রমই। প্রারম্ভের ক্ষীণ ধারা যে ভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সেভাবে প্রসারিত হয় নি। ক্রমাগত বিদেশী ভাষার অনুশীলনে বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের 'ছোট' মনোভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক, তাছাড়া মাতৃভাষায় লেখা বইয়ের শেষ পর্যন্ত যে কি গতি হবে তা ভেবেও অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। সরকারী পোষকতার ফলে হিন্দীভাষা এই মনোভাব জয় করেছে। আমরা যে ভাষাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলি সেই হিন্দীতেই ১৯৫৮ সালে মোট ৪০৮টি বিজ্ঞানের বই (শতকরা হিসাবে ১০৮ ভাগ) প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য কৃতিত্ব শুধু পরিসংখ্যান বিচার করে না। কিন্তু অধিক সংখ্যায় এই পুস্তক প্রকাশের নিশ্চয় একটা ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশের দিকে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

হিন্দীভাষী ডঃ রঘুবীরের মতো এখানেও অনেকে আছেন যাঁরা প্রতিটি বিদেশী কথার বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজেন। ডঃ রঘুবীর প্রবল 'বিক্রমে' রামায়ণ তুল্য পরিভাষা কোষ রচনা করেছেন, কিন্তু অসংখ্য "রাবণ সৈন্য"-র কয়টিকে তিনি হিন্দীভাষার "শরে" আবদ্ধ করতে পারেন। বিজ্ঞানের যেমন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংখ্যাও তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য পদার্থবিদ্যা (health physics) কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানের এক অকল্পনীয় বিষয় ছিল, আজ কিন্তু তা পরমাণু বিজ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে ভূ-পদার্থবিদ্যা (geo-physics) বা ইলেকট্রনিক্‌স-এর তত্ত্বগুলি আরম্ভের পর্যায়ে ছিল মাত্র, কয়েক বছরের ব্যবধানেই আজ তা এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যে কোনো শব্দকোষে এদের নিয়ে বেশ কয়েক হাজার নূতন পরিভাষার খোঁজ পাওয়া

যায়। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই এভাবে প্রসারিত হচ্ছে। বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যে দ্রুত পরিবর্তন তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া তথাকথিত আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির পক্ষেও সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বাধুনিক গবেষণার কথা জানার জন্য উন্নত ভাষাগুলি আজ তাই দ্রুত অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিচ্ছে। উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা অনুশীলন অনেকদিন থেকেই চালু হয়েছিল, আজ এই প্রয়োজন অত্যাবশ্যকরূপে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী বৈজ্ঞানিক ভাষা অনুশীলনের ফল যখন এই তখন এ সমস্ত আলোচনায় অনভ্যস্ত ভারতীয় ভাষাগুলির অপ্রস্তুত দিকটা আমাদের বিবেচনা করতে হয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি তার অনুপূরকরূপে ইংরেজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার চর্চাও আমরা পুরোপুরি বাদ দিতে পারি না। এমন অবস্থায় অনেকে বিদেশী পরিভাষাকে বাংলা হরফে প্রচারের পরামর্শ দিয়েছেন। যোগ্য লেখক যদি ভাষার গ্রহণ ক্ষমতাকে বাড়াতে পারেন তাহলে আজকের প্রচলিত অনেক বিদেশী শব্দের মত এই পরিভাষাগুলিও আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ক্রমাগত চর্চার ফলে কারখানায় ইংরেজী না-জানা শ্রমিকেরাও আজ বলেন—ক্রেন, লেদ, সিমেন্ট, বীম, রড, গিয়ার (gear), মোটর, পাইপ, হ্যাণ্ডেল, ইঞ্জিন, টাইম, আন্-লোড (un-load), প্রডাকশন ইত্যাদি। আমাদের অনেকে আজো রসায়ন শাস্ত্রের মানে ধরতে পারি না কিন্তু 'ক্যামিস্ট্রি' বললে অনায়াসে বুঝে নি। 'ক্যালকুলাস'-এর বাংলা যে ব্যবকলন কথাটা অনেকে বোধহয় এই প্রথম শুনলেন। ভাষা-পণ্ডিতদের বিতর্কের অপেক্ষা না রেখে অনেক বিদেশী পরিভাষা আমাদের ঘরোয়া গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে, এতদিন পরে তাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা তীরের বালুকণা থেকে নদীর জলকে বিশুদ্ধ করার মতোই হাস্যকর হবে।

বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির ব্যাপকতার দিক দেখে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম, উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবসময়ই আমাদের বিদেশী ভাষার সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য হোক, কিন্তু তার আগে বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলিকে সহজ করে সাধারণ করে দেশের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। এ কাজ ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে, কিন্তু পরিভাষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো

নির্দিষ্ট মতধারা অনুসরণ সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে আগে থেকেই ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না, কাজের মধ্য দিয়েই সমস্ত ধারণা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটুকু বুঝতে কারো কষ্ট হয় না, ছোট ছোট বিদেশী কথা সহজেই ভাষার মধ্যে চলে আসে। আবার উদাহরণ দিই—এটম, আয়ন, নিয়ন, প্রোটন, ভোল্ট, গ্রিড ইত্যাদি। রাসায়নিক জিনিষের নাম (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সুপারফসফেট ইত্যাদি), ওষুধের নাম (এনাসিন, প্যারামাইসিটিন, দালাজল, এনট্রোকুইনল ইত্যাদি), বাণিজ্যিক নাম (trade name—পেট্রল, ভেটল, সুলেখা কালির 'এম-সন্' ইত্যাদি) মানুষের নামের মতোই সরাসরি ভাষায় ব্যবহার হবে। কারো নাম যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয় স্বজাতীয় করার চেষ্টায় তাঁকে 'চু চেন-তাং' বলতে যাওয়া জটিলতাই বাড়িয়ে তোলে মাত্র। গাছপালা ও জীবজন্তুর নাম বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা মেনে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আছে (যে কারণে জলকে রসায়ন বিদ্যায় হাইড্রোজেন মনোক্সাইড এবং সাধারণ লবণকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয়)। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এ সমস্ত দুরূহ নাম প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দুস্তর বাধা, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান চর্চার উন্নততর ও প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যেতে পারে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তরুলতাকে Ipomoea quamoclit বা পটলকে Trichosanthes Dioica বলার প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু ছাত্র যদি জীব ও উদ্ভিদ বিদ্যায় অগ্রসর হতে চান বিজ্ঞান অনুমোদিত নামগুলিই ক্রমে জেনে নিতে হবে। আমাদের ভাষার কাছে পরিচিত বলেই এ সমস্ত দেশী নাম ব্যবহারে আমাদের আপত্তি থাকে নি, কিন্তু শব্দ পণ্ডিতদের তৈরি রাসায়নিক জিনিষের কৃত্রিম পরিভাষা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করবে মাত্র। এ কথা ভুললে চলবে না যে এই সমস্ত পরিভাষা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর দ্বারা নানা বিচারের পর রচিত হয়েছিল। 'স্বজাতীয়করণ'-এর মোহে তা যদি আমরা না মেনে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে যাই ভাষা তা গ্রহণ করতে চাইবে না। নেপথলিনকে যাঁরা 'উৎক্লেলনীল' বা নাইট্রিক এসিডকে 'কূষিক অম্ল' বলতে চান জাপান তাঁদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হোক। অ্যামোনিয়াম সালফেটের পরিভাষা না খুঁজে দেশের মাটিতে তা তৈরি করতে যাওয়া আজকের এবং আগামীকালের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

পরিভাষা সৃষ্টিই বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান সমস্যা নয়, ভাষার মাধ্যমে তা লোকের বোধগম্য করে তোলাই হচ্ছে আসল কাজ। পেট্রোলিয়ামকে 'খনিতৈল' বা Induction Coil-এর বাংলা 'আবেশ কুণ্ডলী' লিখে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি কিন্তু তাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয় না। পরিভাষা যাদের পক্ষে সমস্যা নয় সে সব ভাষাতেও এই বোঝানোর অসুবিধা রয়েছে। ইংরেজী Resistance-এর আক্ষরিক প্রতিশব্দ রোধ বা বাধা, বিদ্যুৎ বিজ্ঞানে তা বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেছে—'বিদ্যুৎ প্রবাহের যে বাধা উত্তাপ সৃষ্টি করে।' Energy-এর মানে আমরা 'শক্তি' বলতে পারি, Power-এর বাংলা হয়েছে 'ক্ষমতা'। কিন্তু এর দ্বারা Energy এবং Power-এর মূল প্রভেদটা প্রতীয়মান হয় না। একটি পরিমাণগত এবং অপরটি সময়নির্ভর পরিমাপ। Basic English-এর অনুকরণে ডব্লু. ই. ফ্লুড নামে এক ব্যক্তি অগণিত ইংরেজী পরিভাষা থেকে মাত্র ২০১২টি শব্দ নিয়ে লোকবিজ্ঞানের একটি পরিমিত শব্দকোষ (Consolidated Popular Science Vocabular) রচনা করেছিলেন, কিন্তু এই বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞজন তা অনুমোদন করেন নি। কম্যুনিকেশন জিনিষটা এককভাবে পরিভাষার উপর নির্ভর করছে না, শব্দের সঙ্গে শব্দ যোগ করে লেখক যে মোট প্রতিফলটি রচনা করেন মূলত তাকেই তা আশ্রয় করে থাকে। আলো কথাটার মানে তো আমাদের জানা ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে তা আরো ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছে। আমাদের পরিচিত অনেক কথার মধ্যেই বিজ্ঞান এভাবে নূতন তাৎপর্য যোগ করেছে—পরিভাষার লক্ষণই হল তাই, কিন্তু আমরা অনেক সময় এ বিষয়ে সচেতন থাকি না। বিদেশী অপরিচিত পরিভাষা একদিকে আমাদের চিন্তা করার এক বাড়তি সুযোগ এনে দেয়। আলো-কে 'লাইট' বলতে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে আরো উদার উন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিতে হবে। 'সল্ট'-এর পরিভাষা আমরা অনায়াসেই লবণ বলতে পারি, 'লাইম'-এর মানে এতদিন চুণ জেনে এসেছি—বিজ্ঞানের বইতেও তাই বলব, 'কুইক লাইম'-এর পরিভাষা পাথুরে চুণ বা কড়া চুণ পল্লীবাসীর মুখেও শোনা যায়, সুতরাং প্রাথমিক জ্ঞানের খাতিরে তাও মেনে নিলাম। এভাবে অনেক পরিভাষা আমাদের মধ্যে সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথা আমাদের ভাষার কাছে একদিন অপরিচিত ছিল শব্দ-পণ্ডিতদের কারখানায় সৃষ্ট তাদের

"ভারতীয়" পরিভাষা বেশী প্রভায় নিস্প্র বলেই শুধু মেনে নেওয়া দেশের লোকের পক্ষে সহজ হবে না। এক সময় সোনা রূপা তামা ইত্যাদি নানা ধাতু বিভিন্ন চিত্র এঁকে চিহ্নিত করা হত, ১৮১১ সালে বারজেলিয়াস সোমান হরফের দ্বারা তা নির্দিষ্ট করার কৌশল আবিষ্কার করেন। সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো রসায়নবিদ্যার এই সাংকেতিক লিপি সমস্ত বিষয়টিকে যে কত নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করেছে বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রও তা অনুভব করেন। অভারতীয় লিপির দোহাই দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনার ফল থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। সাংকেত লিপির মধ্যে থাকে যে চিত্রধর্মিতা তা ভাষা নিরপেক্ষ। ইংরেজীতে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনায় আলফা, বিটা, গামা, ডেলটা ইত্যাদি গ্রীকলিপিগুলি অবাধে দ্বিধায় ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের ভাষাতেও নিশ্চয়ই তার আপত্তি থাকবে না। জ্যামিতিক শাস্ত্রে কোণ ত্রিভুজ বৃত্ত ইত্যাদি নানা চিত্রলিপির সঙ্গে আমরা পরিচিত থাকি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও তেমনি বিচিত্র প্রয়োগচিহ্ন রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত এ সমস্ত সংকেত বাংলা ভাষাও স্বীকার করে নেবে। গণিতের দশটি অঙ্কের আবিষ্কার এই ভারতভূমিতে হলেও স্কুলপাঠ্য বইতে এখন 1, 2, 3 ইত্যাদি আন্তর্জাতিক লিপিই মেনে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শুধু এ কারণেই যদি কোনো ছাত্র অঙ্ক ভুল যাওয়ার অনুযোগ দিয়ে থাকে বুঝতে হবে তার শিক্ষার মূলেই গলদ রয়ে গেছে।

রকেটের যুগে এসে পৃথিবীর সীমানাটাই আজ বেড়ে গেছে। বিজ্ঞান ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানের এই অতি উন্নতির যুগে আমরা একদিকে যেমন নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি, সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় তার আলোচনার ক্ষেত্র রচনার জন্য নূতন নূতন শব্দ অনেক গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান আমাদের ডাক দিয়েছে—পরিভাষাকে ভাষার পরিপন্থী হিসাবে নয়, যুগের প্রয়োজনে পড়ে ভাষার পরিধিকেই আবার বাড়িয়ে তুলতে হবে।

কে যেন হাওয়ায়

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কে যেন হাওয়ায় বাজিয়ে দিল সমুদ্র।
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম
আমি খান্-খান্ হয়ে ছড়িয়ে গেছি।
শুধু ভাঙা-গড়ার শব্দ
আমার অস্তিত্বের চারদিকে।

থোঁড়াতে-থোঁড়াতে যে আলোটা
এতক্ষণে অন্ধকার
গালে হাত দিয়ে যে ভাবনাগুলো অন্যমনস্ক
তারা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

তোমরা ভাখো—আমি এসেছি
শোনো আমি শব্দ করে কিছু ভাঙছি এবং গড়ছি
তারপর মনে করো আমিই দু'হাতে
হাওয়ায় বাজিয়ে দিচ্ছি সমুদ্র।

ফেরাবে কি মুখ

বিষ্ণু দে

আহা, হালকা দীপ্ত চোখের দৃপ্ত মায়া
আসবে কি তাতে দীঘির সে গভীরতা,
দীর্ঘ দুঃখস্নিগ্ধ চোখের ছায়া ?
হালকা ঝড়েই উড়বে কি ঝরাপাতা !

ভাসন্ত মেঘ থামবে কি তার পথে
ফেরাবে কি মুখ তপ্ত মরুর দিকে—
দীপ্ত আকাশ দুঃখের কালি মেখে
পৃথিবীর হয়ে চাইবে কি বৃষ্টিকে ?

সমর্পণে

রণধীর মিত্র

তুমি বলেছিলে
পাহাড়ের ওপারে তোমার স্বপ্ন
যেখানে এক একটা ক্লান্ত দিন
বুদ্বুদ হয়ে মিলিয়ে যায়

পথের ধারে সারাবেলা
জ্বলছিল কত উৎসবের চিতা
তবু কোনো স্ফুলিঙ্গ
আমাকে স্পর্শ করেনি

(আমার যে রক্তাক্ত বন্ধুরা
আজকের সূর্যাস্ত দেখল না
তাদের হৃদয় আমি
তোমাকেই উৎসর্গ করলাম)

পাহাড়ের চূড়ায় এখন
পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকার
তুমি বলেছিলে
তার পরেই তোমার রূপকথা

সেখানে পৌঁছব বলে
আমি নক্ষত্রের আলো এনেছিলাম
কিন্তু তা কুয়াশা হয়ে
ছড়িয়ে গেল।

একটি শব্দের জন্ম

শ্যামসুন্দর দে

অন্ধকারের আড়ালে রাত্রি
বিবর্ণ আকাশে তারকার নৈঃশব্দ্য
আর মাটির গভীরে কত মুখরতা
সূর্যের সকাল গোপে
যন্ত্রণায়।

বালিয়াড়ির নীচে দাঁড়িয়ে—
প্রবাহিত সামুদ্রিক বাতাস
তুষারের কোন্ কথার কানাকানি
নিসর্গের নীরবতায় তাই শুনি।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে—
রাত্রির প্রহর ভেঙে ভেঙে
একটা জন্মের সকালের আকুলতা।

সময়ের স্রোত বয়ে গেল
বন্ধ্যা মুহূর্ত শুধু যন্ত্রণা
পরিক্রমা
তবুও তারার ঘোষণা।

পৃথিবীর গর্ভে কত অবগুণ্ঠিত প্রত্যয়
মাটির গন্ধে বেঁচে আছে
আর সেই ভ্রূণ বাসনা
জন্মের সকালের দিকে চেয়ে আছে।

আচ্ছন্ন অন্ধকারের প্রহরে দাঁড়িয়ে
সমস্ত ভয়ের মুহূর্ত পার করে বলি
জয় হোক !
জয় হোক জীবনের আকুলতায়

সেই তরঙ্গিত শব্দ
ব্যাপ্ত হল একটি গ্রহের পরিমণ্ডলে।

সেইসব দুঃখ

রণজিৎ সিংহ

সন্ধেবেলার ঠাণ্ডা আকাশের নিচে শুয়ে আমরা তারা দেখতাম। মা গল্প বলত।

ছেলেবেলায় পশুশালায় ঘোড়ার হ্রেষায় হাতির বৃংহনে ঘুম ভাঙত। চোখ মেলে দেখত রাঙা রোদ খেলছে সাতমহলার চুড়োয়। সেই ঠাট বজায় রাখার লড়াইয়ে বেদোরস্ত কয়েক পরগণায় আগুন ধরিয়ে দাদামশায় ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন। তারপর টাটি-মরাইয়ের ঘরে পালটা দিন কাটে।

গল্পের ঘোরে আকাশের তারা কখনো অবিশ্বাসে ঠিকরে উঠত কখনো ঝাপসা হ'ত।

আমাদের কৌতূহলে তাল রেখে মা আবার কোনোদিন গল্প বলত। তার রঙ আলাদা। পাড়া-পড়শির রঙ্গ-আমোদের গল্প, পরবের খুশির গল্প। আমাদের তাজা টগবগে রক্তে সাহসী আর লড়ুয়ে জোয়ানদের কথা জোয়ার ডাকত। হৃৎপিণ্ড থেমে যেত যখন শুনতাম, এক মা জমির দাঙ্গায়, সর্বনাশের তাণ্ডবে, সাত ছেলেকে টাঙ্গি বল্লম তুলে দিয়ে পিঠ ঠুকে দিয়েছিল।

এদিকে আন্‌কথার তোড়ে অনেক দূর ভেসে গেলে আমাদের হুঁশ হ'ত। জিগ্যেস করতাম, মা তোমার সেই আপন দুঃখ-দিনের গল্প?

রাতপহর থমথম করত আগ্রহে। মা অনেক ক'রে আমাদের মন ফেরাত; আমরা আকাশে চোখ রেখে তারার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আজ যা সবচেয়ে মনে পড়তে চায় সে গল্প মা কোনোদিন বলে নি।

অন্ত্য প্রহর

বীরেন্দ্র নিয়োগী

ঘুম ভাঙতেই টেবল-ক্যালেণ্ডারের ওপর চোখ গিয়ে পড়ল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ঘোলানো ভাবে শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আজ সাতাশে!

আড়মোড়া ভেঙে উঠতে গিয়েও আবার পাশ ফিরে শুলেন মিঃ চ্যাটার্জী। কি হবে এত সকাল সকাল উঠে! কেবল ভোর হয়েছে। শার্সি দিয়ে সকালের স্নান আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে ঘরের অন্ধকারটাকে ফিকে করে দিয়েছে। একটু নীলচে নীলচে দেখাচ্ছে দেয়ালগুলো।

কালও এই সময়ে ঘুম ভেঙেছে মিঃ চ্যাটার্জীর। আর ঘুম ভাঙতেই একটুও দেরি না করে, আড়মোড়া ভেঙে খাটের ওপর উঠে বসে পূব দেয়ালে ছোট্ট সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো মা কালীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে প্রণাম করেছেন ভক্তিভরে। তারপর খাট থেকে নেমে স্লিপার জোড়ায় পা গলিয়ে আস্তে আস্তে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছেন। জীবনের তিরিশটা বছর ঠিক এমনি নিখুঁতভাবে একটানা ছন্দের মতো কেটে গিয়েছে।

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আজ কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কি হবে এত সকাল সকাল উঠে! আজকেই অফিসের সঙ্গে শেষ পাট চুকিয়ে দিয়ে আসছেন। জাঁদরেল অফিসার মিঃ কে. পি. চ্যাটার্জি রিটায়ার করছেন আজ থেকে।

রিটায়ার। গা-টা যেন আবার গুলিয়ে উঠতে চাইছিল মনে হল সুরমা আসছেন এ ঘরে। চট করে উঠে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি। সুরমা কি কিছু ভেবেছে নাকি? আজ আমার রিটায়ার করবার দিন, তাই মন খারাপ করে শুয়ে আছি! বিছানার ওপর উঠে বসে মা কালীর ছবির দিকে মুখ করে হাত জোড় করলেন। দেখুক সুরমা, যে বাবা অফিসার জীবনের তিরিশটা বছর নিখুঁত ঘড়ির কাঁটার মতো সব কাজ করে এসেছেন, আজও চাকরী জীবনের শেষ দিনটায় একটুও এলোমেলো হননি তিনি।

গলা খাঁকারি দিলেন দুবার। তারপর আস্তে খাট থেকে নেমে চটিতে পা গলালেন। সুরমা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। চট করে একবার স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হুঁ, যা ভয় করছিলেন তিনি, সুরমার চোখে সমবেদনা। আর ঠিক এই জিনিষটার মুখোমুখি হতে হবে ভেবেই কি জেগে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা তাঁর বিচ্ছিরি ভাবে খুলিয়ে উঠেছিল? দোরের দিকে এগুতে এগুতে দুবার গলা খাঁকারি দিলেন আবার।

—ঠাণ্ডা লাগল নাকি আবার? সুরমার উদ্বিগ্ন স্বর।

ভ্রু কুঁচকোলেন মিঃ চ্যাটার্জি—না, ভোরে একটু কনজেশন হয়ই গলায়। কালও তো হয়েছিল। মৃদু স্বরে বললেন।

—রোজ এমন হওয়া তো ভালো নয়। ডাঃ মিত্রকে একটা ফোন করে দি? সুরমা দু'পা এগিয়ে এলেন।

অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না। আর ফিরে তাকালেন না মিঃ চ্যাটার্জি। দরজার ভারী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

বাথরুমে ঢুকে যেন স্বস্তি পেলেন একটু। সাবান, ব্রাশ, পেষ্ট, তোয়ালে, তেল, জিভছোলা—সব পরিপাটি করে সাজানো। সুরমার হাতের ছোঁয়া না থাকলেও প্রখর দৃষ্টি রয়েছে সব কিছুর ওপর। স্বামী যে সকালের অনেকখানি সময় এ ঘরটায় কাটান, এ সত্য কোনোদিনই ভোলেননি সুরমা।

দেয়ালে টাঙানো পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় আয়নার মধ্যে এক প্রৌঢ়ের ছবি ফুটে উঠল। ফরসা শরীর, গোল ভারী মুখ, থুতনিতে খানিকটা চর্বি জমেছে। এই ভারী মুখখানাকে ভয় না করেছে এমন সাব-অর্ডিনেট কোনো অফিসার চোখে পড়েনি তাঁর। বেয়ারাকে দিয়ে ডাক পাঠালেই সবাই তটস্থ হয়ে ছুটে এসেছে। ঘরের সুইং ডোরে কাঁপা কাঁপা হাত রেখেছে। আর সেটা দেখে আরো সোজা আরো গম্ভীর হয়ে বসেছেন তিনি। ঘরে ঢুকে কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে ভীরু পা ফেলে এগিয়ে এসেছে এক সন্ত্রস্ত অফিসার বিরাট ঘরের শেষ কোণে বাঁকা করে বসানো তাঁর টেবিলটার সামনে। একটা অস্ফুট নমস্কারের প্রত্যুত্তরে শুধু হাতের কলমটা ঈষৎ মুখের দিকে তুলেছেন মাথা

না তুলেই। একটা স্তব্ধতা। মাথার ওপরে ফ্যানের সঞ্চালনের মসৃণ শব্দ, টেবিলের ওপর শেড দেওয়া টেবিল আলোর একটা বৃত্ত। এই মুহূর্ত কয়টি বড় মূল্যবান আর বড় উপাদেয় লেগেছে তাঁর। মনে হয়েছে, যেন তিনি ভগবান। ইচ্ছে করলে এক লহমায় সামনের ওই দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারেন, আবার হয়তো নতুন করে গড়েও তুলতে পারেন পরমুহূর্তে।

মাথার টাকে ডান হাতখানা রাখলেন মিঃ চ্যাটার্জি। এই সব মুহূর্তগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা। অফিসের এক প্রান্তে একখানা সাজানো ঘরের মধ্যে শুধু বসে থেকেই প্রতিটি কর্মচারীর কাছে নিজের অশরীরী অস্তিত্বকে অনুভব করিয়ে ওদের দিয়ে সদাসন্ত্রস্ত ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না?

হঠাৎই যেন চমকে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি। আয়নার এ কার মুখ দেখছেন তিনি? স্তিমিত দৃষ্টি, বিবর্ণ মুখ; থুতনি আর গাল বুঝি একটু ঝুলে পড়েছে। এই কি তিনি? সর্বস্বহারার মতো?

হ্যাঁ, আজ থেকে সব শেষ. সত্যিই তো অফিস তাঁর সর্বস্ব ছিল। ওইখানে নিঃশ্বাস নিতেন, ওই জলে খেলা করতেন তিনি মাছের মতো।

একটা অপরিসীম শূন্যতা অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। যেন এইমাত্র খালি করে দেওয়া একটা বিরাট হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার ফাঁকা দেওয়ালগুলো ম্লান আলোয় বিবর্ণ। ধূলিহীন মেঝে, পরিষ্কার ছাদ। এই শূন্যতা যেন এক পাষাণের ভার। বুকটা কেমন করে, বুকে হাত দিলেন। হার্টের প্যালপিটেশনটা বাড়ল নাকি আবার? ডাক্তারকে কি খবর দিতে বলবেন? নাঃ, মাথা ঝাঁকালেন মিঃ চ্যাটার্জি, আজ নয়। শেষদিন আজ। কাউকে কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। বাঘা অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি এতদিন কর্মচারীদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে এসেছেন, নিজের মুখের ভাব একটুও বদল না করে, আজও সেই মুখোসটা এঁটেই দিন কাটিয়ে যাবেন।

মুখোস? কথাটা মনে আসতেই হাসি পেল মিঃ চ্যাটার্জি। লোকে তাঁকে খারাপ অফিসার বলে, তাঁকে নাকি চেনা যায় না কখনো। এমন কি উর্ধতন-কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত মাঝে তাঁর সম্বন্ধে নোট দিয়েছিলেন, সাব-অর্ডিনেটদের সাথে ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট tactful নন।

এসব কথাতো শুনতেই হবে। বিশ্বস্তভাবে সরকারকে সেবা করবার এই ফল। সরকারের প্রতিটি হুকুম, প্রতিটি নিয়ম বর্ণে বর্ণে পালন করে আসবার চেষ্টা করেছেন তিনি সারাটা চাকরী জীবন ধরে। তার পুরস্কার তো এই হবে! কিন্তু কর্মচারীরা কেন তাঁকে এই দুর্নামটা দিল? তিনি কারো গাফিলতি সহ্য করেননি—কি অফিসার কি সাধারণ কর্মচারী—তাই কি এই দুর্নাম? হ্যাঁ, এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন, ফাঁকি দেবার সুযোগ দাও, তুমি ভালো। না দাও, অমনি মন্দ হয়ে গেলে। এই নিয়ম। আর দেশ স্বাধীন হয়ে এরা তো এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আজ মাইনে বাড়াও, কাল সার্ভিসরুল বদলাও—কি না সংবিধান বিরোধী! যত সব হুজুগ! উচ্ছৃঙ্খলতা! হ্যাঁ, উচ্ছৃঙ্খলতাই বলবেন তিনি একে! এ সবের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, ওসব এ্যাসোসিয়েসন টাসো আন্দোলন ফান্দোলন কড়াভাবে দমন করবার চেষ্টা করেছেন। কর্মচারীদের ভেতরে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা আনবার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় অফিসের efficieucy. সুতরাং দুর্নাম তো তার হবেই।

যাক, সুনাম দুর্নাম সবই আজ থেকে শেষ। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ভালো করে ধুয়ে নিলেন। তোয়ালেটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘাড় হাত মুছলেন। একপাশে সকালের জন্য গরদের কাপড় কোঁচানো রয়েছে। সাহেবীয়ানা পছন্দ করেন না চ্যাটার্জি, শুধু নামে আর অফিসের পোষাকে ছাড়া। সকালে সন্ধ্যাহ্নিক করেন। একটু প্রাতঃভ্রমণ, ফিরে এসে অল্প কিছু খেয়ে একটু অফিসের ফাইল পত্তর দেখা। তারপর যথারীতি অফিসের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এ নিয়মের কোনোদিন ভুল হয়নি। বন্ধুদের অনেকে বলেছে—সূর্য হয়তো একদিন না উঠতে পারে, কিন্তু চ্যাটার্জির অফিস কামাই! নৈব নৈব চ। জীবনের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নিয়মপালন করে এসেছেন তিনি। তাই জীবনে উন্নতি করেছেন। শরীরটাও ভালো রাখতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত।

দেরি হয়ে গেল নাকি আজ? গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। কি হয়েছে আজ! শুধু যত সব আবোলতাবোল ভাবছেন! না কি দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দুঁদে অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি দুর্বল, এ কথা শুনলেও যে লোকে হাসবে!

তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে নিলেন। খুট করে বাথরুমটা খুললেন। করিডর দিয়ে সুষমা যেন একটু দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন। একটু বুঝি থমকে দাঁড়ালেন। না! আমি কি বাথরুমে একটু দেরি করে ফেলেছি? অত্যন্ত সহজ চিরাচরিত ভঙ্গিতে দুইহাত আস্তে আস্তে দুলিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। আর মনে হতে লাগল, সুষমা বুঝি পেছন থেকে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাঁর মনের অলিগলি সব কিছু দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। মনে হল, আস্তে হাঁটতে গিয়ে যেন বড় বেশি আস্তে হাঁটা সুরু করেছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

তাড়াতাড়ি পুজো সেরে কাপড় পাল্টে, যেন অন্যান্যদিনের মতোই যাচ্ছেন এমনি ভাব দেখিয়ে লাঠিটা এক পাক ঘুরিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি। ভাগ্যে সুষমা কিছুই টের পায়নি আমার।

সামনে সকালের ঘুম ভাঙা রাস্তা। জল ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে কিছু আগে। এখানে ওখানে ভেজা ভেজা জলের ছোপ। বাড়ি ঘরের ফাঁক দিয়ে সকালের ঝলকা রোদ ছোপ ছোপ জলের মতোই যেন রাস্তার নানা জায়গায় এসে পড়েছে। পাশে আঁকা লাইনের ওপর দিয়ে একটা ট্রাম চলে গেল বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে।

লাঠিটা একটু উঁচু করে ধরলেন মিঃ চ্যাটার্জী। ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন, তারপর দ্রুতপায়ে ঘাসে মোড়া ট্রাম লাইনটা পার হয়ে ওপাশের রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। কাল থেকে আমাকে রোজকার স্বভাবমতো কিছু না করলেও চলবে। এবং অনেক কিছুরই ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু সকালের এই রোদ, তাঁর হাঁটা, সামনের ট্রাম লাইন, মাঝে মাঝে হেঁটে চলে যাওয়া লোকজন, কোন কিছুর মধ্যেই তো কোন ব্যতিক্রমের আভাস নেই। এমনকি ওই লেংচে চলা কুকুরটা পর্যন্ত যেন প্রতিদিনের মতোই একরকম। এরা কেউ বুঝতে পারছে না কত বড় একটা পরিবর্তন বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জী। এ মানুষটা আজ থেকে নতুন হয়ে গেল। না না, কাল থেকে।

মৃদু হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জী। হুঁ, দার্শনিকতা করছেন তিনি। এ রোগটা তাঁর আগে ছিল না কখনো। জীবন সম্বন্ধে, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, ভাবালুতা নিয়ে বা পুঁথি পড়া কাগুজমার্কা কতকগুলো ধারণা নিয়ে কোনোদিনই চিন্তা করেননি তিনি। চাকরীতে উন্নতি করতে হবে, নিখুঁতভাবে সব কাজগুলো

করতে হবে, এর চাইতে বড় কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, কোনোদিনই মাথায় উঁকি মারেনি তাঁর। এ যেন এক কুণ্ডলীপাকানো সাপ নিদ্রাভঙ্গে পাক খুলে বেরিয়ে আসছে।

ভাবতেই শিউরে উঠলেন। কি বিচ্ছিরি চিন্তা! তাকাতেই চোখে পড়ল উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছেন অটলবিহারী সেন। ওয়ার্কস্ এ্যাণ্ড বিল্ডিংসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। পরনে পায়জামা। গায়ে পাতলা পাঞ্জাবি, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। 'ধবল কেশ', ফর্সা গোলগাল চেহারার গোঁফ।

বললেন —মিঃ চ্যাটার্জী, আজ যেন একটু দেরি হয়ে গেল না?

হ্যাঁ, এ কথা বলতে পারেন সেন সাহেব। অন্যদিন লেকের গেটে ঢুকবার মুখে দেখা হয়, আজ রাস্তাতে ওঁর ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল। মৃদু হাসবার চেষ্টা করলেন মিঃ চ্যাটার্জী।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। রাস্তার পাশের গাছগুলোও অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু পাতাগুলো উসখুস করে উঠল উড়ে যাওয়ার জন্য। আর টুপ করে একটা পাতা খসে এসে মিঃ চ্যাটার্জীর মাথার ওপর পড়ল। পাতাটা সরিয়ে দিতে দিতে মিঃ চ্যাটার্জি ভাবলেন, খসে গেল একটা।

গাছের ফোকরে ফোকরে যেমন আকাশের আলো আর হাওয়ার বার্তা অন্ধকারের মধ্যেও এসে স্পন্দিত হয় সেন সাহেব যেন অনুভব করছিলেন সেই ভাষাহীন শব্দটি। চুরুটটা দাঁতে চেপে কাটা কাটা স্বরে হঠাৎ বললেন,—আমারও আর দুবছর।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকাতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। আমাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, না হঠাৎ নিজের ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়েছে সেন?

আরো দুটো বছর অফিসে যাবে সেন কর্তৃত্বের দণ্ড হাতে নিয়ে। এ কি কম সুখ? একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা শুঁয়োপোকার মতো মনের মধ্যে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। ওই পরিচিত মানুষটা এই মুহূর্তে অসহ্য। ও আমাকে সহানুভূতি দেখাতে চায়।

না, খুব ভুল করেছেন তিনি আজ বেড়াতে এসে। যার সঙ্গে দেখা হবে, সেই একবার করে নীরব চোখের ভাষায় না হয় অতি ভদ্রতায় না হয় স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেবে, তিনি রিটায়ার করছেন আজ থেকে! যেন এক মৃতের জন্য শোক।

—আজ আর এগোব না। লাঠিটা ফুটপাতে ঠুকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—শরীরটা কি—একটু উদ্বেগ ফোটানোর চেষ্টা করলেন সেন তাঁর গলায়।

—না না! তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি,—শেষ দিন তো! কয়েকটা কাজ পড়ে আছে। সকালেই চুকিয়ে রেখে দেব। চলি।

জোরে জোরেই হাঁটছিলেন। হঠাৎ পা হড়কে যেতেই লাঠি বাগিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পায়ের তলায় গোবর। তাঁর বিরক্তে গা-টা ঘিন-ঘিন করে উঠল। এই তো কর্পোরেশনের কাজের নমুনা! মাইনে দিয়ে কর্পোরেশন থেকে এতগুলো ভিস্তিওয়ালা, মেথর, ঝাড়ুদার সব পুষছে, আর কি কাজ করছে তারা? ফাঁকি, শ্রেফ ফাঁকি। অফিসের একপাল কর্মচারীর মুখ হঠাৎ মনের মধ্যে ভীড় করে এল। আর মনে হল সেই মুখগুলোর কেউ এখনো তাঁকে কোনো ফেয়ারওয়েলের কথা বলেনি।

বাড়ি এসে ঢুকলেন। সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে ওপরে উঠে গেলেন। রামু বেয়ারা লাঠিটা নিয়ে গেল হাত থেকে। বাড়ি এখন পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে।

জামা ছেড়ে গেঞ্জি গায়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঘর সাজানো হয়ে গেছে এরি মধ্যে। টেবিলে ফুলদানিতে টাটকা ফুল। একপাশে আজকের স্টেটসম্যান। খুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। সুরমা এক্ষুনি এসে পড়বেন। ব্রেকফাস্ট সেরে নিচে নেমে যাবেন তিনি। দুটো ফাইল আছে। উল্টে পাল্টে দেখতে হবে একটু। অফিসারটা বলেছিল অবিশ্যি, সব ঠিক আছে। মুশকিল, এদের যে বিশ্বাস করা যায় না। এদের ডিসিসনের কি মাথা মুণ্ডু আছে? তিনি নিজে না দেখে দিলে একটা না একটা গণ্ডগোল বাধবেই। অপদার্থ অফিসার অথচ ক্রিকবাজীতে খুব উৎসাহ! ওর সার্ভিস হিষ্ট্রিটা তিনিও দাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কনফার্মড্ হতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে। হাসলেন একটু।

খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। সুরমা আসছেন। পেছনে ট্রে হাতে বেয়ারা। টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল।

—কি, হাসি হাসি মুখ যে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে যেন একটু স্বস্তি পেলেন সুরমা। হালকা সুরে কথাটা বললেন।

—হাসছিলুম একটা কথা ভেবে। কাল থেকে নিশ্চিন্ত। আর কোনো

কাজ নেই, শুধু বুড়ো আর বুড়ী। খুব বেড়াব আর সিনেমা দেখব, ফুর্তিতে দিন কাটাব।

অকস্মাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে এল। কি কথা থেকে কি কথা যে চলে এল! অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামালেন। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল বড়।

পট থেকে চা ঢালছেন সুরমা। মুখটা একটু নিচু। একটা ছায়া। মাথার ওপরে পাখার মৃদু ঘূর্ণন। একটা টিকটিকি টক টক করে উঠল। স্তব্ধতা জিনিসটা কি কুশ্রী। অন্ধকারের মতো ভয়। আমার নির্জনতা বোধ হচ্ছে কেন?

—সমুর চিঠিটা কালও আসেনি। খুব মৃদুগলায় বললেন মিঃ চ্যাটার্জি—একটা cable করে দেব? বলতে বলতে বুকের মধ্যে কোথায় টন টন করে উঠল। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল, একবার ছেলের মুখখানা কাছে থেকে দেখেন, তার সঙ্গে বসে গল্প করেন। জেমশেদপুর-এর ইঞ্জিনিয়ার। ফরেন-এ গেছে ছ বছরের ট্রেনিং-এ। এখনো ফিরতে মাস আষ্টেক। ইস, কতদিন যে দেখেননি!

স্বামীর দিকে তাকালেন সুরমা। একটা কান্না ঠেলে উঠে আসছিল। চায়ের কাপটা একটু ঠেলে দিলেন স্বামীর দিকে। চা টলমল করে উঠল। উপচে পড়বে বুঝি এখুনি। চোখ ফিরিয়ে নিলেন মিঃ চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি।

—তাই দাও! মৃদুস্বরে বললেন।

—না, এবার ও ফিরে এলেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। যেন সামনে একটা মরুভূমি। এবং সেই মরুভূমির মধ্যে একটা ওয়েসিস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন। বাড়িতে একটা বউ আসুক। হৈ হল্লায় ঘর ভরুক। শান্তি।

নিচু হয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। না, আজ বড় দেরী পড়ে যাচ্ছেন তিনি—কাজটুকু শেষ করে আসি। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

এবং সেই মুহূর্তে সুরমা বললেন—আজও কাজ? শেষ দিন না আজ? আজ তো শুধু ফেয়ারওয়েল তোমার।

কথাটা কানে ঢুকল এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন ঝনঝন করে উঠল। ফেয়ারওয়েল। শব্দটা যেন দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁর গলা চেপে ধরেছে। প্রসারিত ডান হাতের তেলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জী। যেন আজকের ভবিষ্যৎটা দেখবার চেষ্টা করছেন ওই হাতের মধ্যে দিয়ে। না,

হাঁটতে হয়। তাঁর এক শ্রদ্ধেয় উপরওয়ালা এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আজও বিশ্বস্তভাবে সেই উপদেশ অনুসরণ করে চলেছেন তিনি। হাঁটবার সময় পিয়নরা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতজোড় করে সেলাম বাজিয়েছে আর মাথাটা ঈষৎ নুইয়েই আবার সোজা করে হেঁটে চলে গেছেন। ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকা কর্মচারিদের হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠা মূর্তি চোখের আভাসের মধ্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেছে। করিডর, ঘর, সবকিছু অকস্মাৎ অত্যন্ত নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

হঠাৎই মনে হল, অফিসটা আজ যেন বড় জীবন্ত। এত চেঁচামেচি বা কথাবার্তা তাঁর হেঁটে যাওয়ার সময়তো এর আগে কখনো শোনেন নি। ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল। ওরা কি মনে করেছে, আজ ওরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছে একেবারে? অজান্তেই ঘাড়টা একটু বেঁকে গেল। চারটি ছেলে একটা টেবিলের সামনে এসে জড়ো হয়েছে। হাত নেড়ে মুখ নেড়ে কি সব বলাবলি করছে। ওদের চোখও তাঁর চোখের সঙ্গে এসে মিশল এক মুহূর্তের জন্য। একটুক্ষণের জন্য, মনে হল, ওরা বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অথবা হয়তো তাঁর মনের ভুল। যেন তারপরেই ওরা জোর করেই বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে কথাবার্তায় মেতে উঠল। তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে গেলেন মিঃ চাটার্জি।

তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন। ওদের চোখে মুখে বেপরোয়া ভাবের সঙ্গে আর কি যেন মেশানো ছিল? ঘৃণা আর অবজ্ঞা কি? কঠিন সত্যের মতো মিঃ চাটার্জির মনে একটা কথা চমক দিয়ে গেল। ওরা নিশ্চয় আজ ওদের মনের মতো একটা কিছু করে তাঁকে অপদস্থ করে ওদের সঞ্চিত গোপন ক্ষোভ এবং ঘৃণা মেটানোর চেষ্টা করবে। হুঁ, তাকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে না ওরা, নিশ্চয়! ওদের চোখে মুখে যেন এই কথাই লেখা ছিল।

হাঁ, এই কর্মচারীরা তাঁকে ভয় করে এবং ভয়ের চাইতেও বেশী ঘৃণা করে। এ তিনি দেখেছেন। কিন্তু এর জন্য তিনি কি করতে পারেন? সরকারের কাজ। আদায়ের ভার তাঁর ওপর। তিনি নিজে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তেমনি আদায়ও করে নিয়েছেন শক্ত হাতে। ওরা ছুটি চাইবে। কাজ বেশী বলে চ্যাঁচাবে। যেন সব সময়েই অত্যাচার চলছে ওদের ওপর এমন ভাব! দশটার সময় অফিসে কক্ষনো আসতে চাইবে না। কি না, ট্রাম বাসের ভীড়ে উঠতে পারা যায় না! অফিসের প্রয়োজনে বাইরে বদলী করতে গেলে বলবে, এই অল্প মাইনেয় দু জায়গায় নাকি সংসার

চালানো যায় না। এদের যে কোনো অর্ডারেই অসন্তোষ আর ক্ষোভ। আর কথায় কথায় এ্যাসোসিয়েশনের নামে বায়নাক্কা। কিন্তু এসব অন্যায্য দাবিকে লাই দিতে গেলে কখনো শৃঙ্খলা থাকে, দক্ষতা বাড়ে ? অতএব এদের চোখে কিছু কড়া হতেই হয়েছে তাঁকে। দুর্নাম তো হবেই। ওদের চোখে তাই ঘৃণা! যেন কোনো অত্যাচারীর দিকে তাকিয়েছিল ওরা!

চাপরাশী ফ্যান খুলে দিয়ে গিয়েছে। টেবলের ওপরে সুদৃশ্য গ্লাসে জল শোভা পাচ্ছে সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া অবস্থায়। চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে নিয়ে বসলেন মিঃ চ্যাটার্জি। দেয়াল ঘড়িটায় টিকটিক শব্দ উঠছে। জানলায় কাটা পর্দায় বাইরের হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে। শুধু সুইং দোরটা স্থির।

কি পরিচিত ঘর। কতদিন কাটালেন এখানে ? চার বছর! এর আগে ছিলেন অন্য অফিসে। শেষ প্রোমোশন পেয়ে এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। এই ঘর থেকেই বিদায় নিতে হবে।

ঢাকনা নামিয়ে গেলাসটা তুলে নিলেন। এক চুমুক জল খেয়েই নামিয়ে রাখলেন। কে যেন সুইংডোর ঠেলছে। চমকে তাকালেন। রামু পিয়ন।

—কে ? একটু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ্ঞে হীরেন বাবু দেখা করতে চান।

—হীরেন বাবু। কথাটা বললেন আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরের স্নায়ুগুলো যেন টানটান হয়ে উঠল। এ্যাসোসিয়েশনের লীডার। ফেয়ারওয়েলের কথা বলতে আসছে নাকি ? একটা উদগ্র আগ্রহ আর কামনায় চনমন করে উঠলেন। বললেন—আসতে বলো।

রামু বেরিয়ে গেল। সুইংডোর ঠেলে ঢুকল হীরেন চ্যাটার্জি। একই সাথে অফিসিয়াল গাম্ভীর্য এবং কিছুটা তরল ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। একটু ঝুঁকে পড়লেন টেবলের ওপরে। কাঁধদুটো সঙ্কুচিত করলেন। পেন হোল্ডার থেকে একটা কলম তুলে নিলেন হাতে।

—কি ব্যাপার ?

হীরেন চ্যাটার্জি এগিয়ে এল কয়েক পা। মাথার চুলে আলতোভাবে ডানহাতটা একবার বুলিয়ে নিল।

—আপনি তো আজ থেকে চলে যাচ্ছেন।

বুকটা ধক্ করে উঠল মিঃ চ্যাটার্জির। এইবারে বুঝি ফেয়ারওয়েলের কথা বলবে!

—কিন্তু স্বরজিৎ সরকারের ট্রান্সফারের ব্যাপারটাতো এখনো ফয়সালা হল না।

এই কথার জন্য এসেছে? একটা অক্ষম রাগে চোখমুখ ঝাঁঝাঁ করে উঠল। মনে হচ্ছিল, এখুনি ডানহাতটা তুলে দরজাটা দেখিয়ে দ্যান। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম ভয় বাধা দিচ্ছিল। ও যেন একমুহূর্তেও একলা নয়। ওর চোখের পেছনে হুশো কর্মচারীর চোখ তীব্র খোঁচা মারছে। ওর গলায় হুশো মানুষের গর্জন। কেমন যেন ভয় লাগে। অকারণ স্বাভাবিক ভয়। আর এর জন্যই একটা তীব্র অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকেন। শিরশিরে ভয়ের ভাবটা স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে যাচ্ছে। শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছে, চোখের কোণে রক্ত জমছে, কানের দুপাশে টিপটিপ ভাব সুরু হয়েছে। একটা অক্ষম রাগে আর ভয়ে জড়ভরতের মতো ধীরেন চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

—আপনিই বলেছিলেন, বড় অফিস থেকে কেউ এসে এখানে জয়েন করলেই স্বরজিৎকে ব্রাঞ্চ থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়ে আনবেন। তা, লোক তো আজ জয়েন করেছে। এবারে স্বরজিতের ফিরিয়ে আনবার অর্ডারটা দিয়ে দিন।

—এমন কথা কি আমি বলেছি? চাপা ক্রোধে ফুলতে ফুলতে উত্তর দিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ইচ্ছে করে প্যাঁচ কষা আমার ওপরে!

—হ্যাঁ, আমি বেশ স্মরণ করতে পারছি। এমনি ধরণের মৌখিক আশ্বাসই এর আগে আপনি আমাদের দিয়েছিলেন। এবং আপনার সেই প্রতিশ্রুতির জন্যই ট্রান্সফারটা টেম্পোরারী হয়েছিল।

—কিন্তু এমন কথা বলিনি, যে মুহূর্তে কেউ জয়েন করবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বরজিৎ সরকারকে ফিরিয়ে আনবার অর্ডার দেব। মনে রাখবেন, তাঁকে পাবলিক ইন্টারেষ্টে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া আপনাদের বন্ধুদেরই অপ্রয়োজনীয় ছুটি নেবার ফলে ব্রাঞ্চে যে এরিয়ার পড়েছে, সেটা pull up করবেটা কে? চেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। একটু স্বস্তি পেলেন। যাক প্যাঁচ দিয়েছেন একটা এতক্ষণে।

—প্রথমত ছুটি অপ্রয়োজনে কেউ নেয় নি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই তাই হয়েছে, তাহলেও তার জন্য একটা নিরপরাধ ব্যক্তি suffer করতে যাবে কেন? তাছাড়া, আপনার প্রতিশ্রুতির একটা গুরুত্ব আছে

এটা কি আমরা আশা করতে পারি না? হীরেন সোজা তাঁর দিকে তাকাল।

কি বিনীত ভঙ্গি অথচ কি দুর্বিনীত? অসহায়ের মতো একটা তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। নাঃ, এখানে আসার পর থেকে এই এ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডাগুলো জ্বালিয়ে এসেছে তাঁকে, আজ শেষ দিনেও ছাড়বে না।

—আমার এখন আর কিছু করবার নেই। যিনি নূতন আসছেন আমার জায়গায়, প্রয়োজন বুঝে তিনিই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। দাঁতে দাঁত রেখে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন।

—ঠিক আছে! কেমন একটা ইঙ্গিত সহকারে কথাটা বলে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে গেল হীরেন চ্যাটার্জি।

কপালে বুঝি ঘাম দেখা দিয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাত কাঁপছে নাকি একটু একটু?

রক্তের মধ্যে একটা অস্থির চাঞ্চল্য জাগছে। আর এক অদ্ভুত ভয়। যা কোনোদিন করেন না, আজ তাই করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অস্থির পায়ে পায়চারী শুরু করলেন ঘরের মধ্যে। খাঁচায় পোরা সিংহের মতো। এই মুহূর্তে বাইরে বেরুবার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। যেন, শত শত কর্মচারীর জোড়া জোড়া চোখ ঘৃণা আর আক্রোশ নিয়ে দরজায় দরজায় পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণ বর্শার মতো বিঁধিয়ে দেবে তিনি বাইরে গেলেই।

কয়েকবার পায়চারী করে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে। লজ্জা লাগল। কেন এত ভয় পাচ্ছিলেন? ছিঃ! যা করেছেন তিনি, সবই তো কর্তব্যের খাতিরে। বাইরে থেকে কেউই চায় না। কিন্তু সরকারী স্বার্থ দেখতে গিয়ে জোর করেই খাটাতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাতে গেলে অফিস চলত না। যারা ছুটি নিয়েছে, অনেককে মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছেন, সত্য সত্য অসুখ কি না পরখ করবার জন্ম। ক্যারেক্টার রোল খারাপ করেছেন অনেকের, ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। অযোগ্য লোকগুলোর শাস্তি হওয়াই তো উচিত। অথচ এই সব ব্যাপার নিয়ে এ্যাসোসিয়েশন হৈ চৈ করবার জন্ম মুখিয়েই রয়েছে। করুকগে হৈ চৈ। ডিসিপ্লিন বজায় না রাখলে অফিস কবে ডুবিয়ে যেত। এর জন্ম তাঁকে কৈফিয়ৎ তলব করতে হয়েছে, চার্জশীট

করতে হয়েছে। একজনের চাকরীও খেয়েছেন। এবং এ সবই অফিসের দক্ষতা ও মান বজায় রাখবার জন্য। তাই তিনি অত্যাচারী এবং হিংসাপরায়ণ অফিসার! ওদের ঘৃণার পাত্র!

কিন্তু তাহলে তিনি অনর্থক ভয় করেন কেন? নাকি তিনিও মনে মনে বিশ্বাস করেন যে হাতে অপরিমিত ক্ষমতা পেয়ে দুর্বলের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে এসেছেন এতকাল?

মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি চিন্তাগুলো। নাঃ, এখন প্রস্তুত হতে হবে। কলিং বেল টিপলেন। পিয়ন এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

—দত্ত সাহেব।

ও সেলাম করে চলে গেল।

চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

সুইং ডোর ঠেলে দত্ত সাহেব ঢুকলেন। সাবঅর্ডিনেট অফিসার। মাঝ বয়েসী লোক। ব্যক্তিত্বহীন। নিজের টাই ঠিক করতে করতেই গলদঘর্ম। দেখলে গা জ্বালা করে। একটা ডিসিশন যদি ঠিকমতো দিতে পারে।

—চার্জ হ্যাণ্ডওভার রিপোর্ট রেডি করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দত্ত সাহেব টাইতে আঙুল বোলালেন।

—নিয়ে আসুন। দেখি, আপনাদের কাজ তো! কি করতে কি করে বসে আছেন কে জানে? মৃদু বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল।

নিরীহ পশুর ভঙ্গিতে কেমন দাঁড়িয়ে আছে! শুধু টাই টানাটানি করছে! সত্যি, চাবুক মারলেও বোধহয় এমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই সব সহ্য করবে!

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কথাটা কি বুঝতে পারেন নি? তীক্ষ্ন গলায় বললেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—আজ্ঞে স্যার। এই যে যাই। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দত্ত সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

—অপদার্থ। স্কাউণ্ড্রেল! অস্ফুটে মন্তব্য করলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

যে অক্ষম আক্রোশ মনের মধ্যে এতক্ষণ মাথা ঠুকে ঠুকে মরছিল, ওই লোকটার ওপর দিয়ে তার খানিকটা উদ্গীরণ হয়ে যেতে কিছুটা শান্তি পেলেন যেন।

দত্ত সাহেব চার্জ হ্যাণ্ডওভার রিপোর্ট দিয়ে গেলেন। তার ওপরে চোখ বোলাতে লাগলেন মিঃ চ্যাটার্জি। এতে একটা সই করলেই, বাস, তাঁর মুক্তি।

ফোনটা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন—হ্যালো!

—হ্যালো! আমি কি মিঃ চ্যাটার্জির সাথে কথা বলছি?

—হ্যাঁ। কে?

—আমি বিভাস অধিকারী কথা বলছি।

হাতটা একটু কেঁপে গেল অজান্তেই। তাঁর সাকসেসর!

—আচ্ছা! কখন আসছেন? গলায় কেমন একটা বাধো বাধো ভাব বোধ করছিলেন।

—খুব বেশী হলে আধঘণ্টার মধ্যে। কেমন?

—ঠিক আছে।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—থ্যাঙ্কস্।

অসাড় হাতে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

ঘড়িটার দিকে আপনমনেই চোখ গিয়ে পড়ল। একটু একটু করে কাঁটা সরছে। একটু একটু করে যেন তাঁকে সরিয়ে দিচ্ছে চেয়ারটা থেকে। আর একটু পরেই মিঃ অধিকারী আসবেন। চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া, রিপোর্ট সই করা। বাস। খালি হাতে গিয়ে উঠবেন গাড়িতে। নিঃশব্দে ফিরে যাবেন বাড়িতে। সুরমা শুধু বড় বড় চোখ মেলে তাকাবে একবার তাঁর মুখের দিকে, একবার গাড়ির দিকে। কি আনলেন অফিস থেকে, শেষ দিনটায় সহকর্মীদের প্রীতি উপহার হিসেবে, বুঝি হিসেব করে বুঝে উঠতে চাইবেন।

অথচ কোনোদিনই তো প্রীতি চাননি মিঃ চ্যাটার্জি অফিস থেকে। এখান থেকে তিনি চেয়েছেন কাজ। দক্ষতা আর নিয়ম শৃঙ্খলা। আজ কেন তাহলে প্রীতির কথা উঠছে।

ভাবতে ভাবতে কখন মাথায় হাত রেখেছেন, জানলার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন, জানেনই না মিঃ চ্যাটার্জি। হঠাৎ চমক ভাঙল চাপরাশীর মৃদু ডাকে।

—হুজুর!

ঈষৎ চমকে মুখ ফেরালেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—নিচে নয়া হুজুরের গাড়ি এসেছে।

—তাই নাকি! তুমি গিয়ে তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো। আচ্ছা চলো, আমিই যাচ্ছি। বলে উঠে দাঁড়ালেন।

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গটগট করে করিডর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

—হ্যালো!

—হ্যালো!

দুজনে করমর্দন করলেন—আসুন। চ্যাটার্জি আহ্বান করলেন তাঁর উত্তরাধিকারীকে।

চকচকে স্যুট আর কম্বিনেশন টাইতে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে অধিকারীকে। বয়েসও অনেক কম। অনেক উন্নতি করবে জীবনে। মিঃ চ্যাটার্জি ভাবলেন।

ঘরে এসে ঢুকলেন দুজনে।

আর নয়, এবারে পালা চুকিয়ে ফ্যালো চ্যাটার্জি। মনে মনে যেন নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

অফিসারদের ডাকলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তারপর কাগজ পত্তরগুলোয় সই শেষ করে যখন উঠে দাঁড়িয়ে দুজনে করমর্দন করলেন, বেলা তখন প্রায় একটা।

এখন আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোক। মনে মনে আওড়ালেন মিঃ চ্যাটার্জি। আর সিনিয়ার অফিসার মিঃ চ্যাটার্জি নই।

ভাবলেন, আর ভয়ংকর একটা শূন্যতার চাপে মনটা যেন অবশ হয়ে এল। তারপর সেই চাপটা হঠাৎ উঠে গেল আর নিজেকে কি ভীষণ হালকা মনে হল! বুকটা বুঝি একটু ধকধক করছে। চারিদিক তাকালেন। মনে হল, যেন এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে। একটু আগেই নিজের হাতে তাঁর রাজাপাট সব কিছু অন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন মঞ্চ ফাঁকা। তাঁর অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। এবারে উইংসের আড়ালে চিরতরে প্রস্থান।

সইটার দিকে তাকালেন। পেছনের দিনগুলো আর আগামী দিনগুলোর মধ্যে এই শেষ সই যেন তীক্ষ্ণধার অসির মতো সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। এখন থেকে তিনি একজন ভূতপূর্ব অফিসার।

পা ঝাঁকানি দিলেন। আর নয়। এবারে চলে যাই। এই ঘর, এই টেবিল, আলো, জানলার পর্দা, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, কার্পেট, সব মিলিয়ে এই জগৎটা যে কত অসংখ্য অদৃশ্য টানে তাঁর সমস্ত সত্তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ঠিক এই মুহূর্তে যখন পড়্ পড়্ করে সমস্ত শিকড়ে টান পড়ল, যেন বুঝতে পারলেন। মরবার সময় কি মানুষের এমনি যন্ত্রণাই হয়?

—আর নয় মিঃ অধিকারী। এবারে উঠছি।

—সেকি, এখনি চলে যাবেন? কেয়ারওয়েল কি এরি মধ্যে হয়ে গেছে নাকি? অত্যন্ত নির্দোষ বিস্ময়ে প্রশ্ন করে অধিকারী সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আর যেন পাহাড় থেকে একটা বিরাট পাথরের চাই হুড়মুড় করে গড়িয়ে এসে মিঃ চাটার্জির ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ল। সুরমার মুখ চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, অফিসের কর্মচারীদের অদ্ভুত চোখগুলো। সমস্ত সার্ভিস লাইফের সার্থকতা কি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এই একটি শব্দের বাহুর মধ্যে! কেয়ারওয়েল? এর সঙ্গে বুঝি নিজের সম্মান, পরিবারের সম্মান সব কিছু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। অস্তিত্বের একটা বৃহৎ অংশের মতো।

সেই অস্তিত্বের ওপরেই বুঝি মিঃ অধিকারী আঘাত করেছেন না বুঝে।

কয়েক পলক ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পৃথিবীটা দুলছিল, চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মুখ তুলেই বলে ফেললেন—নাঃ, আমি বারণ করে দিয়েছি।

কথাটা বলে ফেললেন আর হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ যেন মুহূর্তে দীর্ণ করে ফেলল তাঁকে। ঠিক তখনি, বিদ্যুৎঘাতে আলোকিত আকাশ মাটি গাছপালার চকিত প্রকাশের মতো বুঝতে পারলেন, কি যন্ত্রণায়, কি কঠিন প্রয়োজনে তাঁর কর্মচারীরা মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা বলে থাকে।

আর দাঁড়ালেন না। সেই মুহূর্তেই মিঃ অধিকারীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ভূতে তাড়া করা মানুষের মতো দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। অফিস ঘরের দরজাগুলো সট সট করে সিনেমার ছবির মতো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সরে গেল। হন হন করে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। যেন অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকোতে পারলে বাঁচেন। অফিস কম্পাউণ্ড ছেড়ে মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি রাস্তায় এসে পড়ল।

আর সব কিছু শেষ হয়ে গিয়ে একটা চিন্তাই সিনেমার পর্দায় ক্লোজ-আপ মুখের মতো বড় হতে হতে সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কি করে খালি হাতে সুরমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন! দুহাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো পেছনের সীটে পড়ে রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। কি করবেন? কি? মাথার মধ্যে ভোমরার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন যেন।

অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—সতীশ, গাড়ি ঘোরাও। নিউমার্কেট। বিস্মিত সতীশ গাড়ি ব্রেক করল। তাঁর দিকে একবার তাকাল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

প্রখর রৌদ্রে রাস্তা জ্বলছে। ট্রামগুলো ক্লান্ত গরুর মতো যেন গলার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের শীর্ণ ছায়ায় একটা কুকুর বিশ্রাম করছে। চারপাশে শুধু বিবর্ণ কর্মহীনতার মেলা।

নিউমার্কেটের মুখে এসে গাড়ি থামল। নেমে ভেতরে এসে ঢুকলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঘুরে ঘুরে একটা চাদর কিনলেন, একটা ছড়ি, গীতা একখানা। তারপর ফুলের স্টলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মালা দেখি একটা।

পছন্দ করে সাদা ফুলের একটা মালা কিনলেন। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে এসে গাড়ির মধ্যে একপাশে সাজিয়ে রাখলেন জিনিষগুলো। নিজে উঠলেন।

সতীশের অবাক দৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু বললেন—চলো, বাড়ি।

মাথা উঁচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। মাথা উঁচু করেই আবার ঢুকবেন। তার জন্য যত মূল্যই দিতে হোক না কেন।

গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে গাড়ি দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে জিনিষগুলো বের করে নিলেন। সতীশ হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল জিনিষগুলো। বললেন—দরকার নেই। গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাও।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

সাড়া পেয়ে রামু চাকরটা এগিয়ে এল।—ধরো। বলে সব জিনিষ দিয়ে দিলেন ওর হাতে। ফুলের মালাটা ছাড়া।

শব্দ পেয়ে সুরমাও বেরিয়ে এসেছেন। চোখাচোখি হল। জিনিষপত্তরের দিকে নজর পড়ল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

—ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল তাহলে?

—হুঁ। বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে অর্ধস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলেন।

—এগুলো দিল বুঝি?

—হুঁ।

—বাঃ! গীতা, চাদর, ছড়ি! তোমার কর্মচারীদের বেশ রসবোধ আছে তো?

—খুব।

বুকের মধ্যে আবার সেই সকালের যন্ত্রণার ভাবটা যেন চাড়া দিয়ে উঠছে। কিছু বাতাস নেবার জন্য হাতের মুঠো আলগা করে আবার শক্ত করলেন।

—ওকি, তোমার মুখটা অমন শাদা হয়ে গেল কেন? উদ্বিগ্ন হয়ে সুরমা এগিয়ে এলেন—শরীর খারাপ করছে।

—না, না! দুপুরে চলে আসতে হল কিনা? অভ্যাস তো নেই! জোর করে হেসে উঠতে গেলেন মিঃ চ্যাটার্জী।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুরমার চোখে আবার চোখ মিলল।

আমি সব মিথ্যে কথা বলছি। বুঝতে পারছ না? চেঁচিয়ে বলে উঠতে গেলেন। কিন্তু কে যেন গলাটা কামড়ে ধরে আছে। আহত পশুর মতো আর্ত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই রইলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

আলোচনা

সুশোভন সরকার

শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা নিয়ে বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত আলোচনা নিশ্চয়ই একটা শুভলক্ষণ। এই আলোচনায় সকলে যে একমত হবেন না এটা তো স্বাভাবিক। এখানে শেষ কথা কিছু থাকতে পারে না, সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা নেই, গোষ্ঠিগত নীতিও অচল। আমার রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপত্তি তাই অপ্রত্যাশিত নয়। আমি যাকে প্রাচ্যাভিমান বলেছি, আজকের দিনে তার বিশিষ্ট ধারকেরা যে আমার উপর খড়্গহস্ত হবেন তাতে গোড়া থেকে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য হলাম শারদীয় পরিচয়ে হীরেনবাবুর ক্ষোভ ও উষ্মা দেখে, যেহেতু আমার সংজ্ঞায় যেটা প্রাচ্যাভিমান, রবীন্দ্রনাথ যাকে বার বার আক্রমণ করেছিলেন (তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতিগুলি এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ), হীরেনবাবুকে তার আওতায় আনতে আমি অক্ষম।

আমার প্রবন্ধের মতামত "দাম্ভ", "নিষ্প্রাণ", "যান্ত্রিক", "একদেশদর্শী", "অসঙ্গত", "সংকীর্ণ", "অবাস্তব" কিনা সেকথা নিশ্চয়ই তর্কসাপেক্ষ। এবম্বিধ বিশেষণ প্রয়োগ আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন, কেন না বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকেরাই কেবল তর্কের নিষ্পত্তি করতে পারেন। আমি এখানে চেষ্টা করব শুধু ভুল বোঝার অবকাশটুকু কমিয়ে আনতে।

কারণ, মনে হয় এ-প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, ইংরাজিতে যাকে বলে arguing at cross purposes. দোষ অনেকটা নিশ্চয় ছিল ভাষা প্রয়োগে ও ভাবপ্রকাশে আমার দুর্বলতার মধ্যে। কিছুটা দায়িত্ব বোধহয় সমালোচকেরও আছে।

দুটি সামান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। হীরেনবাবু বলেছেন যে আমি সিদ্ধান্ত করেছি: "মোটামুটি ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় চলেছিল প্রাচ্যাভিমানের পর্ব"—আর আমার প্রবন্ধে "বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা নেই।" অথচ আমি রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যাভিমান-বিরোধী উক্তি

নিয়েছিলাম অর্থ কিছু একেবারে আদিপর্বের লেখা থেকে, আর ১৮৬৬—১৮৬৮ সালের রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে। "বহিরঙ্গ-চিহ্নগুলি যে পশ্চিমী দৃষ্টির আসল পরিচায়ক নয়", বিদ্যাসাগরের মধ্যে তার প্রমাণ রেখেছিলাম, সুশোভন তাঁকে রামমোহন ও মধুসূদনের সমগোত্রীয় মনে করেছি। এর থেকে অনুমান হতে পারে যে হয়ত সমালোচক মূল প্রবন্ধ আগাগোড়া ভালো করে পড়ে দেখেন নি।

কিন্তু আসল গোলমাল বেধেছে প্রবন্ধে ব্যবহৃত দুটি পারিভাষিক শব্দ নিয়ে, পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমান। নূতন concept প্রয়োগে সর্বদাই ভুল বিচার দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লেখকের নিজস্ব ধারণাটুকু নির্ভুলে বুঝবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়, নির্দিষ্ট অর্থ থেকে সরে যাওয়া অনুচিত।

সমালোচকেরা পশ্চিমী দৃষ্টির অর্থ করেছেন ইওরোপ-প্রীতি, প্রতীচ্যের কাছে আত্মসমর্পণ, নির্বিচারে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি গ্রহণ, হাতজোড় করে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকা। তাঁদের কাছে প্রাচ্যাভিমানের মানে দাঁড়িয়েছে—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, চিন্তায় ও কর্মে স্বদেশী মাটির মূলগত প্রাধান্য, দেশের সঙ্গে নাড়ীর সম্পর্ক, এককথায় হীরেনবাবুর "ভারত-বোধ"। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা স্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পশ্চিমী দৃষ্টির অনুসন্ধান বৃথা, রামমোহনের মতোনই "পশ্চিম তাঁহাকে কখনই অভিভূত করে নাই।" এই সংজ্ঞা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রাচ্যাভিমানী, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর প্রীতি ও বিশ্বাস অবিসম্বাদিত। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, কোনও বড় সাহিত্যিক দেশের মাটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তিনি প্রকাশ করেন নিজের ভাষাতে, স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকবেই। প্রকৃত দেশপ্রেমিক নাড়ীর সম্পর্ক কাটাতে পারেন না। দেশ সম্বন্ধে তাঁর 'বোধ' থাকতে বাধ্য। আমি এতটা অর্বাচীন নই যে সর্বজনগ্রাহ্য এইসব কথা অগ্রাহ্য করব।

প্রকৃত প্রশ্ন হল যে আমার প্রবন্ধের মূল শব্দদুটির অর্থ কি এই ছিল? সেখানে কি বলা হয়নি যে নব-জাগরণের সাহিত্য-শিল্প-সৃষ্টি ও স্বাদেশিকতা "সমানে পুষ্টিলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে"? প্রাচ্যাভিমান থেকে রবীন্দ্রনাথের মুখ ফেরানোর অর্থ তাঁর ভারতবোধকে অস্বীকার করা, এই বা কেমন কথা? যে-রামমোহনের প্রতিষ্ঠা 'ভারত-পথিক' রূপে, তাঁকে পশ্চিমী দৃষ্টির প্রবর্তক হিসাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হল কি করে?

প্রবন্ধের পারিভাষিক শব্দের মধ্যে 'দৃষ্টি' ও 'অভিমান' কথা দুটির প্রয়োগ আকস্মিক নয়। পশ্চিমী দৃষ্টির প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রাচ্য দৃষ্টি অর্থাৎ ভারতত্বকে, প্রাচ্যাভিমানের বিপরীত হিসাবে পাশ্চাত্যাভিমান অর্থাৎ পশ্চিমীকরণকে উপস্থিত করা হয়নি সুপরিকল্পিতভাবেই। Westernism এবং westernisation সমার্থক নয়। সমালোচক যোগ্যতর পারিভাষিক শব্দের প্রস্তাব আনতে পারতেন, তাতে অবশ্য প্রবন্ধের বক্তব্যটুকু বদলে যেত না।

পশ্চিমী দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত নয়, ইতিহাসের বিশেষ যুগে পশ্চিম থেকে আহরিত আদর্শ মাত্র। উনিশ শতকে বাংলা দেশে এই দৃষ্টি বাস্তব রূপ নিল সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবিকতায়। (হিউম্যানিজমের এই প্রতিশব্দের জন্য আমি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে ঋণী—শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর লেখাটি সকলের পড়া উচিত) তেমনই প্রাচ্যাভিমানের প্রকৃত অর্থ আপন ঐতিহ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাদেশিকতা, ভারতবোধ নয়। তার বাস্তব প্রকাশ হয়েছিল প্রাচীন গৌরবের 'উপাসনা' অর্থাৎ ঐতিহ্যকে নির্বিচারে সংরক্ষণের ঝোঁকে, ভারতের বিশেষ অবস্থায় হিন্দুত্ববোধের প্রাধান্যে, যুক্তিকে হটিয়ে ভক্তিপ্রবণতার স্রোতে। আমার প্রবন্ধে ছিল উভয় ধারার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা। উভয় ধারারই কিছু কিছু প্রকাশ সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের লেখায় ধরা পড়ে। কিন্তু কোনো কোনো পর্বে, বিশেষত পরিণত জীবনের শেষার্ধে পশ্চিমী দৃষ্টির প্রাবল্য লক্ষ্য করা সম্ভব, আমার বক্তব্য ছিল এই। প্রমাণ হিসাবে প্রবন্ধে তারিখ-সম্বলিত বহু উদ্ধৃতি কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রায় প্রতিটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের পার্থক্য ও প্রকৃত স্বরূপ। উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি করে এই লেখার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

পশ্চিমী দৃষ্টি বিদেশী শাসক, প্রচারক বা লেখকের চোখে "ভারত দর্শন" নয়। ইতিহাসে যাকে western impact বলে তার থেকে সঞ্জাত, বাংলার রেনেসাঁসের যুগে নূতনভাবে রূপায়িত দেখবার ভঙ্গিটাকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ দৃষ্টির location এদেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, বিদেশে কিংবা বিদেশীর "[illegible]"র মধ্যে নয়—একে made in Europe বললে চলে না। [illegible] 'যারা সবাই সিপাহিদের কালে মাথা বাঁধে' এদেশীয় তাঁদেরই বস্তুতঃ নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় প্রাচ্যাভিমানী বললে [illegible] হবে না। তাঁরা কিন্তু

একথা বলবার কারণ এই যে আমার মতে উনিশ শতাব্দীর বিরোধের অবসান সম্পন্ন হয়ে ওঠে নি, আজকের দিনে বরং বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। পশ্চিমী বৃত্তিকে যদি সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদ হিসাবে দেখি, তাহলে এখনও পদে পদে এই পথে যে-বাধা উঠছে তার উৎসও পাই সেই প্রাচ্যাভিমানে, যার আদর্শ হল ঐতিহ্য সংরক্ষণ, যার অবলম্বন হল ভক্তিস্রোতে অবগাহন, যার অস্ত্র হল হিন্দুত্ববোধের বুলি। শেষ বিশ্লেষণে অবশ্যই এখানে বাস্তব শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, চোখে পড়বে কায়েমী স্বার্থের প্রেরণা। কিন্তু বিরোধ প্রকাশিত হয় ভাব-রাজ্যে—ইন্দ্রিয়লব্ধির ক্ষেত্রে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত রূপ নেয় আদর্শের সঙ্গে আদর্শের বিরোধে। আজ কোথায় গেল উনিশ শতকের সেই সুবিখ্যাত সমন্বয়সাধন?

অনেকের কাছে শুনতে পাব, এ তো হল রবীন্দ্রনাথকে দলে টানবার স্বার্থপ্রসূত অভিসন্ধি, অতএব সাধু সাবধান। এঁদের দুর্ভাগ্যবশত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বার বার নানা ব্যাপারে partisan রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করেন নি, বলিষ্ঠ মতামত প্রচারের ব্যাপারে সমন্বয় খোঁজেন নি। তাঁর সেই উত্তরাধিকার আজ যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে কি অন্যায় হবে?

হীরেনবাবুর প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মন্তব্যের আলোচনা করে এ লেখা শেষ করি।

আমার প্রবন্ধ-খণ্ডন মূল উদ্দেশ্য হলেও তিনি লেখা শুরু করেছেন বুদ্ধদেববাবুকে আক্রমণ করে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি আমাদের দুজনকে এক পর্যায়ে ফেলছেন। অথচ আমার মতে পার্থক্য সুদূরপ্রসারী। বুদ্ধদেববাবুর লেখা হাতের কাছে নেই, কিন্তু তাঁর অন্তত দুটি ইঙ্গিত আমার কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। স্বীকার করি না যে রবীন্দ্রনাথের যুগে এদেশের প্রায় অখ্যাত ফরাসী কবিদের কাব্যপ্রতিভা সাময়িক পত্রে অথবা মুখে মুখে আকাশে বাতাসে বিচ্ছুরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁর মতো প্রতিভাধরের পক্ষে প্রজ্বলিত হতে এই স্ফুলিঙ্গই ছিল যথেষ্ট। আমার মতে এমন সিদ্ধান্ত নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা। সংস্কৃতি-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আসলে পশ্চিমী হয়েও দেশবাসীর ভয়ে চরিত্রগোপন করে স্বাদেশিক সেজেছিলেন, একথা বিশ্বাস করাও অসম্ভব। তাঁর পক্ষে এ জাতীয় উঞ্ছচারিতা আমার অচিন্ত্য মনে হয়।

হীরেনবাবু বলেছেন আমি রবীন্দ্রনাথের "আত্মসংবাদ" "অখণ্ডতা" অস্বীকার করেছি। আমার চেষ্টা ছিল রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতোই তাঁর "রচনাবলীকে ঐতিহাসিকভাবে দেখা।" বিভিন্ন সময়ে বিরোধী ঝোঁক প্রকাশে অগৌরবের কিছু নেই না, যদি একটা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখতে কুণ্ঠিত হন নি: "দেশব্যাপী এই রচনাবলীকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই।" পিতার উত্তরাধিকারের আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে যাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, শেষের দিকে তাঁরই মধ্যে secularism-এর চিহ্ন তো অনেকেরই চোখে পড়েছে। তাঁর স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক চিন্তাতেও তো পর্বভেদ লক্ষ্য করা হয়ে থাকে। অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই "অখণ্ডতা" ছিল, কিন্তু তা আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ই নয়।

হীরেনবাবুর মতে সমাজসংস্কার যুক্তিবাদ মানবিকবাদ—এ সব তো সর্বজনীন ব্যাপার, আমাদের ঐতিহ্যেও রয়েছে, অতএব একে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার সার্থকতা কোথায়। সকল সভ্যতার ইতিহাসেই সব কিছু খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে, আমরা যাকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বলে থাকি ইওরোপেও তার নিদর্শন মেলে। তবে কিনা স্থান-কাল বিশেষে গুরুত্বভেদটা ঐতিহাসিক সত্য।

উনিশ শতকে আমাদের দেশের তৎকালীন বাস্তব অবস্থায় সমাজসংস্কার-যুক্তিবাদ-মানবিকবাদ পশ্চিম থেকে আসে নি একথা কি অনেকটা গায়ের জোরে তর্ক নয়? ব্রিটিশের দানের কথা ওঠে না, আমাদের নবজাগ্রত মনের আহরণ শক্তি ছিল তার মূলে। সে-জাগরণ আসছিল পশ্চিমী ভাবাদর্শের সংস্পর্শে, যে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল।" এসব কথা হীরেনবাবুর অজানা নয়। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমী দৃষ্টি কথাটার ব্যাখ্যা তিনি আমার প্রবন্ধ অনুসারে নয়, নিজের মতো করে করেছেন, সেই জন্য তাঁকে আপত্তি জানাতেই হয়েছে।

সমাজসংস্কারের চেষ্টা আমাদের দেশে আগেও হয়েছে, পণ্ডিতী তর্কশাস্ত্রে যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল। মানবিকবাদও একেবারে অজানা বলবার কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও বিশেষজ্ঞ অনেকে বলেন যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'র

মানুষ ঠিক আমাদের সাধারণ অর্থে মানুষ নয়। অতীতের মানবিকবাদ অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ভাসিত, সুতরাং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকবাদ থেকে স্বতন্ত্র। সে যাই হোক মূল প্রশ্ন হল যে উনিশ শতকে আমাদের সংস্কার-মুক্তি-মানবিকতা কি বাস্তব বিচারে দেশের প্রাচীন ধারা ও ঐতিহ্য থেকেই এসেছিল? সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই তো প্রবলভাবে বিরাজ করছিল—অতিপ্রাকৃত জন্মান্তরবাদ, ধর্মের ক্ষেত্রে অধিকারভেদ, মূর্তিপূজা, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা, পণ্ডিতী তর্কের অবাধ স্বাধীনতা সত্বেও ব্যবহারিক জীবনে কঠোর বিচার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, আমরণ বৈধব্য, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সন্ন্যাসী আদর্শ।

পশ্চিমী দৃষ্টিকে ব্যাহত করবার জন্য প্রাচ্যাভিমানই সেদিন প্রয়াস পেয়েছিল সমগ্র ঐতিহ্যকে খাড়া রাখতে। আর ঐতিহ্য থেকে বিস্মৃতপ্রায় অথচ যুগোপযোগী অঙ্গগুলিকে ছেঁকে তুলবার পিছনে ছিল সংস্কার-মুক্তি-মানবিকবাদেরই প্রেরণা, অর্থাৎ নবাগত বিচারবুদ্ধি। রামমোহন রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন ব্রহ্মবাদ হল শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্য, বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন তাঁরা প্রচলিত ঐতিহ্যধারার অনুধাবন করেন নি, করেছিলেন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ। আর গোটা পশ্চিমী সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করার সংকল্প অন্যদেশীয় চিন্তাশীল মনে উঠতেই পারে না, নিজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে যেটা অনেকখানি স্বাভাবিক। পশ্চিমী সভ্যতার গ্লানির সম্মুখীন হওয়া মাত্র আমাদের মনীষীরা সেই বিচারবুদ্ধি দিয়েই সাব্যস্ত করতেন যে এসব হল পশ্চিমী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, পশ্চিমী মানবিকবাদেরই পরিপন্থী। এর প্রতিধ্বনি 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও লক্ষ্যণীয়। অপর সংস্কৃতি থেকে ভালোটা আহরণের চেষ্টা তো চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে সহজ, অথচ অভিমানবশত স্বদেশী ঐতিহ্যের সবটাকে আঁকড়ে ধরার আবেগ দুর্নিবার। চিন্তার রাজ্যে বার বার এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

নতুন আদর্শ বিদেশ থেকে এল কিনা এটা তো ইতিহাসের প্রশ্ন, এতে লজ্জার কিছু দেখি না। চীন বৌদ্ধধর্মকে ভারতীয় বলে বর্জন করে নি, রোমের জগৎ প্রাচ্য খৃষ্টধর্মকে বরণ করেছিল, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম গৃহীত হল দেশ দেশান্তরে। পশ্চিম ইওরোপের রেনেসাঁসে বিজয়ী গ্রীকদৃষ্টি ঠিক বিদেশী না হলেও অতীত কালাগত—খ্রীষ্টীয় দৃষ্টির প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য তাতে বিদীর্ণই হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় পশ্চিম ইওরোপ থেকে শুরু হল,

আধুনিক উদারনীতির জন্ম ইংরাজ বিপ্লবে, আধুনিক গণতন্ত্রের উৎস ফরাসী বিপ্লব। এইসব কথা মোটামুটি স্বীকৃত বলেই এতদিন আমার ধারণা ছিল।

হীরেনবাবুর শেষ আপত্তি হল সমাজবাদকে "প্রাচ্যাদর্শ নয়, পশ্চিমী সৃষ্টির" সঙ্গে সংযুক্ত করার বিরুদ্ধে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক ইওরোপের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পরিণতি এল সমাজবাদে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের The Three Sources and Three Component Parts of Marxism প্রবন্ধটি স্মরণীয়। বলা বাহুল্য আমার উল্লেখিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নের 'অন্তরঙ্গ'টুকু এই মার্কসবাদ। বাস্তব অবস্থা অনুসারে সমাজবাদ নিশ্চয়ই "দুনিয়ার সব দেশেই খাপ খেয়ে যাবার মতো বস্তু", কিন্তু তাতে করে তার পশ্চিম থেকে আগমন কিছু অসিদ্ধ হয়ে যায় না। হীরেনবাবুর বিশ্বাস: "ইওরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না করলেও দেশতাম যে বেদ, উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত।" কী হতে পারত সেটা নিশ্চয় কল্পনার কথা, ইতিহাসের কারবার হল কী হয়েছে তাই নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে দুশন জ্‌ভাভিতেল

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবন নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রগত কারণেই বিড়ম্বিত। যেহেতু সাহিত্য ও সাহিত্যালোচনা জীবন বহির্ভূত নয়, সেহেতু এই বিড়ম্বনার দায় তার উপরেও বর্তেছে। বিশেষত আমাদের সাহিত্যালোচনায় প্রায়শই যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আমাদের মানসক্ষেত্রে ইওরোপে হাস্যকর। কেউ কেউ বটান উচ্চমান সম্পন্ন সাহিত্যের অভাব এর মূলে। কিন্তু এই ঘটনার ভ্রান্তি ধরা পড়ে যখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় অযথা সরলীকরণের ঝোঁক প্রায়ই চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সিভিসের বুনিয়ান মডার্ন আইজ নামক প্রবন্ধটি স্মরণীয়। নির্দিষ্ট ছকে ফেলার ফলে ম্যাকলিশুসের কাছে বুনিয়ানের ধর্মবোধ শ্রেণী-সংঘাতের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর দিকে সরলীকরণের ফলে টিণ্ডল-এর বিচারে বুনিয়ান সাধারণ জনসাধারণেরই একজন। এই সরলীকরণ সর্বদা পরিত্যাজ্য। নির্দিষ্ট ছকে কোনো বড় লেখককে ফেলা যাদের সহজাত, তাঁদের সর্বদাই অবহিত হওয়া উচিত যে উক্ত লেখকের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ হতে পারে, যদিও কেন্দ্র নিশ্চয়ই একটা থাকে। আসলে, ফ্রন্টইয়ার্স অব ক্রিটিসিজম্ নামক প্রবন্ধে এলিয়ট যে কথা বলেছেন সেকথা প্রতি সমালোচকেরই অবশ্য স্মর্তব্য।—সমালোচক শুধু সমালোচনা কৌশলে পারদর্শী নন—তাঁকেও সমগ্র ব্যক্তি হতে হবে, বিশেষ নীতি ও বিশ্বাসে বিশিষ্ট হতে হবে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর প্রজ্ঞায় মুক্ত-দৃষ্টি হতে হবে। এখানে আরও একটি কথা স্মরণীয় যে প্রত্যেক সমালোচককেই উপলব্ধি ও উপভোগের উপর সমান জোর দিতে হবে, নচেৎ সাহিত্যালোচনা শুধুমাত্র ব্যাখ্যায় অথবা ইম্প্রেশনিষ্টিক আলোচনায় নিঃশেষিত হবে।

এলিয়ট কথিত সমালোচকের এই বিশিষ্টতা অর্জন করতে গেলে আমাদের মার্কসবাদের দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত উপায় নেই। কারণ মার্কসবাদ কতকগুলি ফর্মুলা মাত্র নয়। মার্কসবাদের সর্বোচ্চস্তরে সে নিজেই একটি সৃজনাত্মক

প্রজ্ঞা। অতীত সংস্কৃতির বোধগম্যো ও তার সম্পর্কে জ্ঞানার্জনেও মার্কসবাদ সহায়ক। সুতরাং অঙ্ককে চিরগতিশীল বিশ্ব বোঝাতে বা অনুভব করাতে শিল্পী বা সমালোচক মার্কসবাদকে একটা উন্নততর উপায় হিসাবে পায়। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে মার্কসবাদের মৌল পার্থক্য এইখানেই। কারণ বুর্জোয়া ভাবাদর্শ জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের অসেতুলঙ্ঘ্য ফারাকের সৃষ্টি করে এবং সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের ধারাকে স্তব্ধ করে ফেলে। মার্কসবাদের কাছে সংস্কৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল নয়, এতে সমাজের অবদানও স্বীকার্য। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ নিরূপণে মার্কসবাদ যেহেতু অব্যর্থলক্ষ্য, সেহেতু সংস্কৃতিকে সে দেখে সমাজের সামগ্রিক দ্বন্দ্বময় সংঘাত এবং তার শক্তির প্রকাশ হিসাবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে যৌথ উপায়ে সংস্কৃতি সৃষ্টি দুঃসম্ভব। সেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাতেই ব্যক্তি, কাল ও দেশ রূপ পাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্পীদের কাছে মার্কসবাদের মূল্য কী? এক্ষেত্রে মার্কসবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকেই শিল্পীকে মুক্ত রাখে না, জনসাধারণের প্রাণময় সাংস্কৃতিক জীবন লাভ করার জন্য সংগ্রাম ও বিজয়কেও রক্ষা করে! এ ছাড়া, মার্কসবাদ স্পষ্টতই জানিয়ে দেয় যে অতীত সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকেও বর্তমান জনসাধারণ তাদের মুক্তিসংগ্রামের পাথেয় পায় এবং নতুন সৃষ্টিতে মাতে।

বাংলাদেশের কোনো কোনো মার্কসবাদী রবীন্দ্রালোচনায় কখনো কখনো মারাত্মক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিলেন এ কথা সত্য। এই ভ্রান্তির পেছনে নানা কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল। এছাড়া তখনই এবং পরেও মার্কসবাদী সমালোচকরাই এর প্রতিবাদ করেছেন। বিষ্ণু দের তৎকালীন যুক্তিযুক্ত তীব্র প্রতিবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। সুশোভন সরকার ও গোপাল হালদারের স্থিতধী আলোচনাগুলিও ভুলে গেলে চলবে না। এবং রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে মার্কসবাদের সম্বন্ধ যে অহিনকুল নয় তার প্রমাণও আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধাবলী।* তবুও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের মার্কসীয় রবীন্দ্রচর্চা এখনও অংশত বিড়ম্বিত। বামপন্থীমহলে অধুনা ব্যাপক রবীন্দ্রচর্চা নিঃসন্দেহেই পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই রবীন্দ্রচর্চায়

* Dusan Zbavitel লিখিত Archiv Orientalni পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজীতে লেখা ছয়টি প্রবন্ধ।

কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রাশিয়ার চিঠি, যা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী অনন্যসাধারণ লেখাগুলিই কেবল মর্যাদা পায়, তাঁর সুবিপুল মহৎ সাহিত্য উপেক্ষিত হয়। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা তাঁদের স্বকপোলকল্পিত মার্কসবাদে মেলাতে পারেন না তাঁরা তাঁকে এখনও বুর্জোয়া বলেন, আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী তাঁরা তাঁকে প্রায় প্রোলেটারিয়েটের প্রতিভূ করে ছাড়েন। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমই কি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে না। সুতরাং এখনও যখন কোনো কোনো মার্কসীয় সমালোচনায় বিড়ম্বনা দেখা যায়, তখন আমাদের খোঁজ করতে হয় সমাজতান্ত্রিক দেশে রবীন্দ্রালোচনা হয় কিনা, হলে সেখানকার লেখকেরা কিভাবে আলোচনা করেন। এই কারণেই ভুশন জ্‌ভাভিতেল-এর এই প্রবন্ধাবলী আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

যখন এই প্রবন্ধাবলী হাতে এল, তখন মনে মনে একটু সংশয় ছিল। সংশয় দুদিক থেকে। এক, বিদেশী সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঋষি বা মিষ্টিক ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। দুই, সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে এই সমালোচনা এসেছে—আমাদের কোনো কোনো মার্কসীয় সমালোচনার কথা প্রায়ই মনে পড়ছিল। কিন্তু প্রথম প্রবন্ধ পাঠেই বুঝলাম, এর লেখক এই কোনো দলেরই নন। আশ্চর্য লাগল ভুশন জ্‌ভাভিতেল-এর বাংলাদেশ ও ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ বোঝার আগ্রহে। পূর্বে একথা শুনেছিলাম, সমাজতান্ত্রিক দেশে রবীন্দ্রনাথ বহু-আলোচিত ও পরম শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সেই আগ্রহ ও শ্রদ্ধা যে এই স্তরে উঠতে পারে ধারণা ছিল না। বাস্তবিক এমন বিস্তৃত রবীন্দ্র-রচনাবলী পাঠ ও তার মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশেও সুলভ নয়।

এই ছ'টি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভুশন জ্‌ভাভিতেল ১৮৮১—১৯৪১-এর রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাহিত্য ও চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন। নানা দিগন্ত অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বে কিভাবে এলেন তার ধারা তিনি দেখিয়েছেন। আলোচনার বস্তুনিষ্ঠতায় এই প্রবন্ধগুলি অনন্য-বিশেষত যখন ভাবি এগুলি এসেছে একজন বিদেশীর কাছ থেকে।

প্রবন্ধ ক'টি বিভক্ত হয়েছে এই ভাবে—১৮৮১—১৮৯১; ১৮৯১—১৯০৫; ১৯০৫—১৯১৩; ১৯১৩—১৯৩০; ১৯৩০—১৯৩৭; ১৯৩৭—১৯৪১। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি বর্ষাকারের নির্ঘণ্ট।

দুশন জ্‌ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেছেন ১৮৮৭ সাল থেকে। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে ১৮৮৫ সালের পরবর্তী রচনাবলীর তুলনা করলে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয় 'কড়ি ও কোমল'। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনার কারণানুসন্ধান করেছেন সেই সময়কার জাতীয় জীবনের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কথা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি মূল্যবান ফল, দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর ভাষায় "ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়াদের অধিকাংশের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যাবলীর বৃদ্ধি।" ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ সালে প্রকাশলাভ করল রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও সমালোচনা নামক প্রবন্ধ দুটি। 'কড়ি ও কোমলে' দুশন জ্‌ভাভিতেল সবচেয়ে নতুন যে সদর্থক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন, সেটি হল "রবীন্দ্রনাথের জগৎ সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা।" প্রাথমিক ভাবে এই ধারণা দ্বন্দ্বাত্মক এবং ক্রমবিবর্তনশীল। লেখক আরও জানালেন যে, তিনি এই বৈশিষ্ট্যের উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্যসাধনায় এই ধারণা সর্বক্ষণই সক্রিয় ছিল, কখনোই হারিয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যকে অবশ্য জ্‌ভাভিতেল বুর্জোয়াদের উত্থান-সময়ের প্রগতিশীল চিহ্ন হিসাবেই দেখেন। এবং 'কড়ি ও কোমলে'ই রবীন্দ্রনাথের মানবেতিহাসের প্রগতিশীলতার গভীর বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পান। যদিচ এই বিশ্বাস ভাববাদে শেষ হয়েছে তথাপি এই বিশ্বাসের জোরেই, জ্‌ভাভিতেল মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক অন্য সব চিন্তানায়কদের থেকে অনেক বেশী মুক্ত দৃষ্টি হয়েছিলেন। 'কড়ি ও কোমল', তিনি আরও জানালেন, তৎকালীন উঠতি বুর্জোয়াদের উৎসাহ ও সম্ভাবনাময় আশার প্রকাশ।

এই প্রবন্ধেই দুশন জ্‌ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেন। বলেন, "যখন আমরা তার নাটককে ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্যের দিক দিক থেকে বিচার করি, তখন আমাদের সিদ্ধান্তকে অনেক পরিমাণে সংকুচিত করতে হবে।" এর কারণ স্বরূপ জানান যে, ভারতীয় নাটকে নাটকীয় টানাপোড়েনের প্রয়োজন হয় না। ঘটনার দীর্ঘ বিবরণেই কাজ চলে। মঞ্চে ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত না হলেও ক্ষতি নেই এবং নাটকীয়

ঘটনা অপেক্ষা ভারতীয় নাটকে ভাব বা আইডিয়ার উপরই জোর দেওয়া হত বেশি। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ ও ১৮৯০ সালে। এদের অ্‌ভাভিভেল "পাঠ্য নাটক" হিসাবেই দেখেন। 'বিসর্জনে', নাটক হিসাবে নানা ত্রুটি থাকলেও, সংকীর্ণ ধর্মবোধ বা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রতিবাদের মূল্য তিনি স্বীকার করেন। বস্তুত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর সংগ্রামকে অ্‌ভাভিভেল বার বার তুলে ধরেছেন।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত হল 'মানসী'। থিম-এর দিক থেকে অ্‌ভাভিভেল মনে করেন 'মানসী' প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই রবীন্দ্রনাথের আগের কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং মোটামুটিভাবে 'কড়ি ও কোমলে'র উন্নতির [illegible] থেকে বিচ্যুত নয়। 'মানসী'তে স্পষ্টভাবে দেখা গেল, ভারতীয় তথা বাঙালী মেয়েদের দুর্ভাগ্যের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে অ্‌ভাভিভেল নববঙ্গ দম্পতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু 'মানসী' সম্পর্কে লেখক শেষ কথা বলেছেন যে যদিচ তিনি 'মানসী'র সদর্থক গুণগুলির উপর বেশি জোর দিয়েছেন, তথাপি 'মানসী'তে ভাবগত ও শিল্পগত স্বল্পমূল্যের কবিতাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। এবং দুর্ভাগ্যত এই কাব্যগ্রন্থে এই ধরনের কবিতাও যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই সময়ের রবীন্দ্রনাথের রচনায় দুটি সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—এক, জীবন ও তার স্বতন্ত্র ঘটনাগুলি (typical facts) সম্পর্কে তাঁর অপর্যাপ্ত জ্ঞান; দুই, বাস্তব ও দৃঢ় ভাবাদর্শের অভাব। এইখানে এসে প্রথম প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুর যাত্রা করেন।

প্রথম প্রবন্ধটির এই বিস্তৃত আলোচনার প্রধান কারণ, দুশন অ্‌ভাভিভেল-এর আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধেই পাই। শিল্প হিসাবে সাহিত্যের বিচার তিনি করেন নি। মানসীর শিল্পমূল্য সম্পর্কে এক কতকগুলি কবিতার "smaller artistic value-র" উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। পরবর্তী আলোচনাতেও সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে বিশেষ বিচার করেন নি। কচিৎ উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র' সম্পর্কে, 'চেতালী' প্রসঙ্গে। 'মেঘ ও রৌদ্র' সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে গল্পটির গঠন কৌতূহলোদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ গল্পে সমগ্র মনোযোগ দেন ঘটনাগতির উপর এবং সেটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে

'রৌদ্র ও মেঘের' প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, তৈরি করেছে সমগ্র গল্পের পটভূমিকা, ইঙ্গিত করেছে শশীভূষণ ও গিরিবালার অবস্থা পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের, বিশেষত তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের। চৈতালী প্রসঙ্গে তিনি জানান যে 'চৈতালী'কে সনেট হিসাবে বিচার করলে ভুল করা হবে। কারণ 'চৈতালী'র আঙ্গিকরীতি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। 'চৈতালী'র প্রায় কবিতাই "consist of seven parts, seven ideas or pictures, comprising couplets, each rhyming differently. The whole poem has then, in general, an ascendent tendency up to the final couplet containing the main point'"

সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের বিচার না করলেও কয়েকটি মৌলিক কারণে যান্ত্রিক-বস্তুবাদী আলোচনা থেকে (যা আমাদের দেশেও কখনো কখনো দেখা যায়) দুশন জ্ভাভিতেল-এর আলোচনা পৃথক। প্রথমত তিনি রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কী প্রোলেটারিয়েট নিছক তার আলোচনায় দায়িত্ব শেষ করেন নি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের পর অসামান্য 'রাশিয়ার চিঠি' বা অসাধারণ কবিতাগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেন নি। রবীন্দ্রকাব্য বা চিন্তাধারার ক্রমানুবর্তনেই যে তারা এসেছে সেকথা জানিয়েছেন। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ধর্মবোধ সম্বন্ধে তিনি সজাগ। এবং চতুর্থত রবীন্দ্রকাব্যে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে তিনি দেখেছেন মানবতা বা হিউম্যানিজমকে।

এবার দুশন জ্ভাভিতেল-এর কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য উক্তির দ্বারা তাঁর বিশিষ্টতা দেখানো যেতে পারে।

জ্ভাভিতেল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেন। উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লিরিক্যাল—এই বহুপ্রচলিত উক্তিটি তাঁর লেখায় দেখি না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলীর বাস্তবতা, সামাজিক মূল্য বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রগুলি তাঁর কাছে "life-like and realistic in the deepest sense of the word." এই গল্পাবলীতে সামাজিক অত্যাচার, রক্ষণশীলতা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন, স্বাভাবিক কারণেই জ্ভাভিতেল সে সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। সোনার তরীও তাঁকে আকর্ষণ করে এর pastoral element-এর জন্য। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন

রবীন্দ্রকবিতায় এই গুণ এই প্রথম দেখা গেল। রবীন্দ্রকাব্যে এই নতুন বৈশিষ্ট্য কবির গ্রামজীবন ও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল। 'চিত্রা'র বহু আলোচিত 'জীবনদেবতা' প্রসঙ্গে দুশন জ্‌ভাভিতেল-এর উক্তি আশ্চর্যভাবে নতুন ও যুক্তিসহ। প্রথমত তিনি মানেন না যে জীবনদেবতা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে এই তত্ত্ব চিত্রারই মাত্র কয়েকটি কবিতায় সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে রবীন্দ্ররচনাবলীর পাঠক ও ছাত্রবৃন্দ এই তত্ত্বকে অযথা অতিমূল্য দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি জীবনদেবতা তত্ত্বের কারণ অনুসন্ধান করেন। তখনকার রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থাই এর মূলে বলে মনে করেন জ্‌ভাভিতেল। এই সময়ে রবীন্দ্রমানসে যে নির্জনতার সাক্ষাৎ মেলে তার কারণস্বরূপ লেখক বলেন—রবীন্দ্রনাথের গ্রামজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেখানকার জনসাধারণ। অবশ্য জ্‌ভাভিতেল এই সময় রবীন্দ্রনাথের "preoccupation with himself"-কেও জীবনদেবতা তত্ত্ব উদ্ভবের কারণ হিসাবে দেখেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই জীবন-দেবতার ছায়ামুক্ত হলেন এবং দুশন জ্‌ভাভিতেল টমসন সাহেবের সঙ্গে একমত যে এই উৎক্রান্তিই মানুষ এবং কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। জীবনদেবতা-পর্যায় অতিক্রম করার প্রয়াস 'চিত্রা'তেই আছে—উদাহরণস্বরূপ জ্‌ভাভিতেল উল্লেখ করেছেন 'এবার ফিরাও মোরে', 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'র। 'দুই বিঘা জমি' প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল বলেছেন "the first social ballad in Tagore's work and worthy counterpart to the best of his short stories." পরের গ্রন্থ 'চৈতালী'র 'জাতীয়তাবাদী কবিতাগুলি' সম্পর্কে তিনি জানান যে স্বদেশকে মহত্ত্বে দীক্ষা দেবার জন্য স্বদেশবাসীর কাছে স্বাবলম্বনের ডাক দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে 'মানসী' থেকে রবীন্দ্রনাথ আরও অগ্রসর হয়েছেন। উদাহরণ বঙ্গমাতা কবিতাটি। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কল্পনা'য় জ্‌ভাভিতেল সাক্ষাৎ পেলেন "a new anti British note"-এর। এর কারণ তিনি অনুসন্ধান করেন উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেসে যে পরিবর্তনগুলি আসে তার মধ্যে। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত কণ্ঠরোধ নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ ও উদ্ধৃত করেন জ্‌ভাভিতেল। উনিশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বৈশিষ্ট্য হিসাবে জ্‌ভাভিতেল দেখেন সজীব আশাবাদ,

জীবনের তুচ্ছতম দানেও আনন্দলাভের ক্ষমতা এবং এর ফলে বিশ্বসৌন্দর্য ও সাধারণের কাছে তার প্রকাশ।

এর পর 'কণিকা'র সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন। জ্‌ভাভিতেল মনে করেন "কণিকা" রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার গ্রন্থ। 'কণিকা'র চলতি ভাষার কথাও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে দুশন জ্‌ভাভিতেল যে যথার্থ কাব্যরসিক তার পরিচয় 'কণিকা' সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিতে তিনি দিয়েছেন। কারণ আমরা সাধারণত 'কণিকা'র অসামান্যতাকে আমল দিই না। বস্তুত জ্‌ভাভিতেল যে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন যথার্থ মার্কসবাদী লেখক তার প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রকাব্যে জাতীয়তাবোধের ক্রমবর্ধমান স্থানলাভের উপর জ্‌ভাভিতেল বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'কল্পনা'র পরবর্তী 'কথা ও কাহিনী'। এই প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল জানিয়েছেন যে এই কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক চেতনাই বেশি সক্রিয়। জাতীয়তাবোধের প্রত্যক্ষ ফল 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি। বিশেষত রাজস্থানী ও মারাঠী কাহিনীসমূহের অবলম্বন। 'নৈবেদ্যে' ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের।

১৮৯১-১৯০৫ সালের মধ্যে রচিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, পাওয়া গেল সামাজিক বাস্তবতা, ঘনিষ্ঠ জীবনচেতনা (though following the religious conceptions) এবং জাতীয়তাবোধ।

শ্রীযুক্ত জ্‌ভাভিতেল আবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের, বিষয় ও আকারে, 'religious creation'-এর চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষ্য করেও জ্‌ভাভিতেল বললেন যে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব বা মিস্টিক কবিস্বভাব এই কবিতাগ্রন্থে প্রাধান্য পেলেও রবীন্দ্রনাথের দেশ ও মানুষের প্রতি আগ্রহ এই ঝোঁককে ব্যাহত করেছে। এবং এইজন্যই কবি ঈশ্বরকে এই পৃথিবী এবং তার দুঃখকষ্টের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। তিনি আরও জানালেন যে 'গীতাঞ্জলি'তে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা মোটেই আধ্যাত্মিক নয়। কবিতাগুলির ঐক্য নষ্ট না করলেও উপরিউক্ত মানব ও দেশের প্রতি আগ্রহই এখানে স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে জ্‌ভাভিতেল 'গীতাঞ্জলি'র একশ ষাট সংখ্যক কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে জ্‌ভাভিতেল-এর উক্তি সঠিক।

'গীতাঞ্জলি'র একষট্টি সংখ্যক কবিতাটিও পূজার কিংবা আধ্যাত্মিক নয়। এই কবিতাটিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই গান হিসাবে প্রেমের পর্যায়ে ফেলেছেন (গীত-বিতান ২য় খণ্ড, প্রেম ২৮৭)। শুধু তাই নয় ভারতের বর্ণভেদ, অধিকাংশ জনসাধারণকে অস্পৃশ্য করার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার শোনা গেছে এই কবিতাগ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত একশ' সাত সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপে এই গ্রন্থের অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার কারণ নির্দেশেও তিনি যথার্থ-দক্ষ। (যদিও মূল 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতা ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে নেই)। তিনি বলেন যে নিঃসন্দেহভাবেই কবিতা নির্বাচনে (গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমাল্য থেকে) রবীন্দ্রনাথ "সার্থক" হয়েছিলেন। কারণ তৎকালীন আগত যুদ্ধে সশঙ্ক পশ্চিমী বুর্জোয়া সমাজ এই ধর্মভাবসম্পন্ন কবিতায় অবলম্বন পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যত রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বা তাঁর দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় যুদ্ধোপাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপ সেদিন পায়নি। পূর্বে একজায়গায় বলেছি যে কুভাভিভেল সাহিত্য শুধু সাহিত্য হিসাবে বিচার করেন না; তাই 'গীতিমাল্যে'র শিল্পগত মূল্যকে স্বীকার করেও, গ্রন্থটিকে উচ্চমূল্য দিতে পারেননি—কারণ এদের বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শ।

'গীতাঞ্জলি' থেকে 'বলাকা'য় উৎক্রান্তির ব্যাখ্যা হিসাবে কুশল কুভাভিভেল বের্গস' কিংবা গীতিতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। সরাসরি জানিয়েছেন যে সবার উপরে, নিঃসন্দেহভাবে, রবীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠা তাঁকে ফিরিয়ে আনে স্বদেশ ও দেশবাসীর মাঝখানে। সৃজনাত্মক স্বাতন্ত্র্যে, বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আত্মমগ্ন হয়ে থাকার কবিস্বভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না। সুতরাং 'গীতাঞ্জলি, গীতালি', 'গীতিমাল্যে'র আধ্যাত্মিকতা থেকে কবি ফিরে এলেন বাস্তব জগতে, দেশের মাটিতে। ক্রমে প্রকাশিত হল 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪), 'বলাকা' (১৯১৬) এবং 'পলাতকা' (১৯১৮)। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে "a more vigorous and radical" মনোভাব দেখা গেল। এই গল্পগুলিতে সরাসরি হিন্দুসমাজকেই সমালোচনা করা হল। ভারতীয় সাহিত্যে ও সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় critical realisim-এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

এই সময়েই প্রকাশিত হল 'ঘরে বাইরে'। (যখন ভারতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী হয়েছে)। এই উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্যে সন্দেহ প্রকাশ করলেও কুভাভিভেল এর

ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেন। এ ছাড়া, এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৪), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), 'শোধবোধ', 'নটীর পূজা', 'চিরকুমার সভা', 'তপতী', 'পরিত্রাণ' এবং 'রথযাত্রা'। স্বাভাবতই জ্‌বাভিতেল 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' ও 'রথযাত্রা'কে (১৯৩২ সালে পরিবর্তিত 'কালের যাত্রা') মূল্য দিয়েছেন বেশি এবং তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী 'কালের যাত্রা'র মূল্য অপরিসীম। 'কালের যাত্রা' "One of the keys to the comprehension of Tagore's conception of the world and politics." আরও বলেছেন 'কালের যাত্রা'য় যে সমাজ ও তার শক্তি এবং শ্রেণীর যে চিত্র পাওয়া যায় সে চিত্র মুমূর্ষ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবচিত্র। আবহাওয়া সৃষ্টিতেও এই নাটক বাস্তবানুগ—পারস্পরিক অবিশ্বাস, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ সবকিছুই সততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

পরবর্তী দুটি প্রবন্ধে অর্থাৎ ১৯৩০ ও ১৯৩৮—'৪১—রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের এই অধ্যায়ের আলোচনায় দুশন জ্‌বাভিতেল আশ্চর্য মননশীলতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আবেগদীপ্ত গদ্যে ভারতীয় মহাকবির অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নতুন দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের তীর্থযাত্রা—তাঁর উপর রাশিয়া ভ্রমণের প্রভাবের আলোচনা করেছেন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণ তাঁর নতুন চিন্তাধারার উৎস হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অবশ্য "did not cause any radical change in Tagore's views nor did they shake his idealistic religio-philosophical conceptions." কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ "underwent clearly a discernable changes after visit to the Soviet union." জ্‌বাভিতেল-এর এই উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত পদ্ধতি এবং ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মৌল পার্থক্য বুঝতে পারলেন। স্বাভাবতই তিনি এই ফলাফলের তুলনা করলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ শাসনকে ঘৃণা করলেন। অন্যদিক থেকেও সোভিয়েত ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্ররচনাবলীর বিশতম খণ্ডে চারশ' ত্রিশের পৃষ্ঠায়। এছাড়া সোভিয়েত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় সম্পর্কে নতুন আশা, নতুন প্রত্যয় এনেছিল। এই আশাতেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রাজনৈতিক কার্যাবলীতে উৎসাহ পেলেন। এবং বৃদ্ধ কবিকে দেখা গেল

৪

স্পিজলী বন্দীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনুমেন্টের পাদদেশে বজ্রকণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে কবি এসে দাঁড়ালেন জনসাধারণের কাছে, দেশের মাঝখানে। এ প্রসঙ্গে অ্যালেক্সান্দ্রভ 'বাঁশি' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। আধুনিক মহৎ শিল্পীর যে পথ হওয়া উচিত সে "রাস্তা মানুষের দিকে"।—আধুনিক মহত্তমশিল্পী রবীন্দ্রনাথও সেই পথেই নেমে এলেন। রাশিয়ার নতুন জীবন দেখে শুধুমাত্র চিন্তায় তীব্র পরিবর্তন এল না, প্রকাশেও দেখা গেল বিপ্লবী প্রচেষ্টা। সত্তর বৎসর বয়সে একান্ত নিজস্ব যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্তিতে কবি গদ্যছন্দের প্রবর্তনা করলেন। লেখা হল 'পুনশ্চ'—সাধারণ মেয়ে এবং একজন লোক এই কাব্যগ্রন্থের চরিত্র। এই সাধারণ নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ তাঁর লেখায় প্রায়ই পাওয়া যেতে লাগল। গুণগত পার্থক্য থাকলেও 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়', 'বাঁশরী' এবং 'চণ্ডালিকা'—'পুনশ্চ' যে প্রেরণায় লেখা হয়েছে সে প্রেরণারই সৃষ্টি।

১৯৩২-৩৩ সালে আন্তর্জাতিক আকাশে ঘনিয়ে এল দুর্যোগের মেঘ। এই সময় থেকে বারবার ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কৃত করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব অকস্মাৎ আসে নি। "It was only the logical culmination of the development of Tagore's political and philosophical conceptions that he, from the very beginning, did not hesitate to oppose fascism whose barbarous inhumanity and use of force was in direct contradiction to Tagore's deep humanism"—তখন অ্যালেক্সান্দ্রভ-এর এই উক্তি স্মরণীয়।

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হল 'পত্রপুট'। রবীন্দ্রনাথের "ইতিহাস সচেতনতা" প্রকাশ্যভাবে দেখা দিল। এবং আন্তর্জাতিক সমকালীন ঘটনা তাঁর কবিতায় প্রায়ই ছায়া ফেলতে শুরু করল। ১৯৩৭-এ কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিশ্বের দানবদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ক্লান্তিহীন। নাগিনীর নিঃশ্বাসের বায়ুকে ঝড়ে উড়িয়ে দেবার জন্য ডাক পাঠালেন ঘরে ঘরে, 'সেঁজুতি'র জন্মদিন (১ম) কবিতায়। রোগশয্যায় শুয়ে রাশিয়ার দানব প্রতিরোধের অদম্য ও তুলনাহীন প্রচেষ্টায় আনন্দে উদ্ভাসিত হলেন—সজ্ঞানে, সহজে স্পষ্টভাবেই তাঁর রাশিয়াপ্রীতির কথা জানালেন এর পাশাপাশি শান্ত সাধারণ বাংলার

গ্রামজীবনের "চলতি ছবি" ধরা পড়ল তাঁর সাহিত্যে। এমন কী যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের মধ্যেই মানুষের সব দুর্দশার শেষ বুঝেছিলেন তিনিই আশ্চর্য বস্তুদৃষ্টিতে জানালেন যে তথাকথিত 'কালচার' অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় অস্তিত্বরক্ষার্থে সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের। যার উপর সমাজের, জাতের উপস্থিতি বাঁচে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে, যে অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তা অতিক্রমের অদম্য প্রয়াস পান, আশ্চর্য সুন্দরভাবে বলেছেন দুশন জ্বাভিতেল। রবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তির অসামান্যতায়, মানবতায়, মানুষের পক্ষে, সুন্দরের পক্ষে, প্রকৃতির পক্ষে ক্লান্তিহীন সংগ্রামে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন; বলেছেন, "তাঁর মৃত্যু, নীহাররঞ্জন রায় যেমন বলেছেন, ঐ বৃদ্ধ বয়সেও প্রকৃতপক্ষে অকালমৃত্যু।" কারণ শেষ জীবনের রচনাবলী পরিষ্কারভাবে দেখায় যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবে বৃদ্ধ হন নি। আশ্চর্য আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিতে তিনি শুধু সময় ও তার শিল্পস্রোতের সঙ্গে সমান তালে চলেন নি, প্রায়ই বিভিন্ন দিকে "সময়কে ধরে এবং পিছনে" ফেলে গেছেন এবং এতেই, মায়াকভস্কি যা চমৎকারভাবে বলেছেন, "কবির শক্তি নির্ভর করে।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কী নিষ্ঠার সঙ্গে জ্বাভিতেল রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করেছেন। জ্বাভিতেল-কৃত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর আলোচনা করা হয় নি—এই প্রবন্ধ আলোচনাতেও তিনি রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। জ্বাভিতেল-এর এই অসামান্য প্রবন্ধাবলীর আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানার পূর্বে যে সামান্য আপত্তি আছে—সেটা জানিয়ে নিই।

রবীন্দ্রালোচনায় বিষ্ণু দের একটি উক্তি সর্বদা স্মরণীয়। সেখানে তিনি তাঁর অনবদ্য গদ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জানান, "ধার্মিক বামপন্থী' ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ততন্ত্র সমাজের অবশেষ ও; বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব এসব কথা তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয় তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মূলে ছিল, যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষ তত্ত্বমাত্র ছিল না, ছিল জীবনের উদারনীতির

সত্য। তবু তাঁর প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।" এই উক্তি বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় সমালোচককুলেরই অবশ্য স্মর্তব্য। এবং জ্বাভিতেলও মাঝে মাঝে এই কথা ভুলে গেছেন। বুর্জোয়া সংকীর্ণ মনকে রবীন্দ্রনাথ কাটিয়ে উঠেছেন একথা স্বীকার করেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধের কারণ স্বরূপ দেখেন "indefiniteness of class bias." সামন্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বুর্জোয়া সমাজের প্রতি আকর্ষণ পরে humanism ও genuine humanity-র জোরে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনকে অতিক্রম—লেখকের মতে এই ত্রিবিধ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধ এসেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যদিও কদাচিৎ, জ্বাভিতেল রবীন্দ্র ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন করেছেন ও কিছুটা যান্ত্রিক। এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক-ছোটোগল্প-কবিতা প্রবন্ধ-উপন্যাসের আলোচনা করলেও জ্বাভিতেল রবীন্দ্রনাথের গানকে আলোচনায় আনেন নি। অথচ তাঁর গানে এমন বিশিষ্টতা আছে, যা সাহিত্যে বিরল। এখানে স্বরণীয় যে ইওরোপের ইতিহাসের মতো, সামন্ত-বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক যুগ-বিভাগকে ভারতবর্ষে সেভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়—কারণ এদের ইতিহাসে মৌল পার্থক্য বিদ্যমান।

বাস্তবিক মাঝে মাঝে যে সমাজচিত্রণে নয়, বাস্তবতার নৈঃসঙ্গ্য বা মন্ত্রণার মুকুরে দেশ-কাল-সমাজ আরও স্পষ্টভাবে ছায়াপাত করে—এ-কথাটি তুখন জ্বাভিতেল আদপে আমলে আনেন নি। মহৎ শিল্পীর বিকাশ যে জটিল পন্থায় ঘটে একথা ভুলে যাবার দরুন ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ-চিত্তের দিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় তিনি শুধু জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দেখেন, রবীন্দ্র-মানসের কোনো পরবর্তী রূপ নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, ব্যক্তির নিজেকে অন্বেষণ—এসবের কোনো স্বতন্ত্র মূল্যই দেন না তুখন জ্বাভিতেল। তাই 'একটি আষাঢ়ে গল্প' বা 'তাসের দেশ' যে মর্যাদা পায় তাঁর কাছে, 'নষ্টনীড়' তা পায় না। অথচ 'নষ্টনীড়'-এর অসাধারণত্ব উদাসীন পাঠককেও মুগ্ধ করে। এই ঝোঁকের জন্য জ্বাভিতেল-এর এই অনবদ্য লেখা মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনায় আক্রান্ত।

তাঁর এই বিড়ম্বনা প্রকট হয়েছে 'ডাকঘর', 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' সম্পর্কে মন্তব্যে। 'ডাকঘর' সম্পর্কে তিনি লেখেন "the poet certainly also wanted to ridicule the medical "science" which tries to replace proper medical treatment by Sanskrit formulas and anxiously

protects the patient from fresh air and sun and yet, at last, he admits that the representative of the medicine was right—by the death of Amal who was killed by the interference of Thakurdada and the king's doctor." "সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের নামে কল্পিত ছকে" ফেলতে গিয়ে কী অদ্ভুত উক্তিই না করে বসেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় 'ডাকঘর'-এর মূল বক্তব্য তাঁর বিচারে মর্যাদা পায় নি।

'চতুরঙ্গ' প্রসঙ্গে বললেন যে এর বিষয়বস্তু যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি সাহসিক। গ্রন্থের প্রথম পর্বে কোনো সন্দেহই নেই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি কত মূল্য দেন মানবতাবাদী জ্যেঠামশায়কে। "But the sudden, also psychologically, rather improbable 'reformation' of sachis in second chapter considerably weakens the plot of the novel". "And so the work does not—and with Tagore cannot end in the victory of atheism over religion, does not put atheism higher than religion." আরও বলেন যে 'চতুরঙ্গ' "is a conflict between practical and active atheism and the two forms of Hinduism—orthodoxy and exalted Vishnuism." কিন্তু 'চতুরঙ্গ'-এর সমস্যা কী এই? শচীশের ব্যক্তিত্বের মন্ত্রণা, তার নিজেকে অন্বেষণ—এ সব-কিছুই মূল্যহীন মনে হল লেখকের কাছে। শ্রীবিলাসের সাধারণত্ব, উপন্যাসের শেষে দামিনীর সাধারণ সংসারেই ফিরে আসার ব্যঞ্জনা—সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হল। নচেৎ 'চতুরঙ্গ' যে পৃথিবীর সাহিত্যেরই একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি একথা তিনি মানতেন।

শেষ পর্যন্ত জ্বাভিতেল 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'কে একাকার করলেন এবং মন্তব্য করলেন যে "both of these books are colourfal though not particularly deep, pictures of the life of the well-to-do clasess of Bengali society." 'যোগাযোগ' সম্পর্কে এই উক্তি সকল রবীন্দ্র-পাঠকের কাছেই অগ্রাহ্য মনে হবে। কুমুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মধুসূদনের সংঘাত, একটি জীবনের প্যাটার্নের সঙ্গে অন্য একটি প্যাটার্নের দ্বন্দ্ব, ভালোবাসতে চাইলেও যে ভালোবাসা যায় না তার আশ্চর্য চিত্র—সবই দুশন জ্বাভিতেল-এর চোখ এড়ান। এমন কী মধুসূদনের মধ্যে উঁচিত্ত অথচ সৎ

বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর চিত্রও যে কী করে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল—বোঝা যায় না।

'গোরা' সম্পর্কেও মামুলী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন "we have already mentioned the excessive space devoted to theoritical discussions which hold up the action. The worst fault in the conception of the novel is that Gora is liberated from the grip of orthodoxy without his own effort…" আশ্চর্য যে গোরার অস্থিরতা, তার যন্ত্রণা, তার জীবনের পরিহাস কিছুই লেখকের দৃষ্টিগোচর হল না। সবধর্ম ত্যাগ করে গোরার মানবধর্মে উত্তরণ—সবই তাঁর চোখ এড়াল। বুঝলেন না, "গোরা, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু'ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টার আমাদের জাতীয় রূপকও বটে।"

নাটকের আলোচনাতেও, কদাচিৎ যদিও, একই বিড়ম্বনা। অবশ্যই 'কালের যাত্রা'র গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কিন্তু নাট্যগত উৎকর্ষের আলোচনা বাদ দিয়েকে 'কালের যাত্রা'কে শুধু ভাবাদর্শের, ধনতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব চিত্রণের (এটি যদিও মূল্যবান) কারণে 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা'র উপরে স্থান দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? 'পূরবী'র বৈশিষ্ট্য উপেক্ষায়ও একই নীতি কাজ করেছে।

বস্তুত শুদ্ধ সাহিত্যালোচনা যদিও সম্ভব নয়, তবু শুধু ভাবাদর্শের সাহায্যে, শুধু সমাজ বিশ্লেষণে—সাহিত্যকে বিচার করলে এই ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের বিচার সাহিত্য হিসাবে—নচেৎ নিছক শুদ্ধতম জীবনদর্শন সম্বল করেও সাহিত্যে স্থায়ীকীর্তি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "শিল্প সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল"—সেখানে কোনো প্রকার সরলীকরণই বিড়ম্বনাময়।

কিন্তু এহ বাহ্য। কারণ এই সামান্য সীমাবদ্ধতা সত্বেও ডুশন জ বাভিতেল-এর আলোচনার মূল্য অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও চিন্তার, বক্তব্য অভিব্যক্তির, কবির নিজ সীমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও তা অতিক্রমণের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় ডুশন জ বাভিতেল শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজনই নন, শ্রদ্ধাভাজনও বটে। এছাড়া, এমন বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সাধারণ মূল্যও

অপরিসীম। অনন্যসাধারণ স্বচ্ছদৃষ্টিতে জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন—সারাজীবনের বিরোধ কাটিয়ে শেষ জীবনে আশ্চর্য সমন্বয়-সাধনে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে ওঠার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের উপর এমন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের অশ্রুতপূর্ব মহত্ত্বের যথার্থ কারণ নির্দেশ আমাদের দেশেও দুর্লভ। সবশেষে, বর্তমান প্রবন্ধকার চমৎকৃত হয়েছেন দুশন জ্‌বাভিতেল-এর রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠের গভীরতায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহে।

"Tagore became (দুশন জ্‌বাভিতেল বলেন) the truly national poet of Bengal; when his best works have been made accessible to the world in good translations—which has so far happened only in few cases—a desirable and much needed revision of the distorted 'western' conception of the great personality of world culture will follow. And towards the goal especially, this present work wishes to make a modest contribution."

এরপর দুশন জ্‌বাভিতেলকে জানাতে হয় অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সমাজতান্ত্রিক দেশের এই মানুষটি বাঙালীকে শুধু তাঁর কাছেই ঋণী করলেন না, বাঁধলেন তাঁর দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে।

আশা করি, দুশন জ্‌বাভিতেল রবীন্দ্রনাথের উপর আরও লিখবেন—ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়, তাঁর নিজের ভাষা চেক-এ।

পুস্তক পরিচয়

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা। ছয় টাকা ॥

এ তথ্য স্বীকার্য বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস নিয়ে আলোচনা যত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে তাঁর মননশীলতার দিকটি তেমনভাবে আলোচিত হয় নি। বঙ্কিম শুধু artist ছিলেন না, thinkerও ছিলেন একথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণারও শেষ নেই সেজন্য। রক্ষণশীল, সনাতনী, প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রভৃতি বিশেষণও বঙ্কিমের নামের সঙ্গে অনেকে সংযুক্ত করে থাকেন। বলা বাহুল্য তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের পটভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন নি এবং ঐ শতকের অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীদের রচনার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে বঙ্কিমের যথার্থ মূল্য নিরূপণে অগ্রসর হন নি। অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার, রমেশচন্দ্র বসু প্রভৃতি লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতার প্রসঙ্গ নিয়ে ভালো আলোচনা করেছেন। শ্রীভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' এই ধারার বই এবং সেজন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

বইখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মননসাধনার অনুবর্তী হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার পর্যালোচনা পরিশিষ্টরূপে গ্রথিত হয়েছে। লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে রামমোহন ও 'ইয়ংবেঙ্গল'দের যুগে, যে-মননচর্চা ও সমাজচিন্তা লক্ষিত হয় ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও মননধর্মে তারই সুপরিণত প্রতিষ্ঠা। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে রামমোহন, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির চিন্তায় ও রচনায় মননচর্চা, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানসেবা, পুরাতত্ত্বানুশীলন যে-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে নবজাগরণের তথা যুক্তিধর্মিতার যুগ বলে আখ্যাত

কথা অনৈতিহাসিক নয়। পরলোকের চেয়ে ইহলোক, আধ্যাত্মিক-পন্থার চেয়ে বুদ্ধি ও যুক্তিপন্থা, তথাকথিত পুণ্যার্জনের চেয়ে মস্তিষ্ক, পেশী ও হৃদয়-বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধন, দেবভক্তি অপেক্ষা নরকল্যাণ—এর সবই রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় নানাভাবে দেখা দিয়েছে। 'বঙ্কিমযুগের মননসাধনা' অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গগুলো আলোচিত হয়েছে। লেখক পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ শশধর-কৃষ্ণপ্রসন্ন-রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের শ্রেণীভুক্ত নন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরানুগত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস থেকে মুক্ত।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-নায়কদের কথা মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থের নাম-পত্রে আচার্য সীলির উক্তি উৎকলিত হয়েছে। সীলি (১৮৩৪—১৮৯৫) বঙ্কিমচন্দ্রের সমজীবী। তাঁর Ecce Homo (১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল, সীলির Natural Religionও (১৮৮২) বঙ্কিমচন্দ্রের অনধীত ছিল না। সীলি খ্রীষ্টকে 'মানব' হিসাবেই দেখেছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। সীলি ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনিও তাঁর Natural Religionকে সকল অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে দেখেছেন। সীলি 'কালচার'কে (বঙ্কিমের ভাষায় 'অনুশীলন') ধর্মের ফলস্বরূপ বলে মনে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনেকটা সে-পথে গিয়ে গীতার কর্মযোগকে মুখ্যত গ্রহণ করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের শিক্ষাদান-নীতি তার নিদর্শন। শুধু সীলির রচনা নয়, কোম্‌তে, হিউম্‌, বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, স্পেনসর প্রভৃতির রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কোম্‌তের মত একদা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। ইংলণ্ডে positivist গোষ্ঠী যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জর্জ হেনরি লিউয়েস, জর্জ এলিয়ট, হ্যারিয়েট মার্টিনো এবং রিচার্ড কনগ্রিভের নাম উল্লেখযোগ্য। কোম্‌তের মতবাদই ইংলণ্ডে ১৮৩৭ থেকে প্রচারিত হতে থাকে। তাঁর 'Cours de Philosophic positive' ১৮৪২-এ সমাপ্ত হয়। ক্যাথলিক-পন্থী ঈশ্বরতত্ত্বের পরিবর্তে কোম্‌তে মানবতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশেও ঊনবিংশ শতকে অনেকে পজিটিভিষ্ট ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। মিলের সঙ্গে কোম্‌তের মতৈক্য, পরে মতানৈক্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে সমষ্টিবাদ ও ব্যষ্টিবাদের সামঞ্জস্যসাধন প্রচেষ্টা

লেখক যথোপযুক্ত তথ্য দ্বারা বিবৃত করেছেন তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের অনিবার্য পরিণতি লামার্ক, ডারউইন, স্পেনসার, ই়ুয়ার্ট মিল প্রভৃতির রচনায়। হর্বার্ট স্পেনসার অভিব্যক্তিবাদ বা evolution-কে মনে করতেন "the law of the continuous redistribution of matter and motion"। তিনি পূর্বেই লামার্কের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ডারউইনের 'origin of species' (১৮৫৯) প্রকাশিত হবার পর তাঁর মতামত আরও সুস্পষ্ট হয়। স্পেনসারের Synthetic Philosophy পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবহারবিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রেই তিনি অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। তিনিও 'সামঞ্জস্যবাদ'-এর পক্ষপাতী। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে স্পেনসার-পন্থার বিরোধ নেই। কোম্‌তের রচনাতেই তিনি অবশ্য প্রথম তাঁর 'অনুশীলন' তত্ত্বের সূত্র পান। পরে বিভিন্ন পাশ্চাত্যমনীষীর রচনা ও ভগবদ্‌গীতার দ্বারা তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট 'জীবনাদর্শ' রূপে গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে ঈশ্বর, পরলোক, আধ্যাত্মিক মার্গের সংযোগ নেই। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইংলণ্ডে 'স্কটিশস্কুল'-এর প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে 'ইউটিলিটারিয়ান'দের প্রতিষ্ঠা ঘটে। জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) এই মতাদর্শের প্রবক্তা এবং তারপর জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) তাঁর ধারাকে চালিয়ে নিয়ে যান। বেন্থাম যদিচ উনবিংশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু তাঁর চিন্তা ও ধারণায় তিনি অষ্টাদশ শতকের Age of Reason-এর মানুষ। রামমোহন রায় বেন্থামের কল্যাণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বেন্থামের মতাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে স্বাভাবিক কারণেই লেখক ইংলণ্ডে উনবিংশ শতকে ধর্মকে নবরূপে গড়বার প্রচেষ্টাগুলির উল্লেখ করেছেন। কার্ডিনাল নিউম্যানের 'Oxford Movement' এই প্রচেষ্টারই ফল। কার্ডিনাল নিউম্যান (১৮০১-৯০)-এর অক্সফোর্ড মুভমেণ্ট ১৮৩৩ থেকে শুরু হয়। তাঁর আন্দোলন, অষ্টাদশ শতকের 'র‍্যাশনালিজম' অর্থাৎ নির্মোহ যুক্তি ও বুদ্ধিগত বিচারপ্রবণতার বিরুদ্ধে—সমালোচক লিখেছেন "but he used reason to maintain beliefs"। বঙ্কিমচন্দ্র আবেগপ্রবণ-ভক্তিবাদকে স্বীকার করেননি, কেশবচন্দ্র সেনের চিন্তার মহিমা স্বীকার করলেও তাঁর সংকীর্তন, প্রত্যাদেশ, নরপূজা প্রভৃতিকে পরিহার করেছেন। অষ্টাদশ শতকীয় মন যেমনভাবে নিউম্যানের "ক্যাথলিক

প্রতিক্রিয়া'কে (Catholic Reaction) স্বীকার করতেই পারে না তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ঐ জাতীয় আবেগাত্মক ধর্মমতে সমর্থন বা আস্থা স্থাপন কোনোটিই সম্ভব ছিল না। লেখক বঙ্কিমমানসের এই দিকটি পূর্বোক্ত অধ্যায় দুটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত রমেশচন্দ্র বসুর আলোচনাগুলি এই সূত্রে মনে পড়ে।

পরের প্রবন্ধটি 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারত সংস্কৃতি'। ভারত-সংস্কৃতি চর্চা নবজাগরণের অন্যতম উজ্জ্বল লক্ষণ এবং সেই চর্চার সূচনাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দান অগ্রগণ্য। কিন্তু নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত জাতি সর্বদেশেই স্বদেশের শাস্ত্র ও সংস্কৃতির নবব্যাখ্যা ও আবিষ্কারে উৎসাহী হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তার ব্যতিক্রম হয়নি। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বিদ্যাসাগর সকলেই এ-বিষয়ে স্মরণীয় ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের ঐতিহ্যকে বরণ করে নিয়ে, তাঁদের চিন্তার অংশভাক্ হয়ে ভারতীয় ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য—সর্ববিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ইংলণ্ডে উনবিংশ শতকে একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। নবীনচন্দ্রকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতে ভারতীয় ইতিহাসের যে খসড়া পরিকল্পনার সন্ধান মেলে, তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আধুনিক' ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয়বহরূপে স্বীকার করতে হবে। শুধু ইতিহাস রচনা নয় ভারতীয় সংস্কৃতির নবব্যাখ্যা, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীপ্ত মানবপন্থী ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারই নিদর্শন। সেজন্য বুদ্ধদেবকে তিনি আদর্শ মানব হিসাবে না দেখে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে ঘোষণা করেছিলেন। কেননা বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী। কিন্তু সংসারে থেকে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সামঞ্জস্যসাধনে পূর্ণ মানবতার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ।

'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধদুটি সুলিখিত। পরিশিষ্টের প্রবন্ধদ্বয় বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনাও তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিসিদ্ধ। বাংলার রেনেসাঁস বা নবযুগের বাংলা সম্পর্কিত রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সমন্বিত বোধের দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই দৃষ্টি ছিল। তবে বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যে বাঙালী chauvinism বহু ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল এবং ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে তিনি গ্রথিত করেছিলেন। পাশ্চাত্যে উনবিংশ শতকে অনুরূপ ঘটনা দেখা গেছে। কাজেই বিপিনচন্দ্র সর্বক্ষেত্রেই যুক্তি ও বিচারবোধের

দ্বারা চালিত হয়েছিলেন একথা স্বীকার করা দুরূহ। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নবজাগরণ-চেতনাও revivalism থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' (১৮৬৪-১৯১৯) উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগের বহুমুখী চিন্তাধারাকে নিজের মধ্যে সংহত করতে পেরেছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় কি করে ঘটানো যায় তিনি সেকথা পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর কোনও বিষয়ে খুব নতুন কথা বলেছেন বলা যায় না। তবে বোধ করি তিনিই প্রথম ডারউইন, বিশেষত হার্বার্ট স্পেনসারের synthetic philosophyর পন্থায় সৌন্দর্যতত্ত্ব, সুখদুঃখতত্ত্ব—সর্বক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদ প্রয়োগের প্রয়াস পান। 'কর্মকথা'র প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থাকেই অনুসরণ করেছেন। লেখক রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন রচনা থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শ্রীভবতোষ দত্ত ভাবাবেগ, পূর্ব-সংস্কার বা অন্ধমোহ নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচনা করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের তথা তাঁর অনুবর্তীদের মননশীল দৃষ্টি ও সামাজিক চেতনা সম্পর্কে প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই তিনি করেছেন। এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই উনবিংশ শতকের বাঙালীর মনঃপ্রকর্ষের বিভিন্ন দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কাজেই বইখানি শুধু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি বহন করছে না, গোটা উনবিংশ শতকের চিন্তাজগতের সমালোচনাই এখানে করা হয়েছে। সেদিক থেকে বইখানির অতিরিক্ত মূল্য রয়েছে। শিক্ষিত সমাজ এই বইখানি পড়বেন এই আশা নিয়ে আলোচনাটি শেষ করা হল।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

একসূত্রে গাঁথা : ভারতীয় বারোটি ভাষার গল্প ॥ অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্। গ্রন্থবিতান। তিন টাকা॥

বর্তমানে যখন ভারতের ঐক্য নানা কারণে বিপর্যস্ত, বিশেষ করে ভাষার প্রশ্নে আমাদের মনে যখন উষ্মা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তখন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মুখ্য ভাষাগুলির সাহিত্যিক নিদর্শন যদি একই প্রচ্ছদে গ্রথিত হয়, তবে সে-প্রচেষ্টার সৎ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিমত

হওয়া অসম্ভব। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ বারোটি ভাষায় ছোটগল্পের অনুবাদ একসূত্রে গেঁথে বাঙালী পাঠক সমাজে পরিবেশন করেছেন, এজন্য তিনি অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু শ্রী.বিশ্বনাথম্ যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন, তার সবগুলির মান সমান উন্নত বলে মনে হয় না। অনুবাদক আটটি ভারতীয় ভাষা জানেন, অতএব তাঁর কাছে আরও অনুসন্ধান ও পরিশ্রম দাবি করি। অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যিক অগ্রগতির স্বাক্ষর বিদ্যমান, একথা প্রমাণ করাই বোধহয় অনুবাদকের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এই দুর্লভ ভাষাজ্ঞান ও ভারতবর্ষীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগের পরিচয় দিয়েছেন। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এবং অন্য গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির শ্রেষ্ঠ ফসলের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। অবশ্যই বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসাধারণকে সে কাজে অনেকখানি সাহায্য করবে।

ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা ॥ চণ্ডী ভট্টাচার্য। ফ্রেণ্ডস বুক ক্লাব। আড়াই টাকা ॥

'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা' বোধহয় চণ্ডী ভট্টাচার্য-র প্রথম গল্প সংকলন। মাত্র দশটি গল্প একত্রিত করে একটি ছোট্ট পুস্তিকা সহযোগে লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'ফুলদানী' ও 'শেষ হাস্নুহানা', 'অঙ্গুরোদের কাহিনী', 'স্মৃতি গন্ধা' গল্পগুলিতে মিষ্টি হাতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই গল্পগুলি তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে। কিন্তু অবশিষ্ট গল্পগুলি খানিকটা [illegible] এবং অনেক সময় দ্রুত লেখার জন্যেই হয়তো কয়েকটি গল্প নক্শার স্তর পেরোতে পারে নি। গল্প শুধু গল্পের জন্য লেখা হয় না, সেই গল্পে জীবনের তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যিক-কর্তব্য। অত্যন্ত আশার কথা প্রথম গ্রন্থেই লেখক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা সাগ্রহে পাঠ করব।

যান্ত্রিক ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। দু টাকা ॥

'যান্ত্রিক' লেখকের প্রথম পুস্তক। কিন্তু গ্রন্থটি রম্যরচনা, গল্প, না রিপোর্টাজ? প্রশ্নটির সমাধান দুরূহ। অতএব 'যান্ত্রিক' একটি গ্রন্থ—এই নামে অভিহিত

করাই ভালো। লেখক লেখাগুলি খাতবন্দী করে রেখেছিলেন, তার মধ্যে কিছু হারিয়েছে, কিছু বা তিনি স্বেচ্ছায় ছিঁড়ে ফেলেছেন। বস্তুত লিখলেই যে ছাপতে হবে এবং ছাপলেই যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু ভূমিকায় প্রকাশ অরুণবাবু অনেক চিন্তা করে লেখাগুলি প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিন্তার প্রতি সর্বত্র সায় না থাকলেও আমরা তাঁর উদ্যমের প্রশংসা করি।

কার্তিক লাহিড়ী

ভারততীর্থ (প্রথম তরঙ্গ)॥ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিচিত্রা। ছ টাকা॥

"আমরা পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকপুঙ্গব সংখ্যায় এগারো। আমাদের উদ্দেশ্য মাদ্রাজে অনুষ্ঠেয় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান এবং তৎসহ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক ঢিলে দুই পাখি।" শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় এবং অভিপ্রায় তাঁর 'ভারততীর্থ' গ্রন্থের সূচনাতেই এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবে উক্তিটির শেষাংশ সামান্য সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য দুটির বদলে তিনটি পাখি মেরেছেন: শেষ পাখিটি হচ্ছে—একটি বই লেখা। অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনী রচনা। এখন বিচার্য, ভ্রমণকাহিনীর পাখিটি কেমন।

ভ্রমণকাহিনীর মানে কি? ভ্রমণের কাহিনী, না ভ্রমণকেই কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষক করে তোলা? প্রথমটি সহজসাধ্য, শেষেরটি দক্ষ কলমের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্লান্তিকর অর্থাৎ পাঠযোগ্য নয় অর্থাৎ কতগুলি ভূগোল আর ইতিহাসের বাসি তথ্যের সমাহার, যা লেখা নিতান্তই পণ্ডশ্রম, কেননা এই ধরণের তথ্য অনেকেরই জানা এবং বিশেষ করে, এর জন্যে সরকারী টুরিজিম্ বিভাগ তৈরি হয়েছে। অপিচ, এই ধরণের লেখায় প্রায়ই নানান ছবি থাকে: ঘোড়ায় চড়া লেখকের ছবি, পাহাড়-মন্দির-জলপ্রপাত এবং উপজাতি-সুন্দরী মেয়ে, লোকনৃত্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি সুখপাঠ্য, তথ্য ভারাক্রান্ত না হয়ে লেখকের সরস দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবেদনায় রচনাটি অভিষিক্ত এবং তাই সাহিত্যের স্তরে উন্নয়নযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য, সম্ভবত, 'ভ্রমণকাহিনী'র চরিত্র সম্বন্ধে সংশয়ী; তাই তাঁর 'ভারততীর্থ'তে পূর্বোক্ত দুটি ধারারই, সমন্বয় নয়, সমান্তরাল প্রকাশ ঘটেছে। সম্ভবত

হলে অবশ্য ভালোই হত: তথ্যগুলো সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয় নি; সুন্দর বর্ণনা পড়ে চলেছি, বেশ দু এক আঁচড়ে চরিত্র তৈরি করার ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছি লেখকের, এমন সময় অতর্কিতে "ফরফর করে উড়ে গেল ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা।" ইতিহাস শুধু নয়, লোক-কাহিনীরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিশেষত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণাংশে। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা এই অংশে বিবৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যেখানেই লেখকের কলম চরিত্রচিত্রণ আর ব্যক্তিগত সরল অভিজ্ঞতার রূপায়ণে মুখর হয়েছে, সেখানেই আমরা আকৃষ্ট হতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেরালা পর্বটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশটির নাম 'পঞ্চনদের তীরে।' তুলনায় এই অংশটিই সুলিখিত অর্থাৎ ইতিহাস-ভূগোলের অত্যাচার থেকে লেখক আমাদের রেহাই দিয়ে কেবলমাত্র পরিচ্ছন্ন সরসতায় প্রচ্ছন্ন কয়েকটি পৃষ্ঠা উপহার দিয়েছেন। সেখানে মানুষই তাঁর বিষয় তার আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ভ্রমণ-কাহিনীও কথা সাহিত্যের মতো সেখানেই শিল্পায়িত হয় যেখানে তার উপজীব্য দেশকালবিধৃত মানুষ। দেশ-কালকে তুচ্ছ করার প্রশ্ন উঠছে না, কিন্তু মানুষের কথা বিস্মৃত হলে রচনা সাহিত্যিক কৌলীন্য অর্জন করতে পারে না। সুতরাং ইতিহাস ভূগোলের ভূমিকা ঠিক ততখানিই স্বীকার্য যতখানি তারা মানুষকে গড়ে তোলার পক্ষে সহকারী। পাঞ্জাব ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে লেখক জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এই উক্তিটিকেই মেনে নিয়েছেন মনে হয়। লেখকের ভাষার সাবলীলতা কিছু কিছু অংশে কাঁচা কবিত্বে ব্যাহত হলেও প্রশংসার্হ। এবং এইজন্যেই বইখানি শেষ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। 'ভারততীর্থ'-র তৃতীয় তরঙ্গে কি কি থাকবে জানতে ইচ্ছা করি।

শিবশম্ভু পাল

ডকশ্রমিকদের জীবন-গাথা

মাণিক রায়

স্যান মার্টিন শহরে সমুদ্রের উপকূলে জয়েস নামে একটি নিগ্রো মেয়ে এল ওয়েল্ডারের কাজ শিখতে। এই মেয়েটির জীবনকে কেন্দ্র করে আলেকসান্দার স্যাক্সটন আমেরিকার ডক অঞ্চলের শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার একটি রসঘন বর্ণাঢ্য চিত্ররচনা করেছেন তাঁর উপন্যাস Bright web in the Darkness-এ।*

জয়েস দিনে কাজ করে, রাত্রে ক্লাশ করে। ভবিষ্যতে আশা আছে যে স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। এখানে নিগ্রোর কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকানদের শ্বেতবর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। আমেরিকান দুহিতা স্যালিও নিজের স্বাধীন জীবিকা বেছে নিতে রাত্রির এই ক্লাশে যোগদান করেছে, হোটেলের ওয়েট্রেসের চাকরির চেয়ে নিজে খেটে খাওয়া অনেক ভাল। জয়েস থাকে তারই পরিচিত হেণ্ডারসনের বাড়িতে। একা রাত্রিতে ঘুমের আগে, সকালে ঘুম ভাঙার পর চিন্তা করে মায়ের কথা, তার বাবার কথা। মনে পড়ে তার ফেলে আসা নেভেদার শিপন্যাল স্প্রিংসের গ্রামের কথা। এমনি ভাবেই দিন এগিয়ে যায়। কাজ শিখে অনিশ্চয়তার মধ্যে চাকরিতে যোগদান করে। কাজ করতে করতেই স্যালির সঙ্গে টমের প্রেম ও পরিণয় হয়, জয়েসের সঙ্গে সমুদ্র নাবিক চিত্রশিল্পী চার্লির পরিচয়ে দুয়ের হৃদয়বৃন্তে প্রেমের রক্ত-গোলাপ উঁকি মেরে যায়। চার্লির বিবাহে সম্মতি থাকা সত্ত্বেও অপরিচিতকে হঠাৎ নিজের করে নিতে পারে না। তার যন্ত্রসংগীত পিয়ানোর সুরে সারা অঙ্গে বিহ্বল সুর জাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যে সমুদ্র নাবিক সমুদ্রের দুস্তর দুরন্তের অভিযানের মধ্যে নিজের মনপ্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছে, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা ভয়, একটা আশঙ্কা জড়িয়ে থাকে। আর চার্লি

---

* Bright web in the Darkness. Alexander Saxton Seven Seas. Distributors : National Book Agency (Private) Ltd. Calcutta-12. Rs. 2.

শিল্পী। সে অসুস্থ, হসপিটাল থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। এই তো সামান্য পরিচয়।

নীচেরতলার মানুষের মধ্যে মানুষের জাতিভেদ বর্ণভেদ নেই বটে, কেন না তারা একই অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু উপরিতলার মানুষের মধ্যে ভেদ আছে। শুধু নীচেরতলার মানুষের আর্থিক শোষণই শেষ কথা নয়। আমেরিকার দুরপনেয় শ্বেত ও কৃষ্ণের বৈষম্যের মধ্যে ভেদ জাগিয়ে তাদের শোষণনীতিকে জাগ্রত করে তুলছে। বলতে গেলে তাদের য়ুনিয়ন নেই। একটা সামান্য (auxiliary) আছে। তাতেও তাদের সভা ডাকার কোনো অধিকার নেই। ওয়েল্ডারের শিল্প ও কর্মনিপুণতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ কাজ তারা পায় না। বাইরে কোনো বিভেদ নেই, অন্তরমূলে এই বিভেদের বিষবীজ চতুর্দিকে বিষাক্ত মহীরুহ সৃষ্টি করে তুলছে। যে কয়েকটি নিগ্রো শ্রমিক আছে, তারা তাদের কৃষ্ণবর্ণত্বের অভিশাপে এই জ্বালা সবক্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। এই নির্বাক নিস্তব্ধ অন্তর্জ্বালার মধ্যে তারা অন্য সকলের থেকে পৃথক হয়ে আছে। এই শোষণ ও শাসনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মালিকেরা, তাদের আমোদবিলাস নারী মদ নিয়ে, তাদের নারীরা মগ্ন হয়ে আছে হলিউডের নৃত্যের উন্মাদনায়। মালিক সেনেরের পঙ্গু সিস্টারের সমগ্র জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল হলিউডের নৃত্যে যোগদান করতে পারেনি বলে। অবসরে [illegible] হল মালিকদের একমাত্র নেশা ও অবসরবিনোদন। সমা[illegible] [illegible] না [illegible]। স্টোরের অংশীদারেরাও তাদের স্বার্থের জন্য [illegible] থেকে ব্যবহার করতে চাইছে আসন্ন নির্বাচনে। [illegible] হল না শিক্ষা পায়নি, কিন্তু শিক্ষিতদের অনায়াসে তাদের [illegible] পায়। [illegible] তারা যে অভিসন্ধির জাল রচনা করে, তাতে শ্রমিকদের কেউ কেউ ধরা পড়ে। শ্রমিক য়ুনিয়নে যোগদান করে যাতে নিগ্রোরা [illegible] পথ না করতে পারে, তার জন্যে লোভ দেখায়। স্যালির [illegible] নিগ্রোদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণ। বাণিজ্য জাহাজের কর্মচারী টমের জাহাজ যেমন টর্পীডোতে আয়ার্ল্যাণ্ডের কূলে ধ্বংস হয়ে গেল, নানাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিদেশী লোকদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সে সময় সে সংবাদ পেল একটি নিগ্রো মেয়ে স্যালির ঘরে একত্র থাকে, এতে তার মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। নানাদেশ ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, স্পেন ভাষা সম্বন্ধে সামান্য

জ্ঞান নিয়ে যখন ফিরে এল তখন ডকে জাহাজ তৈরির কারখানায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা দেখা দিয়েছে, তারা সমান অধিকার চায়, তাদের দলভুক্ত করে নেবার জন্তে সংগ্রাম করতে চায়। স্যালি আগামী য়ুনিয়নের সভায় এই ঐক্যতার জন্তে ভাষণ তৈরি করছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ এক অধিকার পাবে। স্যালির এই চেতনায় টম অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং যখন স্টোন তাকে প্রলোভন দেখিয়ে টমের ল পড়ার ইচ্ছাকে উসকে দিয়েছে, তখন স্যালির এই মনোভাবের বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ করেছে। কি দরকার এসব করবার নিজের উন্নতিকে আত্মবলি দিয়ে। তাই স্যালিকে ত্যাগ করে বাড়েই চলে গেল সে।

দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনে জয়েসের মনে নানাভাবের আলোড়ন ঘটে যায়। চালির কথা মনে করে তার যৌবন হৃদয়ে ব্যাকুল সুরভি ছড়াতে থাকে। মাঝে মাঝে মনে ব্যথা ও অনুতাপ জাগে, চালির সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিলেই ভালো হত। টম ও স্যালির দাম্পত্যজীবন দেখে, স্যালির উন্নত যৌবনের বুকে প্রেমের পরিণত রূপ দেখে, জয়েসের মনে আসঙ্গলিপ্সা, ঘর বাঁধবার দুর্বার পরিকল্পনা বাধা জাগাতে থাকে। সাদা দেহের ওপরে লাল দাগগুলি স্যালির মনে পূর্ণরূপ দেখে মনের কোণে এক দুর্বার ঈর্ষা জাগাতে থাকে। সমুদ্র উপকূলের প্রকৃতির মধ্যে, চারিদিকের নির্জন নিসর্গের মধ্যে জয়েস তার নির্জন মনের সঙ্গী খোঁজে। এই সময়েই খবর এল চালি হাসপাতালে মারা যাচ্ছে। এমনি করেই তার প্রেমের বৃন্ত ঝরে গেল।

নিগ্রো শ্রমিকেরা অধিকার চায়, কিন্তু মালিক বা শ্বেতাঙ্গরা তা দিতে চায় না। তাদের এই অধিকারের দাবি স্থানীয় কোর্টে উঠল, কিন্তু কোর্ট রায় দিল মালিকদের পক্ষে। বিজয়ীপক্ষ যে প্রকারেই হোক বিজিতদের দমন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হল। লোকের মৃত্যুতে, হঠাৎ মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত হবে জয়েসের মনে ঔদাসীন্য হয়তো এসেছিল কিছু কাজে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রায় এল এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যে তার চাকরি যাবে পনেরো দিন দেখা হবে সে ভালোভাবে কাজ করে কিনা, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বাধপর অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরা তাদের পরাজয়ে অকথ্য ব্যবহার আরম্ভ করে।

এমনি হতাশার মধ্যেই দিন যায়। কিন্তু পূজ্যপাদ দাঁজিলি তাদের অধিকারের দাবি সুপ্রীম কোর্টে উপস্থাপিত করে, Negro Improvement

League এখানেই জয়লাভ করে। অন্ধকার হতাশ্বাসের বুকে আশার ঊষা আলোকিত হয়ে উঠল। প্রেমিকের মৃত্যুর বিষণ্ণতা, জাতীয়তার আশান্বিত বিজয়ের আনন্দ, তার পিয়ানোতে অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করল। এই বিজয়সভার আহ্বানে তার পিয়ানো এমিলি ডিকিনসনের বাণীকেই মূর্ত করে তুলল :

What fortitude the human soul
That it can thus endure
The accent of a coming foot,
The opening of a door······

তার হৃদয়ের বোঝা হালকা হয়ে গেল।

অদৃষ্টের ক্রূর নিয়তি মানুষের ছলনাকে কিভাবে পরাস্ত করে অদ্ভুত লীলা দেখায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মালিক সৌনের চরিত্রে। সে তার স্ত্রীকে পায় নি, একমাত্র পুত্রও তাকে ছেড়ে গেছে। এই বিপুল অর্থের মধ্যেও সে একা, কিন্তু চরিত্রগত ছলনা, কপট অভিনয় শোষণ, বর্ণ বৈষম্যকে সে সজাগ করে রেখেছে। স্ত্রী সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে পার্বত্য পথে মোটরে যেতে যেতে একদিন দুর্ঘটনায় স্ত্রীকে হারাল, নিজে অঙ্গ ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল। এবং কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। তার সমগ্র প্রচেষ্টাই যেন একটা শূন্যের লীলাখেলা।

উপন্যাসটির কেন্দ্রবৃত্ত জয়েসকে ঘিরে। জয়েসের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, তার জাতির উন্নতি আকাঙ্ক্ষা এবং তাকে ঘিরেই সমগ্র শ্রমিক সমাজ সুন্দরভাবে অভিব্যক্তি হয়েছে। তার চরিত্রের পাশেই সমান্তরালভাবে স্যালির চরিত্র আঁকা হয়েছে। স্যালি বিবাহিত জীবনে টমের ঔরসে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করতে চায়। তার অবচেতন মনে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যাকুল করে তোলে। অর্থের জন্য টম অসম্মতি জানালেও সে নিজে সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে চেয়েছে। টমের এই ব্যবহারে সে মনের মধ্যে ব্যথা পেয়েছে। স্যালির এই দাম্পত্যজীবনের রূপটাই বারংবার কল্পনা করে জয়েস তার যুগলজীবনের আশাকে উদ্দীপিত করে রেখেছে। মাঝে মাঝে ঈর্ষাও জেগেছে। এদের কথা ভেবেই প্রকৃতির ছায়াঘেরা নির্জনে একাকী পথ ঘুরেছে। কিন্তু ব্যর্থপ্রেমে, হতাশ আঘাতে, মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে তার জীবন চূর্ণ হয়ে গেছে। একমাত্র গানের মধ্যেই সে সুর

খুঁজে পেয়েছে। বাস্তবজীবনের হতাশা সুরের আনন্দে পূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু জীবনের এক দুর্ঘট মুহূর্তে অনন্ত গ্লানির বীভৎসতায় তার সহকর্মী জ্যকসের অন্তর্জ্বালার সময়ে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। এই মানবপ্রীতির ভালবাসায় তার চিত্ত মিলনআনন্দে পূর্ণতর হয়েছে। জীবনের হতাশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে মানবপ্রেমে জ্যাকসের এই আত্মদান পরিপূর্ণ মানবিক। মনের অন্ধকোণে ব্যথার সাগরের নরম ঢেউ ভাঙলেও জীবনের ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য।

উপন্যাসটি তিনটি শ্রেণীর মানুষের চরিত্রচিত্রণে একটা ব্যাপ্তি এনেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষের বুকের ওপর যে শোষণনীতি চালিয়ে গেছে, বিভেদনীতি উসকে রেখে বৈষম্যকে জাগিয়ে দিয়েছে, তারই দৃষ্টান্ত আমেরিকান মালিক সৌন ও তার সহকর্মীদের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসটির গুণাগুণ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় বইটি সুখপাঠ্য নয়। চরিত্রগুলি অনেকস্থলেই টাইপে পর্যবসিত হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষতা অত্যন্ত স্বল্প, চিন্তা ও ভাষণই বেশি। জ্যাকসের চরিত্রই আমাদের মনকে বেশি আন্দোলিত করে, স্যালির মাতৃত্ববাসনা সার্বজনীন নারীত্বের প্রতীকরূপ হয়ে উঠেছে। টমের মধ্যে টিপিক্যাল আমেরিকান যুবকের রূপ প্রতিভাত। স্যালির সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে যৌবন মধু পান করে তৃপ্ত হয়েছে, সন্তানের পিতাও সে হয়েছে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্যালির সঙ্গে তার জীবনের আদর্শগত ও স্বার্থের বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেই মুহূর্তে আসন্নপ্রসবা স্যালিকে ত্যাগ করে বাণিজ্য জাহাজে যুদ্ধের পরে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নানা বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সমুদ্রের বিভিন্ন বন্দরের মতোই বিভিন্ন রূপোপজীবিনীর জীবনবন্দর থেকে তাদের দেহসুধা অর্থ দিয়ে পান করে জাহাজে ফিরে এসেছে। স্যালির জন্যে কোনো অনুতাপের সুর তার চিত্তকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মথিত করে তোলে নি। বরং ল পাশ করবার জন্যে সৌনের কাছে অর্থসাহায্য চেয়ে পত্র দিতে স্থির সংকল্প করেছে। সার্জেণ্ট চরিত্রটি প্রাণের সজীবতায় চঞ্চল। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো গুণ নেই—যা সহজেই পাঠকদের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

ঘটনার স্রোতও এত স্বল্প যে এগোতেই চায় না। কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তে চকিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটছে, যাতে বিস্ময় না জেগে আকস্মিকতার আঘাত মনের মধ্যে লাগে।

বর্ণনামূলক ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর চমৎকার পংক্তি মনের দিগন্তে কাব্যের ইশারা জাগিয়ে তোলে। এবং প্রায় প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে কাব্যিক পরিবেশ আনবার চেষ্টা করেছেন। যদিও অন্যত্র ভাষা এমন দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু একটি জায়গার বর্ণনা আমার মনে এক পুলকিত বিস্ময় এনে দিয়েছে। টম্ জাহাজের দুর্ঘটনার পাঁচ মাস পরে সান্ মার্টিন শহরে ফিরে এসেছে, নানাদেশের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে স্যালির কাছে ফিরে এসেছে, স্যালিকে প্রথম দেখেই তার মনে স্ট্রবেরি ফুলের উপমা মনে হয়েছে :

Reaching out his hand, he found hers ; her face was close and her eyes watching his. They were graygreen, he had almost forgotten. The face was one he had never seen before, yet knew every mark upon it, the freckles and eye-lashes, the coppery red hair drawn back. She was older. She was more beautiful than she had been before, he thought, older and he no longer remembered her. For a moment he felt a panic as if he had stepped forward to the wrong person. The lips were half open, the eyes half closed. Strawberry. Strawberry laughing in the lunch counter, and he pressed his mouth against hers and her arms locked around his neck. 186-87 pages.

ঔপন্যাসিক হিসাবে Alexander Saxtonকে যে শ্রেণীতেই ভাগ করি না কেন, ফরাসী সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য ও জার্মান সাহিত্যের মনের জটিল জঙ্গলপূর্ণ উপন্যাসের কুহক মায়া ছেড়ে জীবনের চলমান আশা দীপিত সহজ সরল সাধারণ পথে মাঝে মাঝে যাত্রা করতে বরং ভালোই লাগে। নাভিশ্বাসে হাঁপ ছাড়ানো মন কিছুক্ষণের জন্য হালকা আলোর খুশির ঝলক পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। দৃপ্ত আশায় মন স্থিত হয়। মানবিক সত্যে আস্থা আসে।

সংস্কৃতি সংবাদ

রবীন্দ্রশতবর্ষে শান্তিউৎসব

নিখিলভারত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসব সমিতির উদ্যোগে পার্কসার্কাস ময়দানে দশদিনব্যাপী মেলা ও অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাম ও শান্তির আদর্শ যে সমস্ত স্তরের মানুষকে, দেশ-বিদেশের মানুষকে এক মহৎ অঙ্গীকারে মেলাতে পারে—এই বিপুল উদ্যোগের সাফল্য তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর স্মৃতি রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে মেলার কথাই বলেছিলেন। শহর কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত এই মেলার চরিত্র ছিল প্রথমে বাঙালী, তারপর ভারতবর্ষীয়, তারপর আন্তর্জাতিক। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রমেলার চরিত্র অন্যরকম হতে পারে না।

যদিও এক গোপন চক্র ভাড়াটে লোক মারফৎ কলকাতার পথে-ঘাটে শান্তিসমিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর, কুদৃশ্য, ব্যয়বহুল পোস্টার লাগিয়েছিল, যদিও 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্র'গুলি প্রথম দিকে এই মেলা সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা দেখিয়েছিলেন, তথাপি প্রত্যহ শহর, শহরতলী ও সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার নরনারী এই মেলায় যোগ দিয়েছেন। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহই বোধহয় একটি প্রখ্যাত ইংরিজি দৈনিকের নীরবতার তুষার গলিয়ে দিয়েছে। উৎসবের এই উত্তাপই হয়তো শেষ দিনে একটি প্রখ্যাত বাংলা দৈনিককে সম্পাদকীয় লিখতে উদ্দীপ্ত করেছে। কিন্তু অপর বাংলা দৈনিকটি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সেই বিখ্যাত তিনটি বাঁদরের মতো নিজের চোখ, কান ও মুখ বন্ধ রাখার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে।

শেষ পর্যন্ত স্টেটসম্যান ও যুগান্তর যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য দেশবাসী তাঁদের অভিনন্দিত করবেন। আর অপর যে পত্রিকাটি সাংবাদিক অসততা ও ভুতাগ্নিকতার পরিচয় দিলেন—দেশবাসী তা-ও সহজে বিস্মৃত হবেন না। তবে, একটা কথা আর একবার প্রমাণিত হল। শান্তির আদর্শ ও রবীন্দ্রঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের যে অনুরাগ—কোনো অদৃশ্য হস্তের শাসন বা প্রলোভন বা অনুনয়ই তাকে স্তিমিত করতে পারে না। প্রমাণিত হল এই সংবাদ-বিক্রেতারা দেশবাসীর ইচ্ছা ও আকাংক্ষাকে সবক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারেন না। নইলে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ পার্কসার্কাস ময়দানে ঘটত না।

এই বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সর্বত্র রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু উদ্যোগ ও আয়োজনের বিপুলতায় এবং অংশগ্রহণের ব্যাপকতায় এই মেলা ও অনুষ্ঠান যে ঐতিহাসিক চরিত্র অর্জন করল তার তুলনা নেই। দশদিন ব্যাপী এই মেলার সর্বত্র প্রীতি ও সহযোগিতার দুর্লভ পরিচয় পাওয়া গেছে। সরকারী প্রহরা বিভাগের সহায়তা বা ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, কংগ্রেস সেবাদল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি 'বিখ্যাত' প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ভিন্নই এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হতে পেরেছে। কোনো দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। দেশবাসী যে কত দায়িত্বশীল, তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা যে কত প্রখর—আরও একবার তা প্রমাণিত হল।

তেমনই সহযোগিতা দেখিয়েছেন শিল্পীরা। চেকোস্লোভাকিয়ার বিশ্বখ্যাত ত্রয়ী রাত এগারোটায় দমদম বিমানঘাঁটি থেকে সোজা অনুষ্ঠান মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে মুহূর্তের বিশ্রাম না নিয়ে তাঁদের অনুপম স্বরসৃষ্টির পরিচয় দিলেন। কিউবার বিশ্বখ্যাত ব্যালে নর্তকী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মঞ্চসমূহে নাচতে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি এই ময়দানের অত্যন্ত সাধারণ স্টেজে বিপুল শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করেও তাঁর অনুপম নৃত্যকৌশল দেখালেন। বৃদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কোনোক্রমে মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত রাগসঙ্গীত শোনালেন। অতি বৃদ্ধ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ইনভ্যালিড চেয়ারে বহন করে আসরে বসিয়ে দেওয়া হল—তিনি গান গাইলেন। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পিদল এমনই নিরহঙ্কার, এমনই সহৃদয়, এমনই শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। আর দেশ-বিদেশের খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পীদের পাশে আদিবাসী ও গ্রামীণ শিল্পিদল এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মজুর শিল্পীরাও তাদের সাংস্কৃতিক নৈপুণ্যের পসরা তুলে ধরেছেন। এমন যোগাযোগ ইতিপূর্বে কখনোই ঘটে নি।

তিনদিন কবি সম্মেলন হয়েছিল। বাংলাদেশের কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় থেকে নবীনতম কবির কবিতাও সেখানে পঠিত হয়। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের সম্পূর্ণ নিরক্ষর, বৃদ্ধ লোককবি রামদেবের কবিতা এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা ও বিদেশীয় কবিতা-আবৃত্তি এই কবি সম্মেলনে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র এনেছিল। উর্দু কবিরা সারারাত্রি-ব্যাপী মুশায়েরার পৃথক আয়োজনও করেছিলেন। তরুণ কবিবৃন্দ কবিতা-

গ্রন্থের এক নির্বাচিত প্রদর্শনী করেছিলেন। তরুণ নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের তরফে নবনাট্য আন্দোলনের এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজনও ছিল।

তাছাড়া মেলার প্রদর্শনী মণ্ডপটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম সরকার, চেকোস্লোভাকিয়া সরকার, রুশ ভারত মৈত্রী সংঘ, পূর্ব জার্মানী সরকার ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান তথ্যবহুল, শিল্প সৌন্দর্যে অনুপম এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনপ্রবাহের প্রদর্শনীটি স্মরণীয়। আর তানসেন ব্যবহৃত তানপুরা সহ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ক প্রদর্শনীটি ছিল এই মেলার সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ও অপর শিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের প্রদর্শনী ও ক্যাথে কোলভিৎজের গ্রাফিক আর্টসের প্রদর্শনী পৃথক আলোচনার বিষয়। স্মরণীয় যে জার্মাণ ভ্রম[illegible]লে কোলভিৎজই রবীন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন।

দেশবাসী কি গভীর গুরুত্ব ও অভিনিবেশ সহকারে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ প্রতিদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও শেষ দিনের প্রাতঃকালীন জনশিক্ষা সম্মেলন। অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সম্পর্কে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিন্তানায়কদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দ ঘন্টার পর ঘন্টা শুনেছেন।

আর ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শন। কানাল, ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, রুশ রবীন্দ্র-জীবনী, তলস্তয়ের জীবনচিত্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুর্লভ চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ উদ্যোক্তারা করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন একই সঙ্গে তিনটি মঞ্চে অনুষ্ঠান ও পর্দায় চলচ্চিত্রের প্রদর্শন—এই চারটি অনুষ্ঠান চলেছে। পুতুল নাচ, বিশেষভাবে প্রেরিত রোবসনের গান ও অর্নডাইকের আবৃত্তি, রুশ অনুবাদে ও কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাটক ও সঙ্গীত বা প্রাদেশিক সংস্কৃতি পরিবেশন, ছায়ানাট্য, নাটক, যাত্রা, বিবিধ অনুষ্ঠান হাজার হাজার মানুষ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন।

দেশখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, মনস্বীকে উৎসবের যত্রতত্র দেখা গেছে। বিদেশীয় অতিথিরা মাটিতে বসে মৃৎপাত্রে চা খেয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে দেখেছেন রবীন্দ্রপূজা বা রবীন্দ্রব্যবসায় নয়—রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বিশ্বসংস্কৃতির মিলন উৎসব। শতবার্ষিকী বৎসরে এইটিই তো কাম্য ছিল।

উৎসব উপলক্ষে সমিতির তরফে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে। আমরা পাঠকদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

নিখিলভারত শান্তিসমিতি যদিও রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিসমিতির প্রাথমিক উদ্যোক্তা, তথাপি এ কথাটি পরিষ্কার করে বলা দরকার শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিখিলভারত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব সমিতি নামে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল।

অনেক ব্যক্তিই এতে এসেছিলেন—যাঁদের সঙ্গে শান্তিসমিতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসব সমিতিই রবীন্দ্রমেলা ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পরিচালক। যাঁরা শান্তিসমিতি বা কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই মেলার কর্তৃপক্ষকে জুড়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছেন—জনসাধারণই তাঁদের নিজ উদ্যোগ ও উৎসাহে সেই কুৎসার যোগ্য জবাব দিয়েছেন।

কিন্তু আজ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রথমত নিখিলভারত শান্তিসমিতি যে-শান্তি আন্দোলন পরিচালনা করছেন, দেশবাসীর সঙ্গে 'পরিচয়' তার জন্য কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়ত শান্তিসমিতি প্রবর্তিত এই রবীন্দ্র-উৎসব সমিতি একটি পৃথক সংগঠন এবং এঁরা এঁদের কর্মের মাধ্যমে আপন সর্বদলীয় উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। তৃতীয়ত এই সমিতি মেলা উপলক্ষেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সমিতির নিখিল ভারতীয় কাউন্সিল ও প্রায় পঁচিশ হাজার সহযোগী সদস্য এই সমিতিকে স্থায়িত্বদানের প্রস্তাব দিয়েছেন। দেশব্যাপী রবীন্দ্রচর্চা তথা সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মহৎ দায়িত্ব আজ এই সমিতির হাতে পড়েছে।

বাংলাদেশে সংবয়স ও মতের সাহিত্যিকদের একত্রে সাহিত্যিকদের নিজস্বভাবে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী লেখক সংস্থা' গঠিত হয়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রবীণ-নবীন সর্বমতাবলম্বী সাহিত্যিক ও সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক এই সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লেখক সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের নামে, সুস্থতর সাহিত্যাদর্শে লেখকদের মিলিত হবার যে উদ্যোগ ও প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ হল না। প্রায় সেই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করল এই রবীন্দ্রমেলা। কিন্তু কোনো কোনো সাহিত্যিক তাতেও অংশ গ্রহণ করলেন না। এই সময় কলকাতায় নিখিল ভারত আফ্রো-এশীয় সংহতি-লেখক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন হল। এশিয়া-আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিকতার অবসান—এই ছিল সম্মেলনের আহ্বান। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি অনুসারী, বিবেকবান মানুষের তথা সাহিত্যিকের অবশ্য পালনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই সম্মেলনে ঐক্যের যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল—তাতেও কোনো কোনো বাঙালী সাহিত্যিক সাড়া দিলেন না। আর সেই সময়েই হঠাৎ কয়েকজন লেখকের একটি রাজনৈতিক বিবৃতি প্রকাশিত হল।

আণবিক বিস্ফোরণ মাত্রেই দুঃখকর। কিন্তু কোনো ঘটনাই প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে বিচার্য নয়। গত তিন বছরের ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাঁরা যে বিবৃতি প্রকাশ করলেন তাতে স্বাক্ষরকারীদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে সোভিয়েত বিরোধিতা। এই মনোভঙ্গি আরও প্রকট হয় যখন দেখি গত প্রায় দশ বছর এই আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিচুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি যে দাবি আন্তর্জাতিক শান্তিসংসদ পৃথিবীতে জনপ্রিয় করেছিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ যে অভীপ্সা ঘোষণা করেছিল —তার সমর্থনে এই সাহিত্যিককুলের অধিকাংশই সম্পূর্ণ নীরব থাকতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ বিবৃতিদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। তখন তাঁদের বক্তব্য ছিল শান্তির আহ্বান মানে রাজনীতি।

অথচ হাঙ্গেরি প্রভৃতি ঘটনায় প্রায়ই এঁদের কেউ কেউ বিবৃতি দিয়ে মানবতার ঋণ পূর্ণ করেছেন। করেননি মহাকাশে কণ্টক ক্ষেপণ, লুমুম্বার হত্যা, ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পাশবিক অত্যাচার, কিউবায় মার্কিন যুদ্ধ অভিযান প্রভৃতি ঘটনায়। কারণ তাতেও রাজনীতি করা হত।

শান্তিসংসদ জার্মান সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। হাঙ্গেরির সময়েও বলেছিলেন। আর যাইহোক—শান্তিসংসদকে পছন্দমতো কোনো ব্যাপারে নীরব আর কখনো বা মুখর হতে দেখি নি।

সুতরাং এই বিবৃতির উদ্দেশ্য ও কয়েকজন স্বাক্ষরকারীর চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমাদের বক্তব্য আর যাঁরা, অধিকাংশ যাঁরা—তাঁদের সম্পর্কে। আমরা জানি এঁদের অনেকেই এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে বুঝতে পেরেছেন নিছক মানবিক কারণেই বিবৃতিটি ছাপা হয় নি, অনেকেই তাঁরা অনুতাপও প্রকাশ করেছেন। আজ তাঁরাও বলছেন লেখকদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি করে কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হল?

এখনও সময় আছে। ন্যূনতম যে বিষয়গুলিতে সব মত ও বয়সের লেখকরা মিলতে পারেন—উচিত হবে তার ভিত্তিতে তাঁদের একত্রে বসা: যে লেখক-সংস্থা নিষ্ক্রিয় হয়েছে, উচিত হবে তা সঞ্জীবিত করা। এই মেলার শিক্ষা হল ঐক্য ও মানবতার শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা। এই উৎসব সমিতি, বা, আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতি বা রবীন্দ্রশতবার্ষিক লেখক সংস্থা—যে কোনো একটির মাধ্যমে আবার বাংলা দেশের লেখকরা সমবেত হোন। পৃথিবীর কারা শান্তির পক্ষে, কারাই বা যুদ্ধ চাইছেন তা বুঝুন। স্পষ্ট করে বলুন আমরা লেখকরা চাই সমস্ত রকম যুদ্ধাস্ত্র বর্জন, শান্তি চুক্তি, ঔপনিবেশিকতার অবসান, সহৃদয়তা। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বৎসরে এইভাবেই বাঙলা দেশের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারবেন, যা পেরেছে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এই মেলায় মিলিত হয়ে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎই আপনার প্রধান ভাবনা। তাদের কল্যাণের জন্যই আপনার এত চিন্তা—এত পরিশ্রম। আপনি যখন বর্তমান থাকবেন না তখনও যেন আপনার এই কল্যাণ-কামনা তাদের ঘিরে থাকে তার ব্যবস্থা আজই করে রাখুন—একটি 'মাল্টি-পারপাস্' পলিসি নিলে আপনার পরিবারের সব আর্থিক প্রয়োজন মিটবে। ঠিক প্রয়োজনের সময় এটি এক থোক নগদ টাকা তো দেবেই তাছাড়া বছর বছর কিস্তিতেও টাকা যোগাতে থাকবে। আপনার জীবন বীমার এজেন্টের কাছে বিস্তারিত খোঁজখবর নিন। তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্যই রয়েছেন।

আপনার আয় যাই হোক না কেন, আপনার উপযোগী পলিসি আছে।

জীবন বীমার
কোন বিকল্প নেই

অগ্রহায়ণ

সূচীপত্র

১৩৭৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

দুশান জবাভিতেল

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, লেখক ও নাট্যকার ছিলেন একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাহিত্যের কোন্ ক্ষেত্রে বাংলা তথা পৃথিবীর সাহিত্যে তাঁর দান সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে অনেক মতান্তর দেখা যাবে: তাঁর ছোটগল্পের কথা উল্লেখ করবে অনেকে, বিশেষ করে বিদেশীরা।

এইরূপ জবাবের অনেক কারণ আছে। বাংলা ও সারা ভারতবর্ষের সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের আগে ভারতবর্ষে সত্যকার ছোটগল্প লেখা কারুর পক্ষে সম্ভব হয় নি। আজকে কিন্তু ছোটগল্পই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে যে পথ দেখিয়ে দিলেন তা অনুসরণ করে বাঙালী লেখকেরা ভারতবর্ষের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে দুনিয়ার সাহিত্যে একটা উঁচু স্থান দখল করেছেন। একটিমাত্র দুঃখের বিষয়, বিদেশে যারা বাংলা ভাষা জানে তাদের সংখ্যা খুব কম ও ইংরেজী ভাষায় বাংলা ছোটগল্পের অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায় না বলে অনেকে এই গল্পগুলির যথার্থ মূল্য বুঝতে পারে না। গেল বছরে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সদনে একটা তালিকা পেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথেরও কত গল্প এখনো ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নি।

আমার ছোট প্রবন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করে একটা বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব; তাই শুধু কয়েকটি প্রধান দিক উল্লেখ করতে চাইব।

প্রত্যেক ছোটগল্পের দুটো দিক আছে—বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। এদের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি এ নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে নেই। শুধু এ-কথা বলতে হয় যে বিষয় ও রূপের ঐক্য থাকা উচিত। তাছাড়া জীবনের বৈচিত্র্যের মতোই বিষয়বস্তুও বিচিত্র; আর রূপ-প্রকাশের উপায়ও একেবারে অসংখ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিষয়ে ও রূপে, উভয়েই লেখকের মতামত, চিন্তাধারা, বিচার, অনুরাগ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সাহিত্য শুধু জীবনের দর্পণ নয় তো—সাহিত্য জীবনের উপর নির্ভর করে বাস্তবতা বিচার করে ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে—চেষ্টা না করলেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বেশির ভাগ পল্লীসমাজের জীবন, সমস্যা, সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত। তিনি যখন ১৮৯১ সালে বাংলাদেশের গ্রামে গেলেন তখন তাঁর চারিপাশে যা দেখতে পেলেন ও গ্রাম্যসমাজের জীবনের যে টুকরো সংগ্রহ করতে পারলেন তাই নিয়ে তাঁর ছোটগল্প লিখতে থাকলেন। তিনি নিজে বলেছিলেন: "আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি, যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলির বিষয়বস্তুকে এককথায় প্রকাশ করতে চাইলে আমরা বলতে পারি বিষয়টা হল মানুষ—মানুষের সুখ-দুঃখ, মানুষের বেদনা, মানুষের আনন্দ। সুখ ও আনন্দ গ্রাম্যসমাজে বেশি দেখতে পান নি বলে তাঁর ছোটগল্পেও বেশি সুখ ও আনন্দের কথা পাওয়া যায় না। 'দেনাপাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'কঙ্কাল' ইত্যাদি গল্প পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি পল্লীসমাজের সীমাবন্ধন, প্রথার নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতা তাঁকে কী আঘাত করেছিল। 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি নিজেই বারংবার বলতেন তাঁর অল্পবয়সের জীবন কেমন সংকীর্ণ ও বাইরের আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন হঠাৎ জীবনের ঠিক মাঝখানে এসে পড়ে তিনি বাস্তবের সমস্ত নিষ্ঠুরতা তীব্র বেদনার সঙ্গে অনুভব করতে লাগলেন। এইভাবেই বাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পের মধ্য দিয়েই বাংলা ও ভারতবর্ষের সাহিত্যে প্রথমবার প্রবেশ করল। একথাও স্বীকার করতে হয় যে তাঁর কাব্যরচনায় কিন্তু এই বাস্তবের—সামাজিক বাস্তবের—প্রবেশ একটু দেরিতে হল। পল্লীজীবনের এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে প্রাসবার

কয়েক বছর পরেই 'চিত্রা' থেকে আরম্ভ করে আমরা তাঁর কবিতায়ও সামাজিক জীবনের স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'এবার ফিরাও মোরে' নামের কবিতায় তিনি যে artistic programme রেখেছিলেন তা নিজের কাব্যরচনায় যে সব সময়ে মানতে পেরেছেন তা আমি মনে করি না; কিন্তু তাঁর ছোটগল্পে এই কর্মসূচী ঠিকই বজায় রেখেছেন। যারা বোবা, যারা অক্ষম, যারা অসহায় তারাই মূর্ত হত তাঁর ছোটগল্পে; তারাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করবার পথ পেল এই ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। তাই ড. লেস্‌নি প্রায় তিরিশ বছর আগে যথার্থই বলেছিলেন: "These stories were a revolutionary event in the world of Bengali literature; apart from certain lyrical poems they are Tagore's finest works."

একথাও উল্লেখ না করে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এ যে সমস্ত সমস্যা পাঠকদের চোখের সামনে স্থাপিত করলেন তা হল পল্লীসমাজের ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের typical problems। গ্রামের গরীব লোকের দুঃখ ও তাদের প্রতি উৎপীড়ন, পুলিশ ও জমিদারদের অত্যাচার, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, মেয়েদের পরাধীনতা ইত্যাদি বর্ণনা করে তিনি এ সমস্ত কুক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, তাঁর প্রতিবাদ জানাতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা এখানে প্রথমবার তাঁর অতল মমতাবোধের স্পষ্ট প্রকাশ পাই যা হল তাঁর মানবতাবোধের ভিত্তি; কারণ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ কোনো abstract philosophical category নয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের একটা অংশ যা প্রত্যেক বড় লেখক, প্রত্যেক বড় কবির অন্তরে থাকা উচিত। এই মানবতাবোধেই Romain Rolland, Maxim Gorki, Lu Hsun ইত্যাদি আধুনিক দুনিয়ার বড় লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ মিল।

এদিকে 'গল্পগুচ্ছ' মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারবার একটা অত্যন্ত দামী খনিজ।

'গল্পগুচ্ছ'-এর নায়ক-নায়িকার একটা তালিকা তৈরি করলে আমরা দেখতে পেতাম কোন্ ধরনের লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বেশি প্রবল ছিল। অন্ধ সমাজ ও স্বার্থপর পুরুষদের অত্যাচারে উৎপীড়িত নারীদের সংখ্যা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমা, 'কঙ্কাল' গল্পের

নায়িকা, 'ত্যাগ' গল্পের কুসুম, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের বিধবাটি, বোবা 'সুভা', 'খাতা' গল্পের উমা, 'বিচারক' গল্পের ক্ষীরোদা, 'দিদি', 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের বিনোদা, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দু, 'হৈমন্তী' ইত্যাদি—এদের সকলের মর্মস্পর্শী কাহিনী ব্যক্তিগত আপদ-বিপদের কাহিনী নয়, সামাজিক অসমতা ও অন্যায়ের ফল বলেই রবীন্দ্রনাথ এত জোর করে বারংবার এসব বেদনাগ্রস্ত মেয়েদের কথা বলতেন।

তাঁর অনেক ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অমানুষিক প্রথা ও কুসংস্কারগুলির পটভূমিকায় জীবিত নর-নারীর ছবি আঁকতেন, পরিবেশের সঙ্গে তাদের ব্যর্থ লড়াইয়ের কথা বলতেন; সেই লড়াইয়ে তারা পরাজিত হয়ে মরে গেলেও moral victory অর্থাৎ নৈতিক জয় সব সময় তাদেরই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা যে শুধু মরে যেতে জানে তাও নয়—পুরাতন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও পারে। অন্তত দুটি গল্পে এরকমের বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায়—'ত্যাগ' ও 'স্ত্রীর পত্র'। এই দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের দুঃসাহসী পথ দেখিয়ে দিলেন সে রকমের পথ তিনি নিজেও তাঁর নানা প্রবন্ধে কোনোদিন দেখান নি। এ বিষয়ে S. A. Dange সঠিকভাবে বলেছেন: "When Tagore wrote as a 'social reformer' or as a politician or essayist, his emotions and sentiments, his imagination and thoughts became circumscribed and inhibited. But when he wrote as a poet and a dramatist, *i. e.* when he was on the job of creation in the realm of art, he revealed himself fully and truly."

রূপের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প দেখে তার সবচেয়ে বড় গুণ আমার মনে হয় প্রত্যেক গল্পের সমাপ্তি। দৈর্ঘ্যতায় এক একটি গল্পের মধ্যে অনেক তফাত দেখা যায়; কিন্তু লম্বাই হোক আর ছোটই হোক, প্রত্যেক গল্প আশ্চর্যভাবে সমাপ্ত। ছোটগল্প লেখবার সময়ে সফলতার জন্য লেখককে যে সব সময়েই শেষের point-টি মনে রাখতে হয় সেই রহস্যটি রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন বুঝিবা। একটার পরে একটা গল্প নিয়ে আমরা দেখতে পাই শেষের point-টি stress করবার,

উদ্ভেজে সারা গল্প রচিত। তাই প্রত্যেক গল্পই আমাদের মনে এত গভীর দাগ কেটে যায়।

আর একটি কথা বলেই আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে গল্প লিখতেন সে বিষয়ে গল্প লেখার সবচেয়ে বড় বিপদ হল লেখকের sentimentality অর্থাৎ ভাবালুতা। অনেক আধুনিক লেখকের রচনায় একথার প্রমাণ পেতে পারি। বিপদটা রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে এড়াতে পেরেছিলেন ; তাঁর ছোটগল্পে মমতা যতই থাক sentimentality কোথাও দেখা যায় না। তা এড়াবার জন্য তিনি বরঞ্চ একটু বেশি কঠিনভাবে কথা বলেন এবং বিদ্রূপ প্রয়োগ করে তাঁর artistic লক্ষ্য সফল করেন, অনেক সময় আবার নিরপেক্ষতার ভান করে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের কাহিনী বলেন। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার নিচে মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতি পাঠক অনুভব না করে পারে না।

মানুষের প্রতি কবির সেই ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর ও স্পষ্ট প্রমাণ হল তাঁর ছোটগল্প। তাই আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা এই গল্পগুলি বারংবার পড়ব।

প্রখ্যাত চেক্ মনস্বী ডঃ দুশান সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। মূল বাংলায় লিখিত এই নিবন্ধটি পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রমেলার এক আলোচনা সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাটি তিনি আমাদের দিয়েছেন—সম্পাদক।

কথা

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সাড়া নেই, শব্দ নেই,—ওরা ভাবল : বাঁচা গেল। কিন্তু
গোপনে অতলে তাকে নিলো এক সিন্ধু ;
কারণ, বুক ভরে সে ভারি এক বিদারণ চায়
একেবারে নিচু থেকে। ঠিক সেই বিস্ফোরণ। অতলে যা যায়।

একসময় ঠিক ফাটবে। চুপচাপ সমুদ্রের জল
দিন গোণে, কাল গোণে। একসময় জলমণ্ডল
আদিম ঝাঁপিয়ে উঠবে, মাথা ঝাঁকিয়ে। রূপ
পুরোপুরি দেখবে বলে আকাশের নীল টাল চুপ।

সামুদ্রিক প্রয়োজন। জল-ছেঁড়া উৎক্ষেপণ চাই
নিচের জলসকল বুকে তার করে আইচাই
উপরে উলটিয়ে সব পালটে দেবে ;—ঢেউ, জলস্তর,
বিন্যাস, বাতাস, বর্ণ। বহুদূর পঁউছে দেবে স্বর।

সে-কারণে সে-ই নিলো ও-কথাটি। গভীর গোপনে
ধরে রাখবে প্রাণজোড়া, ভয়ঙ্কর ভারি শুভক্ষণে।

বাক্‌বহ্নি

অরুণাচল বসু

উচ্চারিত হতে গেলে কোন্ কণ্ঠ স্বতঃ স্ফুটমান—
আরোপিত আত্মনতি নও তুমি, নিহিত সত্তার ;
বাচনে সূচিত, প্রীত আচরণে লালিত সুমিতি,
শালীন, অমিতবিত্ত, অন্তঃশীল, হে উত্তরদ্যুতি !

শতায়ু-প্রসবে এই উন্মীলিত মানচিত্রে রেখা—
তুমি কোন্ হৃদ্ভূমির উদ্ভাসনে রূপমগ্ন একা ?
মণ্ডিত বলয়ে স্থিত মায়াঞ্জন সন্নিহিত বুকে
অ-লক্ষ্য নিখিল-পুষ্প ফোটাবে কী বর্ণের কৌতুকে :

> উত্তরিত আয়ুতীর্থে কী কল্লোল, ধৌত স্মৃতিদাহ,
> উপনীত সুষমায় অভিষিক্ত ফুল্ল সে-পুণ্যাহ ;
> জলে সিক্ত জলকণা, শোণিতে লোহিত শ্বেত অণু
> সত্তার সুঠাম বৃক্ষ—অমল সংসক্ত বরতনু ।

হে স্নাত বালার্ক, বৃত বাক্‌বহ্নি তিমির অর্গলে—
স্ফুরিত আলেখ্যে কোন্ বিমূর্ত ছন্নতা যায় টলে !

সরব

মানস রায়চৌধুরী

বলতে হবে এইবেলা। তোমার মহিমা ধীরে মাঠের ওপারে অস্তগামী
"ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে চেঁচিয়ে উঠেছি পাখি, ঘুমের ভিতরে
তারপর সেই বক্ররেখা পীন প্রবালচুম্বিত দীপ্তি দেখে
মনে কি হয় নি তুমি স্পন্দিত যৌবন ঘিরে আরেক রকম দেবালয়
অস্থির নিঃশ্বাসে দ্রুত জেগে উঠতে হয়েছিল স্বপ্নভাঙা ভোরের বিষাদে।

ওই কান্তি, তবু উদ্ভাসিত কেন পোশাকে অনিদ্র গোলাপের
সম্মোহন এঁকে ছিলে? আলোর বাঁকানো কাঁচে শেষ বেলা যায়
আহত, জলের পাশে পড়ে আছি, অন্ধকার যেন নদীতীর—
এই বয়সের নৌকা অনীশ তরঙ্গে যাবে কোথায় ওপারে,
যদি সব ভুলে যাই, খুব তাড়াতাড়ি বলছি কার আঁচলের ক্ষমা লেগেছিল মুখে।

রোদের সকালে

পরেশ মণ্ডল

বেলাবেলি কাজ সেরে রেখো,
নাহলে অজস্র মেঘ ফোঁটাতে পা রেখে বৃষ্টি হবে
অন্ধকার ডানা ঝাড়বে। অতএব শোনো
দিনে দিনে পথ চিনে নাও।

সেদিন রাতের ঘোরে পাখিটা কেবল
কেঁদেছে বলেছে, বেশ করে
বুঝেছি আমাকে এতদিন শুধু কিনেছ বেচেছ
এবার তারার ছায়া দাও
আমি রোদ হব—গাছে গাছে রোদ হব।

এখনো সময় আছে, সবে তো বিকেল!
ছুটে যাও জল আনো, প্রদীপটা জ্বালো;
ঘুমে ঘুমে না কাটিয়ে আজকের রাত
বিরহে কাটাও;
ভোর হলে পাল তুলো, সকলের সাথে
দাঁড় ধরো রোদের সকালে।

আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের নাটক

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগান্তকারী আদর্শ-নির্ভর আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনে সাধারণত দু ধরনের যোগদানকারীর আধিক্য দেখা যায়। এক, শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আস্থাশীল বিশ্বাস-প্রধান মানসিকতাসম্পন্ন; দুই, যুক্তিপ্রসূত প্রশ্নে আত্ম-জর্জরিত বুদ্ধি-প্রধান প্রকৃতির মানুষ। আধুনিক বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। চিন্তাটা পুরনো হলেও নতুনভাবে মনে উদিত হল আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের তিনটি নাটক পড়ে। …"don't let me finish this life thinking I lived for nothing. We got through, didn't we? We got scars but we got through."—বৃদ্ধা নায়িকার এই উক্তিটিতে ওয়েস্কারের 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'র সমাপ্তি। ওয়েস্কারের ত্রয়ীর এই প্রথম নাটকটির পরবর্তী উত্তরভাগ যথাক্রমে 'রুট্স্' ও 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট্ জেরুজালেম্'। উদ্ধৃতিটিতে আদর্শানুরক্তির যে ব্যাগ্র অঙ্গীকার লক্ষ্য করি, তার সঙ্গে বুদ্ধি-উত্তেজিত সন্দেহশীলতার সংঘাত এবং অবশেষে চতুর্দিকব্যাপী নৈরাশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবোধের উপর বিশ্বাসরক্ষার কৃচ্ছ্রসাধিত সংগ্রাম, তিনটি নাটকেরই মূল উপজীব্য। অবশ্য এ কথা সর্বদাই স্বীকার্য যে যখন অভিনয়ই নাটকের জীবনদায়ক নিঃশ্বসন, তখন মঞ্চস্বরূপেই নাটক দর্শনীয়। তার বিকল্প পঠন; যদিও পাঠে নাটকদর্শনপ্রাপ্ত আনন্দের শতাংশও পূর্ণ হয় না। শুনেছি এ তিনটি নাটক বিলেতে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। যেহেতু তক্রপানে দুগ্ধপানলিপ্সুর পরিতৃপ্তি শাস্ত্রবিধিসম্মত, তাই নাটকগুলির পঠনে দর্শনের অভিলাষ কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হতে পারে, এই ভরসায় এ আলোচনার অবতারণা। তার পূর্বে ওয়েস্কার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আর্নল্ড্ ওয়েস্কার বয়সে তরুণ; তিরিশের দ্বারপ্রান্তে সমাগত। জন্ম. লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে। নাটক রচনায় অধুনাখ্যাত জন্ অসবোর্নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, তাঁকে 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন্' গোষ্ঠিভুক্ত করা অন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা

গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ওয়েস্কার শ্রমিকসন্তান; দ্বিতীয়ত, তিনি ইহুদি বংশোদ্ভূত। স্বশ্রেণী ও স্বজাতির প্রতি গভীর অনুরাগের প্রতিফলন তাঁর নাটকের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট বলেই, ঘটনা দুটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি' ঘোরতর রাজনৈতিক নাটক। লণ্ডনের শ্রমিক-অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের ইহুদি এলাকার একটি ছোট শ্রমজীবী পরিবার এ নাটকের প্রধান চরিত্র। বর্তমান বিলেতী শ্রমিকসাধারণের নমুনা বলে এদের বিবেচিত করা উচিত হবে না। কারণ ইহুদিজাতি সম্পর্কিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, রাজনৈতিকভাবেও এ পরিবারের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা—প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। সুতরাং সক্রিয় রাজনীতি এদের প্রাত্যহিক জীবনকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের শেষ পর্যন্ত—এই তিন দশকের ঘটনাবহুল আন্তর্জাতিক ইতিহাসের বিপর্যস্ত স্রোতরাশির প্রতিক্রিয়ায় পরিবারটির ক্রমপরিবর্তনই এ নাটকের উপপাদ্য বিষয়। নাটকের শুরুতে সংযোজিত নাট্যকারের স্বল্পায়ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: " 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি' সোভিয়েত-বিরোধী নাটক হিসেবে কখনই লেখা হয় নি।......ইন্‌কুইজিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অর্থ যেমন সমগ্র খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করা নয়, ঠিক তেমনি সোভিয়েতের সাম্প্রতিক অপরাধ-স্বীকৃতির ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা মানেই সমাজতন্ত্র-বিরোধী আক্রমণ নয়। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে লাভ নেই। খুব অল্প লোকের হাতই আজ পরিষ্কার। আমরা শুধু আর একবার যেন ভেবে দেখি।" নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫৮ সালে। সুতরাং কথাগুলি অর্থব্যঞ্জক।

নাটকটির শুরু ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ। আর ইংলণ্ডের ইহুদি সমাজের পক্ষে সময়টা নানা বিপজ্জনক ঘটনার সন্ধিক্ষণ। জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানের ধাক্কায় ইওরোপে ইহুদি সমাজের ভাগ্যবিপর্যয় ও খাস ইংলণ্ডে মস্‌লির নেতৃত্বে ইহুদি-বিরোধী ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাতের পটভূমিকায় প্রথম দৃশ্যের ঘটনাবলী সাজানো হয়েছে। সেরা কাহ্‌ন্, তার স্বামী হারি, কন্যা এডা, পুত্র রনি ও আশেপাশের শ্রমিক বন্ধুদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মিছিলে অংশ গ্রহণের উৎসাহের হাওয়ায় প্রথম দৃশ্য প্রায় উড়ে চলে। এরই ফাঁকে জানা যায় যে এডার প্রিয়তম ডেভ্ স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সৈনিক হয়ে গণতন্ত্র

ঝঙ্কার সংগ্রামে যোগ দিতে চলেছে। কিন্তু এই উদ্দীপনার ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভবিষ্যৎ সাংসারিক সঙ্কটেরও সূত্র নিহিত রয়েছে। সেরা কাহ্‌নের স্বামী হ্যারি সৎ-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কমিউনিস্ট, কিন্তু কর্মবিমুখ, কিছুটা ভীত ও দায়িত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক। সেরার প্রচণ্ড জীবনীশক্তির তৎপরতার সঙ্গে তার শান্তজীবনযাপনের ইচ্ছার নিত্যনৈমিত্তিক সংঘাতের দুঃসহ বর্ণনায় তাই প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের সময়কাল যুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সাল। কাহ্‌ন পরিবার উঠে এসেছে লণ্ডনের উত্তরে হ্যাকনি অঞ্চলে—অবস্থাপন্ন ইহুদিদের বাসস্থান। আর্থিক স্বচ্ছলতাটা চোখে পড়ে। মনে রাখতে হবে যে ইতিমধ্যে লেবর দল মন্ত্রিত্ব পেয়েছে। সংসারেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বড় মেয়ে এডা স্বতন্ত্র থাকে। তার স্বামী ডেভ্‌ সামরিক কর্তব্য থেকে কবে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরবে তার আশায় দিন গুণছে। ছোটবেলার রাজনৈতিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুত্র রনি সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী ; সে দিবসের মিছিল-সংগঠন ও ইস্তাহার বিতরণে সর্বদাই ব্যস্ত। এ কাজে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও উৎসাহ উদ্দীপক তার মা সেরা। অপর পক্ষে হ্যারি ক্রমশই আলস্যের চোরাবালিতে ডুবছে। একাদিক্রম জীবিকাশূন্য জীবনযাপনের মাঝে মাঝে চাকুরি জোটে ; কিন্তু কিছুকাল পরে নিজের দোষেই আবার বেকার হয়ে ঘরে ফেরে। এই নিয়ে স্ত্রী সেরার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক্রমেই চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছয়। একদিন কলহের কোনো এক উত্তপ্ত মুহূর্তে হ্যারি হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। মনের ব্যাধি এবার শরীরকে সংক্রামিত করে। মন-মেজাজ তিক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে হ্যারির কথাগুলি তার জীবন-দর্শনের ইঙ্গিত দেয় : "What I am—I am. I will never alter···I'm an old man and if I've been the same all my life so I will always be."

তৃতীয় অঙ্কে হ্যারির পক্ষাঘাত তার সমস্ত দেহকে অক্ষম করে তোলে, বাক্‌শক্তি কেড়ে নেয়। এ পক্ষাঘাত অনেকটা প্রতীকধর্মী ; নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের মানসিক নির্জীবতার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ব্যাধিও এগিয়ে চলে। তার পুরনো বন্ধু মন্টি পার্টি ত্যাগ করে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় মন দিয়েছে। সেরা ও হ্যারির সবচেয়ে প্রিয় সন্তান রনি, যার উপর তাদের আশা-ভরসা ছিল প্রচুর, যে স্বপ্ন দেখত শিল্পী হবার, সেই রনি প্যারিসের কোনো হোটেলে

সামান্ত পাচকের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। একমাত্র সেরা, এই বার্ধক্যেও পার্টির অক্লান্ত কর্মী রয়ে গেছে। সেই অতীতের উদ্দীপনা, আদর্শবাদের উন্মাদনা এখনও সময়-অসময়ে দপ করে জ্বলে ওঠে। শেষ দৃশ্যের ঘটনার কাল ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস। সোভিয়েতের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস সন্ত সমাপ্ত হয়েছে। বহুদিনের অপ্রকাশিত খবরের অপ্রত্যাশিত উদঘাটনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত রনি ফিরে এসেছে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের কাছে— যে মার কাছ থেকে সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল সে, যে সেরার উৎসাহ তার রাজনৈতিক জীবনের প্রাণদায়ক রক্ত-সংবহনস্বরূপ ছিল। মায়ের আদর্শবাদের কঠোর সংকল্প তার মনে আর পুরনো ভক্তি জাগায় না; ধিক্কার দিয়ে বলে: "You're a pathological case......you're still a communist." জবাবে সেরা উত্তেজিত হয়ে জানায় কেন সে কমিউনিস্ট; কমিউনিস্ট আদর্শবাদ রক্তের কণা হয়ে তার শরীরে বইছে। সরল ভাষায় নিজের প্রয়োজনটাকে ব্যক্ত করে: "If the electrician who comes to mend my fuse blows it instead so I should stop having electricity? I should cut off my light? Socialism is my light, can you understand that? A way of life.... I've got to have light. I'm a simple person, Ronnie, and I've got to have light and love."

অবিচলিত বিশ্বাসশক্তিতে সেরা কাহ্ন্ হয়তো ডিকেনস্-এর মাদাম দেফার্জ্ বা হেমিংওয়ের Pilar-এর সমতুল্য হতে পারে, যদিও রক্তপিপাসু উগ্রচণ্ডা বলে তাকে কখনই ভুল হয় না। কিন্তু 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'র অভিনবত্ব সেরার চরিত্রে নয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে সকল প্রশ্ন নাট্যকার অন্যান্য চরিত্রদের মুখে দিয়েছেন, মনে হয় চিন্তাশীলতার অভিব্যক্তি তাতেই বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। আসল কথা নাটকটিতে লেখক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি সহানুভূতিসূচক দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে একদা সক্রিয় কমিউনিস্ট এডার রাজনীতিবিমুখতার কারণটা আশ্চর্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। ছোট ভাই রনি মে-দিবসের মিছিলের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করে বাড়ি ফিরে এডাকে প্রশ্ন করে: "আসবে তো?

এডা: কে জানে!

রনি : কে জানে যাবে ? মিছিলে আর উৎসাহ পাও না ?

এডা : না, পাই না।

রনি : বুঝতে পারি না। তুমি আর ডেভ্ পুরনো দিনে আগে আগে চলতে। আমি আমার সমস্ত চিন্তা তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই পেয়েছি—অথচ এখন—"

এখন এডার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রৌঢ়ত্ব ও ক্লান্তির ভাব এসেছে। শহরে জীবনের নিরানন্দ কায়িক শ্রমের বিরক্তি থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে বাস করার স্বপ্নে বিভোর এডা। সেরা ও হ্যারির সদাকলহপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করে এডা বলে—"In the country we shall be somewhere where the air doesn't smell of bricks and the kids can grow up without seeing grand parents who are continually shouting at each other." তাছাড়া রাজনৈতিক কাজকর্মের বিভ্রাট থেকে চিরতরে মুক্তির সুযোগও থাকবে। রনি আশা করে ডেভ—যে ডেভ্ স্পেনে লড়াই করেছে, সে কখনও এডার মানবসমাজ-ত্যাগের এ-প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। মানবসমাজের নাম শুনে এডা নাসিকাকুঞ্চিত করে। রনি অবাক হয়ে ভাবে, সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ সবে শুরু হচ্ছে, অথচ—। এডা ঠাট্টা করে বলে—"It's always only just beginning for the Party. Every defeat is victory and every victory is the beginning." আসলে এডার রাজনীতিবিমুখতা ও সর্বাত্মক বিদ্বেষের মূল কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অবসাদ ও অভিজ্ঞতাই নয়। সে মনে করে সব সমস্যার মূলে রয়েছে এ যুগের শহরে শ্রমশিল্পের অমানবিক বিস্তার। তার মা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—"কিন্তু তাই বলে পালিয়ে যাবে ? জীবন এখনও চলছে। মানুষ বিয়ে করে, তার ছেলে-মেয়ে হয়, সে হাসে, হাসবার কারণ খুঁজে পায়। মানুষ সবসময়ই হাসতে পারে। পারে না ?" এডা জবাবে বলে, "এর অর্থই জীবন নয়। জঙ্গলের মধ্যেও ফুল ফোটে; তাই বলে জঙ্গলকে, তার গাছ-পালার বিশৃঙ্খলাকে, তার জন্তু-জানোয়ারের ভয়ার্ত চিৎকারকে তো আর অস্বীকার করা যায় না।" এডার পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ; "তোমরা কোনোদিনও এই শ্রমশিল্প জগতের জঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করোনি। তোমরা এ সমাজের মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চাওনি—নিজেরা তা শুধু অধিকার করতে চেষ্টা করেছ। যন্ত্রের মালিক না হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

তার বড় খাটুনি—এইটেই তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড়. অন্তায় বলে গণ্য হয়ে এসেছে। যন্ত্রের মালিক হলেই যেন সব সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে।" এডার এই যোগাযোগের আড়ালে, খুঁজলে হয়তো কিছু সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ঝোঁকটা উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারের উপরই গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে ; অথচ বর্তমান ধনতান্ত্রিক উৎপাদনশক্তি-প্রসূত শ্রমশিল্প-সমাজের মানবমন-বিধ্বংসকারী মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে সচেতন আক্রমণে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেক সময় ব্যর্থ। আধুনিক উচ্চমানের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মেশিন-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক যে প্রায় অটোমাটন বা কলের মানুষে পরিণত হচ্ছে—এ কথা অনস্বীকার্য। শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে এর থেকে বড় ক্ষতিকারক আর কি হতে পারে? শ্রমিকদের সংগ্রামশীলতা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে চিরতরে পঙ্গু করে দেবার সবচেয়ে বড় উপায়, তাদের চিন্তাশক্তিকে সংজ্ঞাহীন করে দেওয়া, যন্ত্রের নিত্যনৈমিত্তিক আওতায় এনে তাদের হৃদয়কে মানবিকমূল্যশূন্য করে তোলা ; কার্ল মার্কস যার বর্ণনা করে বলেছিলেন—"···the intellectual desolation, artificially produced by converting immature human beings into mere machines for the fabrication of surplus-value, a state of mind clearly distinguishable from the natural ignorance which keeps the mind fallow without destroying its capacity for development···"(ক্যাপিটাল, ১ম পর্ব)। এ যুগের শ্রমশিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এইভাবে শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার কাজে নিয়োজিত করেছে। এ সমস্তার সমাধান অবশ্যই এডা-নির্দেশিত শ্রমশিল্প-বর্জন ও গ্রাম-প্রত্যাবর্তন নয়। তার এ মোহের বিনাশ ঘটতে বেশি দেরি হয় না, যখন দূরের গ্রামে স্বামীর সঙ্গে সংসার গড়তে যায় সে। এ আশাভঙ্গের কাহিনী অবশ্য ওয়েস্কারের শেষ নাটক 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম'-এ বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক, মোটকথা, শ্রমশিল্পজগতে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে আরও মানবোচিত করার দাবি না তুললে, শ্রমিক-আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সাধনের মূল হাতিয়ার—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীই—দুর্বল হয়ে পড়বে। এ আশংকার এত বিস্তারিত আলোচনা 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'তে অবশ্যই নেই ; কিন্তু তার ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। এডার শেষ কথা : "How can we

care for a world outside when the world inside is in disorder ?"

রাজনীতি থেকে পলায়নী প্রবণতাতেও মানসিক মুক্তি মেলে না। সেরা-হ্যারির পুরনো বন্ধু মন্টি সস্ত্রীক এসেছে কাহ্নদের বাড়িতে। হ্যারি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বাকশক্তিহীন-প্রায়। মন্টি শাক-সবজীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যস্ত; কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছে অনেককাল। পারস্পরিক স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে অতীতের রাজনৈতিক জীবনের কথা এসে পড়ে। যেহেতু সেরা আজও কমিউনিস্ট ও মন্টি পার্টিত্যাগী, ব্যাপারটা অস্বস্তিজনক হয়ে ওঠে। অন্য প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলেও, রাজনীতি যাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তাদের অতীতের স্মৃতির অর্থই কমিউনিস্ট পার্টির কথা। তাই মন্টি অবশেষে সেরাকে বোঝাতে চায় কেন সে পার্টি ছেড়েছে। সোবিয়েতের তথাকথিত ইহুদী-বিদ্বেষের কথা বলে, পার্টি কর্মীদের উগ্র স্বভাবের কথা বলে। জবাবে সেরা বলে—"And supposing it's true, Monty? So? What should we do? Bring back the old days?" মন্টি নিরুপায় হয়ে বলে—"সমস্যার কোনো সমাধান নেই।...একজন মানুষ এর বেশি কি করতে পারে? সেরা, বিশ্বাস করো। একটা বাড়ি, কয়েকটি বন্ধু আর নিজের পরিবার—এর থেকে বড় জীবনে আর কি আছে?"

সেরা: আর যখন তোমার পরিবারের ওপর কেউ অ্যাটম বম ফেলবে?

মন্টি: (অনুনয়ের ভঙ্গিতে) বলো কি করতে পারি আমি?...আমি নেহাতই সামান্য। কাকে আমি বিশ্বাস করব? এ জগতটা বিরাট আর ঘৃণা উন্মাদ রাজনীতিবিদে ভর্তি! আমি তাদের তো বিশ্বাস করতে পারি না, সেরা।"

মন্টির স্বচ্ছ যুক্তির আড়ালে তার নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো অদ্ভুতভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অতীতকে অস্বীকার করতে গিয়েও, সে দিনগুলির উদ্দীপনা, ভ্রাতৃত্ববোধের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে: "All the songs we sang together and the strikes and the rallies...... Everyone in the East End was going somewhere. It was a slum, there was misery but we were going somewhere. The East End was a big mother."

এভাবে অবসাদজনিত রাজনীতিস্পৃহাহীনতা, মন্টির পার্টিত্যাগোত্তর অতীতমুখী আকুলতা, আমাদের দেশেও পরিচিত ঘটনা। রনি শেষ দৃশ্যে ব্যর্থ-বিহ্বল হয়ে যখন মায়ের কাছে দাবি জানাচ্ছে: "Take me by the hand and show me who was right and who was wrong. Point them out. Do it for me. I stand here and a thousand different voices are murdering my mind."—তখন তার এই আকুতিতে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের রাজনৈতিক দ্বিধা-সংকোচের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই। ঠিক এই কারণেই চরিত্রগুলি সার্থক সৃষ্টি। আসলে সমস্যাটির একদেশদর্শী সমাধান না দিয়ে, বিভিন্ন কোণ থেকে তার সামগ্রিক চেহারাটা তুলে ধরার ফলেই 'চিকেন্ স্যুপ্ উইথ্ বার্লি' একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাটকে পরিণত হয়েছে।

ওয়েস্কারের ত্রয়ীর পরবর্তী নাটকগুলি সময়ানুক্রমিক সূচীরক্ষায় প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই দ্বিতীয় নাটক 'রুট্স্' যদিও এই ত্রয়ীর অন্তর্গত, সময়কালের সুনির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন তাতে নেই। ঘটনাগুলি পূর্ববর্তী নাটকের উল্লিখিত তিনদশকের মধ্যবর্তী বলে মনে হয়। 'রুট্সের' চরিত্ররাও নূতন ও অপরিচিত। স্বচ্ছন্দে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক বলে অভিহিত করা যায়। 'চিকেন্ স্যুপ্ উইথ্ বার্লি'র সঙ্গে এর ক্ষীণ সংযোগ রক্ষা করেছে রনি, যে স্বয়ং এ নাটকে অনুপস্থিতই রয়ে যায়, কিন্তু যার অস্তিত্ব নাটকের মূল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নর্ফোকের গ্রামের মেয়ে বীটি ব্রায়ান্ট লণ্ডনে চাকরি করতে গিয়ে রনি কাহ্নের সঙ্গে প্রণয়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। রনিকে গ্রামের বাড়িতে সপ্তাহান্ত কাটাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে, বীটি ছুটিতে বাড়ি ফেরে। রনির আগমনের অপেক্ষায় বীটির উৎসাহ এবং অবশেষে তার আসার পরিবর্তে এক হৃদয়বিদারক পত্রের প্রেরণ—যে চিঠিতে রনি জানায় যে তার পক্ষে বীটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা নানা কারণে আর সম্ভব নয়—এই কাহিনীই 'রুট্স'-এর মূল কাঠামো। 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'তে যেমন শ্রমিকসম্প্রদায়ের একটা বিশেষ অংশের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছিল, এ নাটকে আধুনিক ইংলণ্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীর প্রতিনিধিস্বরূপ একটি পরিবারের এক মর্মান্তিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বীটির গ্রাম্য মানসিকতা লণ্ডনের আবহাওয়ায় ও রনির পরিচালনায় চিন্তাশীলতার রূপ গ্রহণে প্রস্তুত হচ্ছে। স্বভাবতই তার মা-বাবা-বোনদের

আচার-ব্যবহার, রুচি, কথাবার্তা—সবকিছু সম্পর্কেই বীটির মত স্বতন্ত্র। উভয় পক্ষ থেকেই পারস্পরিক বুঝবার অক্ষমতাটা বীটি ও তার মায়ের কথোপকথনেই পরিস্ফুট। উভয়েরই সংলাপ বিরুদ্ধোক্তিপ্রায়প্রসূত। বীটির কথার বৃহদাংশই রনি-সম্পর্কিত, নূতন সদ্য-আস্বাদিত সাংস্কৃতিক জগতের আলোর চমকে দীপ্ত। অপর পক্ষে তার মা, গ্রামের বাসি ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বীটিকে ক্লান্ত করে তুলছে। শেষে মেয়ের বিরক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশে মা বলে ওঠে : "I don't know what's gotten into you gal, no I don't." মায়ের হাল্কা সুরের আধুনিক গান শুনবার প্রবণতার বিরুদ্ধে বীটি নূতন আমদানী রুচিবোধের পরিচয় দেয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে। 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট' চিত্র-রচনা করে ঘর সাজায়। রনির নজির উল্লেখ করে সস্তা 'কমিকের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। শুনে তার ভগ্নীপতি জিমি ঠাট্টা করে বলে : "What's alive about a person that reads books and looks at paintings and listens to classical music?" এই নূতন রুচিবোধের সমর্থনে অবশ্য বীটি নিজের ভাষা খুঁজে পায় না; রনির উক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। অধিকাংশ সময়েই সে রনির ভাষায় কথা বলে। তার উদ্দীপনা, ছুটোছুটি ও কর্মতৎপরতায়, আমরা 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'র অগ্রগামী রনির উন্মাদনার ছায়া খুঁজে পাই। বোঝা যায়, শুধু রনির কথাই নয়, তার চরিত্রের আকর্ষণীয় গুণগুলিও মেয়েটিতে সংক্রামিত হয়েছে। কারণ সমস্ত নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের প্রাণহীন নিশ্চল ঔদাসীন্যের মধ্যে একমাত্র বীটিই জীবন্ত ও চারিপাশের ঘটনায় তার মন সংবেদনশীল। পরিবেশের সঙ্গে তার বিরোধটা গ্রাম-শহরের পুরাতন সংঘাতের পুনরুত্থান বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। আসলে সংঘর্ষটা বুদ্ধিবাদী শ্রমজীবী ও তার নির্মনন সহকর্মীদের মধ্যে—যে সংঘর্ষ ইংলণ্ডের গ্রাম ও শহর, উভয়ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান সত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে। বীটি এক জায়গায় মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলছে : "You give me nothing that was worth while, nothing...... I can't even speak English proper because you never talked about anything important....It makes no difference country or town. All the town girls I ever worked with were just like me." কিন্তু রুচিহীন অতীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বীটি যত স্পষ্ট হতে পারে, বিকল্প নূতন রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতার সমর্থনে সে ততটা আত্ম-

নির্ভরশীল নয় ; রনির শরণাপন্ন হতে হয়। নূতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধগুলি স্পষ্টতই তার এখনও পর্যন্ত আয়ত্তে আসে নি।

কিন্তু এই সংঘর্ষের অন্তরালে ইংলণ্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীশ্রেণীর যে চেহারা চোখে পড়ে তা সত্যিই মর্মান্তিক। তাদের আর্থিক দারিদ্র্য হয়তো কিছুটা দূর হয়েছে ; দু-একজনের ঘরে টেলিভিশন্ এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। শহরে শ্রমিকধর্মঘট হচ্ছে জেনে, তা ভেঙে দু-পয়সা বেশি রোজগার করার উৎসাহ প্রকাশ করতে জিমি দ্বিধা বোধ করে না। বিশ্বব্যাপী কি ঘটছে, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেও এরা আত্মসন্তুষ্ট। বীটির জ্ঞানাহরণের প্রচেষ্টাকে তাই এরা বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, জনগণের ধনতন্ত্র ইত্যাদি মুখরোচক সংজ্ঞাথের আড়ালে শ্রমিকসাধারণকে ক্রমশই একটা চিন্তাশূন্য অর্থরোজগারসর্বস্ব মানসিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এদের এই সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জার অভাব, নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসচেতনতা, এ যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থ-আস্ফালনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অর্থপ্রাপ্তির আশায় উৎকোচের পরিবর্তে মানুষের চিন্তাশক্তিকে জড়পদার্থে পরিণত করার এ জাতীয় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কমিউনিস্টরা একটা জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী ; তাই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবীর সংগ্রামেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতকলা—এক ব্যাপক জগতে তাদের আগ্রহ। ঠিক এই কারণেই পূর্ববর্তী নাটকের শুরুতে দেখা কাহ্নের সংসার ও পরিবেশকে যত জীবন্ত ও বহুমুখী বলে মনে হয়, 'রুট্স্'-এর বীটি ব্রায়ান্টের পরিবার তাদের পাশে ততই ম্লান ও নির্জীব হয়ে বিলীয়মান হয়ে পড়ে।

'রুট্স্'-এর অবিস্মরণীয়তা তার শেষাংশে। সারাদিন রনির আগমনের অপেক্ষায় তার সম্বর্ধনার প্রস্তুতির ব্যস্ততায় ক্লান্ত বীটি যখন রনির কাছ থেকে চিঠি পেয়ে জানতে পারে তাদের দুজনের সম্পর্ক আর স্থায়ী হবে না, তখন এ জাতীয় নাটকের চিরাচরিত পরিণতি অনুসারে আমরা আশা করি যে বীটি এবার ভেঙে পড়বে। কিন্তু বীটি সত্যানুসন্ধানের সংগ্রামে সৎ ও মননশীল। তাই চিঠিটা পড়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ এতদিনের নিরুদ্ধ জগৎটা তার কাছে আলোকিত হয়ে ওঠে। রনির সঙ্গে এতাবৎকালীন সম্পর্কটা নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয় : "He always

wanted me to help him but I never could....He gimme a book sometimes and I never bothered to read it....He used to beg me to discuss things but I never saw the point on it." রনির অপেক্ষায় উপস্থিত বীটির মা-বাবা, বোন, ভগ্নীপতি—প্রত্যেকেই ঘটনাটাকে অবধারিত ভেবে, বীটির উন্নাসিকতার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে মনে করে যারপরনাই আনন্দিত। তাকে সান্ত্বনা দিতে কেউই এগিয়ে আসে না। বীটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে: "So you're proud on it? You sit there smug and you're proud that a daughter of yours wasn't able to help her boy-friend." তার উদাসীন আত্মীয়স্বজনকে ধিক্কার দিতে দিতে বীটি অনুভব করে: "কৃষক-পরিবারে জন্ম হলেও, আমার কোনো শেকড় নেই···পৃথিবীটা দুহাজার বছর ধরে বড় হয়ে উঠেছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না। আমরা নিজেরা কি, কোথা থেকে এসেছি—কিছুই জানি না।···Education cut only books and music—its asking questions all the time." প্রায় নিজের মনেই বীটি সংস্কৃতি, সুস্থ রুচিবোধ, এক কথায় চিন্তাশীলতার শেকড়ের অভাবের কথা বলে চলে। বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন আবিষ্কার করে ফেলে বীটি। নিজের কথা যেন ও নিজে এই প্রথম শুনছে। চারদিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলে—"শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? আমি কথা বলছি। আমি কথা বলছি।" স্বর্গীয় কিছু যেন উন্মোচিত হয়েছে ওর সামনে, এই শক্তিতে সে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে ওঠে: "I'am not quoting no more···it's happening to me, I can feel it's happened, I'm beginning, on my own two feet—I'm beginning." রনির বচন-উদ্ধৃতির প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে, বীটির নিজের ভাষায় চিন্তা প্রকাশ করার ক্ষমতার জন্মলগ্নে, 'রুট্‌স্'-এর যবনিকাপাত। নাটকটির নাম হয়তো 'এক বুদ্ধিবাদীর জন্ম' দেওয়া যেত। কিন্তু 'রুট্‌স্' কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বীটির আলোকপ্রাপ্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তার জীবনযাত্রার মূল শিকড়—তার পরিবার; অজ্ঞ, চিন্তাশূন্য, আত্মসন্তুষ্ট ব্রায়ান্ট পরিবার। বীটির নিজের ভাষায়: "It's not only the corn that need strong roots, you know, it's us too." তাই নাটকের বক্তব্যের সমস্ত প্রবণতাটা মানবজীবনের চিন্তাশক্তির এই শিকড়ের প্রয়োজনীয়তার উপরই গিয়ে পড়েছে।

নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে যে ত্রয়ীর মধ্যে 'রুট্স্' সর্বশ্রেষ্ঠ। নাটকটি স্পষ্টতই 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'র মতো প্রকাশ্য রাজনীতি সম্পর্কিত নয়। অবশ্য রাজনৈতিক চিন্তাটা বক্তব্যের অন্তঃস্রোতরূপে বয়ে চলেছে। বীটির সঙ্গে তার পরিবারের দ্বন্দ্বটা আসলে সমকালীন সমাজব্যবস্থারই সমস্যারই রাজনৈতিক সমালোচনা। এর তুলনায় 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম্' দুর্বল বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানের পরমুহূর্তেই ডেভ্ ও এডার গ্রামে সংসারস্থাপনের চেষ্টা ও বিফলতার কাহিনীই এ নাটকটির উপপাদ্য। গত শতাব্দীর ইংরেজ কবি উইলিয়ম মরিসের কায়িক শ্রমকে আনন্দদায়ক করে তোলার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ডেভ্ স্বাধীন সূত্রধরের কাজ নিয়ে নিজেদের জেরুজালেম সৃষ্টি বা সমাজতন্ত্রকে বাস্তব ঘরোয়া রূপ দেবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। সে ব্যর্থ হয় নানা কারণে—তার সঙ্গীদের ভগ্নোৎসাহকারী মনোভাব, নিজের অক্ষমতা এবং সর্বোপরি তার কর্মসূচীর অবাস্তবতা। 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'তে এডা, শহরের শ্রমিকসমাজের মানবতাবিরোধী অবস্থার বিরুদ্ধে যে তীব্র আক্রোশ প্রকাশ করেছিল, তার প্রতিধ্বনি এ নাটকের প্রতি ছত্রে পরিব্যাপ্ত। বক্তব্য স্পষ্ট না থাকলেও সংলাপ-রচনায় ও চরিত্র-সৃষ্টিতে ওয়েস্কার তাঁর পূর্বেকার নৈপুণ্য বজায় রেখেছেন।

আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের রাজনৈতিক মত জানি না। তবে স্পষ্টতই তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনটি নাটকেই চরিত্রদের ব্যক্তিগত জীবনের সংঘাত সমস্যার সৃষ্টি করলেও, তার অন্তরালে সর্বত্রই এক প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থা সর্বগ্রাসী দৈত্যের মতো বিরাজ করছে। 'রুট্স্'-এ ব্রায়ান্ট পরিবারের অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও বীটির প্রতি সহানুভূতিশূন্য মনোভাব, এই ব্যবস্থারই স্বাভাবিক পরিণাম। এদের চিত্রায়ণে প্রচলিত মামুলি 'চরিত্র' রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও যেমন নেই, দয়া-দাক্ষিণ্যের আবহাওয়ায় সিক্ত করার অপচেষ্টাও তেমনি অনুপস্থিত। একটা নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনাভঙ্গি লক্ষণীয়। পরস্পরবিরোধী ও সূক্ষ্ম পার্থক্যসম্পন্ন চরিত্রদের এই জাতীয় নিরাসক্ত অকপট বিশ্লেষণেই ওয়েস্কারের কৃতিত্ব। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, চিরায়ত সাহিত্যের গভীর জীবনবোধ ও ব্যাপক জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি ওয়েস্কারের নাটকে অনুপস্থিত; সমসাময়িক ইংলণ্ডের একটি বিশেষ শ্রেণীর কয়েকটি সমস্যার বিবরণমাত্র পাওয়া যায়। এ সমস্যাগুলি একটি দেশের বিশেষস্বরূপে

বর্ণিত হলেও, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসাধনের পথে সবচেয়ে ক্ষিপ্রগামী শক্তি হবে শ্রমিক-সাধারণের মননশীলতার উন্মীলন। লেনিনের কথাগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: "Without knowledge the workers are defenceless; with knowledge they are a force." সৎ বুদ্ধিবাদীতে রূপান্তরে বাধাগ্রস্ত হয়েই ডেভ্-এডা বর্তমান শ্রমশিল্প সমাজ থেকে পালিয়ে যায়, বীটি ব্রায়ান্ট তার পরিবার থেকে বিচ্যুত। এদের বৈশিষ্ট্য এরা কেউই শ্রেণীত্যাগী, আদর্শচ্যুত হয়ে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশাধিকারলাভে ব্যগ্র নয়, যেমন আকাঙ্ক্ষী 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন'দের উপন্যাস-নাটকের চরিত্ররা। ডেভ্ গ্রামে গিয়ে স্বাধীন শ্রমজীবী হবার চেষ্টা করে; ব্যর্থ হয়ে সে ফিরে আসে স্বসমাজে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামে উদাসীন হয়ে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বিপদ সম্পর্কেও ওয়েস্কার সচেতন। তাই 'রুট্স্'এ অনুপস্থিত রনির চিঠিতে তার আত্ম-সমালোচনা হৃদয়ঙ্গমযোগ্য: "If I were a healthy human being it might have been alright but most of us intellectuals are pretty sick and neurotic···and we couldn't build a world even if we were given the reins of government." সুতরাং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে লালিত আধুনিক শ্রমশিল্প সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণকে ওয়েস্কার গান্ধীবাদী বর্জনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক; তার মননবিরোধী ও বুদ্ধিনিরোধক মূল্যবোধের বিপক্ষে সুস্থ যুক্তিনির্ভরশীলতা সৃষ্টির চেষ্টাতেই নাটকের চরিত্ররা সংগ্রামে ব্রতী। অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে এ সংগ্রাম স্বতন্ত্র হতে পারে না; বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টারই একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে তা পরিগণিত হওয়া উচিত।

অতএব, একদিকে রনি, ডেভ্ ও এডার দ্বিধা-সন্দেহ ও যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন, যাতে আমাদের নিজেদের কোনো কোনো সময়ের হতাশা ভাষা পায়, আর অন্যদিকে অভিজ্ঞতায় ক্ষতবিক্ষত বৃদ্ধা সেরার অবিচলিত, সন্দেহ-উদাসীন আদর্শানুরক্তি—এই উভয়পক্ষেই আমাদের সহানুভূতির পাল্লা দোদুল্যমান। কারণ এদের দুটি দিক পরস্পরবিরুদ্ধ বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও, আসলে পরস্পর-পরিপূরক। বিশ্বাসনিষ্ঠার ধৈর্য ও যুক্তিপ্রবণতার সাহসের সমন্বয়েই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের আশ্বাস নিহিত রয়েছে। তাই 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম্'-এ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অন্তিম পর্যায়ে-

দাঁড়িয়েও ওয়েস্কারের চরিত্ররা সমাজতন্ত্রে স্থিরবিশ্বাসী। রনি তার বাবার কথা স্মরণ করে বলে : "The difference between capitalism and socialism, he used to say was that capitalism contained the seeds of its own destruction, but socialism contained the seeds of its own purification." ওয়েস্কারের তিনটি নাটকে বর্ণিত নানা হতাশা, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে এই আশার বাণীটিই একমাত্র আলোক যা মোহভঙ্গকেও সত্যাকৃতিতে রূপান্তরে সক্ষম।

The Wesker Trilogy. Arnold Wesker. Jonathan Cape. London. 21/s.

শুধু ফুল

কৃষণ চন্দর

—কি ধরনের ঘর চাই তোমার? বাড়িভাড়ার দালাল আমাকে জিজ্ঞেস করল। সে "তুমি" সম্বোধন করল আমার নোংরা পা-জামার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে।

—আমি এমন একটা ঘর চাই যাতে ঘর একটি হলেও তার সঙ্গে যেন আলাদা একটা বাথরুম থাকে। আর সেই ঘরের সামনে যেন সবুজ ঘাসে ভরা আঙিনা থাকে। এবং সেই সবুজ ঘাসকে ঘিরে থাকে ফুলগাছ। সেই আঙিনার মাঝে এমন একটি জায়গা থাকে যেখানে বসে রোদ পোহানো যায়। সেই সবুজ ঘাসের ওপর মাঝে-মাঝে যদি কোনো সুন্দরীকে বসতে দেখি তাহলে ভালোই হয়।

আমার পছন্দসই বাড়ির একটি ছবি তুলে ধরলাম।

—মশাই, বাসাবাড়ির খোঁজ না করে নিজের বুদ্ধির ইনসিওর আগে করান।

লোকটা খুব সমঝদার মনে হচ্ছে। আড়চোখে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে একবার দেখে নিলাম ওকে।

দালাল আমার কাছে এসে আস্তে বলল, ভাড়া কত দেবে?

—পঁচিশ টাকা।

—পঁচিশ টাকা! বলেই লোকটা হাঁচি ফেলে আবার বলল, পঁচিশ টাকায় শুধু ঐ ঘাস পাবেন, বাড়ি নয়।

—বাড়ি খোঁজার জন্য তোমাকে দৈনিক তিন টাকা করে দিচ্ছি। এই ধরনের কথা এখন বলা তোমার উচিত হয়নি! আর কোনো কথা না বলে চলো বাড়িগুলো দেখাবে।

দালালটি তিন টাকার দড়িতে বাঁধা। তাই আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার মতো হাঁটতে আরম্ভ করে দিল। ভাবলাম, প্রত্যেক মানুষের গলায় দড়ি বাঁধা আছে। তিন টাকার দড়ি অথবা তিনশো বা

তিন হাজার বা তিন লাখের। যে দামেরই হোক না কেন দড়ি একটা বাঁধা আছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা দড়ি খুঁজছি, তবে মোটা টাকার দড়ি নয়, খুঁজছি গলায় দেওয়ার জন্য। আমি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি আত্মহত্যা করার। হাঁটার সময় মন আমাকে প্রশ্ন করল, মরবেই ঠিক করলে যখন তখন আর বাসা খুঁজছ কেন? কিসের প্রয়োজনে?

আমি মনকে বললাম, দেখ, এ-ব্যাপারে তুমি নাক গলিওনা। তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা। তোমারই জন্যে আমি এক বাজে প্রেমিকার পেছনে ছুটেছি…তোমারই জন্যে আমি একটা বাজে চাকরি গ্রহণ করেছি… তোমার কথা শুনে চলাতেই আমার ভাগ্যে জুটেছে কয়েকটা অপদার্থ বন্ধু… সারা জীবন তুমি আমাকে ভুল পথে চালিত করলে। তাই বলে দিচ্ছি আজ তোমার কোনো অধিকার নেই আমার এ-ব্যাপারে নাক গলানোর। কে তুমি? কি অধিকার আছে তোমার আমাকে উপদেশ দেওয়ার।

—কই আমি তো কোনো কথা বলিনি তোমাকে। মন আবার বলল, শান্তভাবে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মরলেই যখন ঘরের কী দরকার? একটা পিস্তল যোগাড় করলেই তো পারো। তাছাড়া নদী-খাল-বিল-রেলগাড়ি-বিষ এসব তো আছেই।

—তুমি একটি আস্ত আহাম্মক। তুমি আজও আমাকে চিনলে না। আমার মতো মানুষ কি কখনও একটা সাধারণ অথচ সর্বাধরণের মৃত্যুবরণ করতে পারে! আমি মরতে চাই সানন্দে, সুন্দর পরিবেশে। একটি পরিপাটি করা ঘর…নীলাভ আলোতে ঘরটা থাকবে স্বপ্নময়। ওপরের ফ্যানটা ঘুরবে। শুধু আমার মৃত্যু মুহূর্তে ফ্যানটা বন্ধ করব আর তাতে দড়ি বেঁধে ঝুলব। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও জানলা দিয়ে যেন দেখতে পাই আঙিনা, কচি কচি ঘাস, ঘাসের আলিঙ্গনকে ঘিরে নানান রঙের ফুল। রোদ পোয়ানোর জায়গাটা। আর সেই মুহূর্তেই যদি দেখতে পাই পাশের বাড়ির সুন্দরী তন্বী তার রেশমী কালো চুল এলিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে তখন নিশ্চয়ই বেশ লাগবে আমার।

—ওমা! রাত্রে রোদ কোথায় পাবে! তাছাড়া সেই অন্ধকার মাঝ-রাত্তে সুন্দরীই বা আঙিনায় বসে থাকবে কেন তোমার জন্যে?

—তাহলে আমি দিনেই আত্মহত্যা করব। আমি যাই করি টিউ শাটু-আপ।

মন চুপ করে গেল। ততক্ষণে একটি বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। বেশ চমৎকার বাড়ি। গোল একটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম একটি সুন্দর ঘরে। প্রত্যেকটি দরজা-জানলার রঙ মনোরম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রঙের কারিগর যেন তার প্রাণের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে এই ঘরটাকে। পাশেই আর একটি ঘর। দরজা-জানলা সব নাকি সেগুন কাঠের। দালাল আমাকে বলে দিল দুটো ঘর পাশাপাশি। একটা আমার জন্যে আর একটা বউয়ের জন্যে। বউ! বিয়ের পরে দিন কয়েক যাকে স্বামীরা সব সময় ঘিরে থাকে তারপর সারা জীবন ঝগড়া ঝাঁটিতে কাটে। জীবন সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে। খাটে বিছানা পাতা আছে। বা! ঘরের একটি দরজা খুললেই সোজা বাথরুমে যাওয়া যায়। বাথরুম বটে! আরশির মেলা। মনে হয় এটি যেন দিনের পর দিন বসে উপন্যাস পড়ার জন্যে করা হয়েছে। মনে মনে বললাম, চমৎকার। আত্মহত্যার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর ঘর আর হয় না। তারপর তাড়াতাড়ি দালালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাড়া কত?

—চারশো টাকা!

মুখটা আমার ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা হয়ে গেল। দারুণ চটে গিয়ে বললাম, গবেট কোথাকার! আমি তো তোমাকে পঁচিশটাকার বাসা খুঁজতে বলেছি।

দালালটি আমাকে কোনো কথা না বলে যত তাড়াতাড়ি পারল সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিচে দাঁড়াল।

দালালটি তারপরে যে-বাড়ি দেখাল সেটাও ভালো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। আলো বাতাস আছে। বাথরুম, রান্নাঘর, বারান্দা এবং আঙিনায় ভরে আছে সবুজ ঘাস।

—ফুল গাছ কোথায়?

—ফুল গাছ তুমি লাগিয়ে নিতে পার। রোদপোয়ানোর ব্যবস্থাও হতে পারে টাকা ঢাললে। তারপর আপনি বউকে পাশে বসিয়ে রোদ পোয়াবেন।

—ফুল গাছ লাগানোর মতো অত সময় নেই আমার। আর কি বললে, বউকে পাশে বসিয়ে রোদ পোয়াব?···আরে মিঞা! বউ যদি থাকত আমার তাহলে কি আগে রান্নাঘর খুঁজতাম না! যাক, আমি যে কাজের জন্য ঘর খুঁজছি সেটা হয়তো এই ঘরেও হতে পারে। আঙিনায় আমি না

হয় কয়েকটা ফুল গাছের টব রেখে দেব। বোরশোয়ানোর একটা মামুলি ব্যবস্থাও করব। শেষ পর্যন্ত এক সুন্দরীর বসে থাকাও না হয় কল্পনা করে নেব। ভালো কথা, ভাড়া কত ?

—আড়াই শো টাকা।

—মূর্খ কোথাকার। আড়াই শো টাকার বাড়ি দেখাচ্ছ কেন ? আমি তো শুধু পঁচিশ টাকারটা চাই।

দালাল নিরুত্তর রইল। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তৃতীয় যে ঘরটি আমাকে দেখাল সেখানে প্রথমেই পড়ে বাথরুম তারপর সিঁড়িতে উঠে পাই একটি ঘর। তারপাশে রান্নাঘর। যদিও বাথরুমটা তার পাশেই হওয়া উচিত ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, এই অঞ্চলে যতগুলো বাড়ি আছে তার প্রত্যেকটাতেই এই অবস্থা। ঘরের পাশেই কিচেন, আর নিচের তলায় বাথরুম।

—কারণটা কি ?

—কারণ হল বউ রান্নাঘর থেকেই যাতে বাথরুম, শোয়ার ঘর ও সিঁড়ি দেখতে পায়।

—ভাগ্যিস আমি একটি বউ পুষিনি। আমি কিন্তু কারোর চাউনিকে ভয় করিনা। রান্নাঘর ও বাথরুমে আমার অত দরকার কিসের। আমি না হয় বাথরুমের কাজটা রান্নাঘরেই সারব। দুটোই আমার কাছে সমান।

—ওসব তুমি আর এ-বাড়ির মালিক বুঝবে। বাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একশটি টাকা দেব করো।

—আবার একশ টাকা কিসের।

বিরক্ত হয়ে সে বলল, একশ টাকা, মানে এক মাসের ভাড়া।

—ওরে বাবা! আমি হাত জোড় করে বললাম, আমি তোমার কাছে শুধু পঁচিশ টাকা ভাড়ার একটি ঘর চাইছি। তুমি আমাকে এত ঘোরাচ্ছ কেন ?

—আমার কাজ বাড়ি দেখানো। কি করে জানব শেষ পর্যন্ত আপনার কোন্‌টা পছন্দ হবে। আমার তো একটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখছি তো পঁচিশ টাকা ভাড়ার বাড়ি খুঁজতে গিয়ে লোকে পছন্দ করে চারশো টাকার

ঘর, আর তাতেই থাকে। আবার চারশো টাকার বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পঁচিশ টাকার বাড়িতেই আস্তানা গাড়ে। ভাড়াটিয়াদের মন বোঝা ভার।

এরপর দালাল আমাকে যে-বাড়িটি দেখাল সেটি পাঁচতলা-জাহাজের মতো দেখতে। বাড়িটার ওপরে জাহাজের ছবি আছে, লেখা আছে এস. এস. আত্মারাম মুলতানী। এ-বাড়ির ভেতরে মাংস, পেঁয়াজ এবং মদ খাওয়া নিষেধ।

—বউকে নিয়ে শোওয়া নিষেধ নয়তো?

দালাল আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি বলে গেলাম, এখানে হয়তো চিন্তা করাও বারণ। আকাশের দিকে তাকানো, সশব্দে খিল আঁটা, বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়েশুয়ে সিগারেট টানা, কাঁধে তোয়ালে ফেলে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে কোনো যুবতীর দিকে তাকানো—এ সবই হয়তো নিষেধ। মশাই, আমি একটি ভালো বাসা খুঁজতে বেরিয়েছি। বিনোবা ভাবের আশ্রমে ঢুকতে নয়। কথাগুলো বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দালাল লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে আমার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

এরপর দালালটা আমাকে যে-ঘর দেখাল তা দেখে সাহিত্য মনে হল বাসাটার ভাড়া পঁচিশ টাকা। শুধু একটি ঘর।

বারান্দা নেই, ঘাস নেই, ফুল নেই। ঘরটা চারতলায়। খিড়কির রড-গুলো মোটা। বাড়িওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে জানলা দিয়ে পালানোর উপায় নেই। দরজা দেখে মনে হয় তিরিশ বছর আগে একবার রঙ করা হয়েছিল, এখন সে-রঙের কোনো চিহ্ন নেই। আশ্চর্য, একটি পাখা ঝুলছে। আমি আমার কল্পনায় যে বাসাটির ছবি এঁকেছিলাম তার থেকে আঙিনা-ঘাস-ফুল এবং সুন্দরীর ছবি ছেঁটে ফেললাম। আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য শুধু একটি পাখাই যথেষ্ট। ঠিক করলাম এই ঘরটাই নিয়ে নেব।

—কিন্তু বাথরুম কোথায়?

—ঐ পাশে আছে। এক কোণের দিকে তর্জনী দেখাল।

আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখি সেখানে রয়েছে একটি মুটকী। তার চোখগুলো বড় বড়। সবেমাত্র কেউ যেন পাঁক থেকে তুলে এনেছে। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতের রঙ বদলে ফেলেছে। ঠোঁট যোড়ায়

ঠোঁটের মতো পুরু। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম, নতুন ভাড়াটে মনে হচ্ছে তোমাকে।

—মনে হচ্ছে কিনা জানিনা। আমি বাথরুমের দরজাটা খুঁজছি। আচ্ছা, এই বাথরুমটা কার? আপনার না আমার?

—এটা আমাদের দুজনেরই। তোমার এবং আমার।

"তোমার এবং আমার" কথাটা সে এমন ভাবে বলল যেন আমরা পরস্পরের জনম-জনমকে সাথী। সারাজীবনের জন্য আমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক সেই মুহূর্তেই পাতানো হয়ে গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে আরো দু'পা পেছিয়ে গেলাম। সেও এগিয়ে এসে বলল, চলে এস, ভাবনার কিছু নেই। দুজনেই মিলেমিশে কোনো ভাবে কাজ চালিয়ে নেব।

তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসল যেন মুরগীকে কেটে তার ছটফটানি দেখে কসাই হাসছে। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম দরজার কাছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দালালকে বললাম, এটাও পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। দেখ, আমাকে যদি পঁচিশ টাকা ভাড়ার ঘর না দেখাতে পারো তাহলে আমার তিনটাকা ফেরৎ দাও।

—ভদ্র পাড়ায় পঁচিশ টাকার ঘর পাওয়া যায় না। চৌকী বস্তিতে থাকতে রাজি থাক তো বলো পঁচিশ টাকার মধ্যে একটি ঘর পাইয়ে দিচ্ছি।

—চলো আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি ঘর দেখাও।

তারপর সে আমাকে নিয়ে গেল একটি নোংরা বস্তিতে। সেখানকার গলিতে সূর্যের আলো ঢোকে না। সেই বস্তিতে নিয়ে গিয়ে চৌকী বস্তির দালালের সঙ্গে আড়ালে দু-চার কথা বলে নিল। তারপর ওরা দুজনে আমার কাছে ফিরে এল। আমার দালাল বলল, এ-লোকটা যে বলছে পঁচিশ টাকার ঘর বস্তিতে পাওয়া যায় না।

—তাহলে কত টাকার পাওয়া যাবে?

—ষোল টাকার আছে। তার চেয়ে বেশি টাকার ঘর নেই।

—তাহলে ষোল টাকারটাই দেখাও।

—ষোল টাকার ঘরও বেশি নেই, মাত্র একটি আছে। কিন্তু সে ঘরটা তোমার মনের মতো নয়।

—কেন নয়? আমি বস্তির দালালের দিকে তাকিয়ে বললাম।

নোংরা বস্তির দালাল থুতনী নেড়ে বলল, বাবু, ঐ ঘরের ভাড়াটে কালকেই মারা গেছে।

—তাহলে তো ভালোই হল, ঘরটা তো খালি হয়ে গেছে।

—তা খালি হয়েছে বাবু। দুর্গন্ধী বস্তির দালাল মুখে খৈনী পুরে বলল। কিন্তু ভাড়াটে যে আমাদের মতোই একজন গরিব মজুর ছিল। চুড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করত।

—মজুর ছিল তাতে ক্ষতি কি। চুড়ি তৈরি করত কিন্তু চুরি তো আর করত না।

—না বাবু, সেকথা নয়। দুর্গন্ধী বস্তির দালাল নিজের কোমর চুলকোতে চুলকোতে বলল, চুড়ি তৈরির মজুর ছিল বটে।...কিন্তু ওর যে ওই ফুঁ দিতে দিতে বুকের একটা রোগ হয়েছিল। খুব খারাপ রোগ।

—তাতে কী হয়েছে? প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো অসুখে পড়ে। এখন প্রত্যেক অসুখেরই পেছনে একটা কারণ থাকে। কারও ফুঁ দিলে অসুখ করে আবার কারও অতিরিক্ত খাবার খেয়ে।

—তুমি ঠিক বুঝতে পারছনা বাবু। বস্তির দালাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, ব্যাপারটা হল লোকটা পাঁচ বছর ধরে এই অসুখে ভুগছিল। রোগে ধুঁকে ধুঁকে কাজ করত। ওর বাঁচার বড্ড সাধ ছিল আর ছিল একটা বউ চারটে ছেলেমেয়ে। ও মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর খালি করিয়ে নেওয়া হল, কারণ ওর বউ আর ছেলেমেয়েদের মাসে ষোল টাকার মতো ঘর ভাড়া দেওয়ার অবস্থা ছিল না। ওরা এখন এর চেয়ে খারাপ একটা বস্তিতে চলে গেছে, সেখানে ভিখিরি আর টাঙাওয়ালারা থাকে। তাই বলছিলাম এই ঘর তোমার উপযুক্ত নয়।

ছোট্ট একটা ঘর। দরজাটা নড়ছে। জানলাগুলো কালো হয়ে গেছে ধোঁয়ায়। জলের কল দিয়ে যে জল পড়ছে তার রঙ ইঁটের গুঁড়োর মতো। নলের মুখ দিয়ে খুব পাতলা করে জল পড়ছে। ঘরের ভেতর হঠাৎ একটা গোলাপ ফুলের টব দেখতে পেলাম।

—একি, এখানে গোলাপ গাছ!

নোংরা বস্তির দালাল তার হলদে রঙের দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, বাবু এই টবটা তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে! আকাশ থেকে যেন পড়লাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। লোকটা তো আমার সামনেই মারা গেছে। মরার সময় আমাকে শেষ কথা বলে গেছে—এ-ঘরে নতুন ভাড়াটে যে আসবে তাকে এই টবটা দিয়ে বলো, প্রত্যেক দিন যেন একটু জল দেয় যাতে এই গোলাপ গাছটা বেঁচে থাকে···লোকটা পাগল ছিল বাবু!

তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রচণ্ড একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল, বুকে আমার প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। ঘরের কোণে পড়ে আছে একটি গোলাপ ফুল। দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সেই ফুলের ওপর। ঘর আর ঘরের বাইরে চারিদিকেই রয়েছে নোংরা এবং অন্ধকার। অন্ধকার আর নৈরাশ্য। তার মাঝে শুধু একটি গোলাপ। মৃত্যুর সময়, ক্ষুধার সময়, জঘন্য অসহনীয় পরিবেশে, এই দরিদ্র মানুষের পরিবেশে—একটি গোলাপ। যেখানকার ঘরগুলোর ইঁটে নোনা ধরে খসে পড়ছে, যেখানে রঙের কোনো বাহার নেই, সেখানে মাত্র একটি গোলাপ।

আমি ওই ঘরটাই ভাড়া নিয়ে নিলাম। আজো সেখানে আছি।

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম

সাহিত্যে ধর্মচেতনা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কে কখন পৃথিবীর কোন্ দেশে সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর আত্মচেতনার স্বচ্ছতায় মানবজীবন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল একথা ঠিক নির্ভুলভাবে বলা যেতে না পারলেও একটা কথা আমরা সকলেই নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তিনি জীবন ও জগতের বিভিন্ন ঘটনা ও বস্তুগুলিকে অতিপ্রাকৃতের চিন্তা বা কল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পার্থিব মূল্যে সমৃদ্ধ এক একটি পৃথক সত্তারূপে দেখবার প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেবার মতো মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিগত সামর্থ তখন লাভ করতে পারেন নি। পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যই আকারগত অথবা বস্তুগত উপাদানের দিক থেকে মূলত ধর্মনির্ভর। সাহিত্য সাধনার আদিযুগে কোনো সাহিত্যিকই তাঁর জীবনচেতনার বা সমাজচেতনার গভীরে ধর্মচেতনার অবাধ এবং অসংযত অনুপ্রবেশকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। যে যুগে জীবনের ভালোমন্দকে দেবদেবীর ইচ্ছাধীন বলে মনে করে ও যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার পেছনে এক উদ্ধত অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের কল্পনা করে মানুষ তৃপ্তি পেত, সে যুগে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র জীবনানুভূতির আশা করা হয়তো সম্পূর্ণ বৃথা।

প্রাচীন সাহিত্য প্রধানত ধর্মনির্ভর হলেও ভাববস্তুর দিক থেকে তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এক শ্রেণীর ধর্মনির্ভর সাহিত্য আছে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্রকে অবলম্বন করে তার মাধ্যমে ধর্ম-অধর্ম বা পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করে তোলা এবং পরিশেষে ধর্মের হাতে অধর্মের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটানো। আমাদের দেশের 'রামায়ণ' 'মহাভারত', হোমারের 'ইলিয়াড' 'ওডেসি', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেইনড' প্রভৃতি কাব্য ও মহাকাব্যগুলি সাহিত্যে মূল ধর্মনির্ভরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্বচ্ছন্দে পরিগণিত হতে পারে। সকল

মহাকাব্যেই দেখা যায়, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যাবলীর সমস্ত বাস্তবতা ও মানুষের অপরাজেয় পৌরুষের সমস্ত লৌকিক সত্যতাকে এক অলৌকিক মায়াজালে আচ্ছন্ন ও অবলুপ্ত করে দিয়ে কতকগুলি দুরন্ত পৌরাণিক দেবতা বা উপদেবতা পাতায় পাতায় আধিপত্য করেছে এবং তাদের এই অবাঞ্ছিত অশোভন আধিপত্যের দ্বারা কাব্যরসকে রীতিমত ক্ষুণ্ণ করেছে। মিলটনের 'প্যারাডাইস রিগেইনড'-এ শয়তানের সঙ্গে খ্রীষ্টের যুদ্ধ নিতান্ত হাস্যকর। 'মহাভারত'-এ ধর্মের ধ্বজাধারী কুচক্রী কৃষ্ণের কুটিল ইঙ্গিতে কর্ণ, দুর্যোধনের মতো বীরদের পতন ও পরাজয় মর্মবিদারক। হোমারের 'ইলিয়াড' এ প্যারিস ও হেলেনের প্রেমাবেগ বিশুদ্ধ ও স্বতোৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে শুধু ধর্মের সম্মতি না থাকার ফলে তা ট্রোজনদের শোচনীয় ধ্বংসের কারণ হওয়াটা লেখকের সমকালীন ধর্মবোধ ও নয় নীতি-চেতনারই পরিচায়ক। আবার কতকগুলি ধর্মমূলক সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ধর্ম-অধর্মের কোনো দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা না করেই কোনো এক বিশেষ ধর্ম বা দেবদেবীর জয়গান করা। ভারতের বিরাট বৈদিক সাহিত্য, বাংলার বৌদ্ধ চর্যাপদ, নাথগীতিকা, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব কবিতা ও শাক্ত পদাবলী, ইংলণ্ডের অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের যাবতীয় কবিতা, খ্রীষ্টীয় নবম শতকের জর্মান কবিতা প্রভৃতি এই ধরনের সাহিত্যের নিদর্শন।

আর এক শ্রেণীর ধর্মমূলক সাহিত্য আছে যারা যে কোনো রকমের স্থূল ধর্মনিষ্ঠাকে কৌশলে পরিহার করে অতি সূক্ষ্মভাবে ধর্মকে প্রতীকরূপে প্রয়োগ করে তার মাধ্যমে স্বতন্ত্র এক বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করে তুলতে চেয়েছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' ও চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্‌'কে এই শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। Inferno, Purgatorio ও Paradiso নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত এই রূপকধর্মী মহাকাব্যে দান্তে মৃত্যুর পর মানবাত্মার সমুচিত শাস্তি ও অনুশোচনার বিভিন্ন স্তরভেদ করে স্বর্গের পথে কাল্পনিক অধিগমনকেই বাণীরূপ দান করেছেন। দান্তে কল্পনা করেছেন, উত্তর গোলার্ধের নিচে অবস্থিত ও ভূগর্ভের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রসারিত নরক হচ্ছে কাদের মতো ও মুখওয়ালা এমন এক বিশাল গর্ত যেখানে মৃত্যুর পর মানবাত্মারা অবস্থান করে। কিন্তু রূপকের দিক থেকে বিচার করলে এই নরক প্রতিটি মানবাত্মারই গভীরে অবস্থিত পঙ্কিল কামনা বাসনায় পূর্ণ এক একটি পাপের অন্ধকার গর্ত যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে নিক্ষেপ

করে। দান্তে কল্পিত ''পারগেটারিও' হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো এক দ্বীপে অবস্থিত এক বিশাল পর্বতের উপর এমন এক স্থান যেখানে মৃত্যুর পর একমাত্র অনুতপ্ত আত্মারাই অবস্থান করে। আসলে কিন্তু পারগেটারিও হচ্ছে মানবমনের সেই সমুন্নত স্তর যেখানে মানুষ আপন পাপকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক তীব্র অনুতাপের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়। তারপর পরিশেষে দান্তে মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদদের মতো দশটি স্বর্গের কল্পনা করেছেন। "From the thraldom of this corruption to the liberty of eternal glory" অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ এবং পাপ-জগতের বন্ধন হতে অনন্ত মুক্তির চিরন্তন গৌরবের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার পর মানবাত্মা যে স্বর্গসুখ লাভ করে তার তারতম্য অনুসারে দশটি স্তর আছে। ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে একে একে সব স্তর ভেদ করে তবে আত্মা পরম আনন্দ লাভ করে। দান্তে নিজেই এই মহাকাব্যের নায়ক, খ্রীষ্টীয় পাপচেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক-রূপে শয়তান-শাসিত ভুলের ভয়ানক অরণ্য থেকে ঈশ্বর-শাসিত সেই পরম সুখের স্বর্গরাজ্যের পথে অক্লান্ত অভিসারে এগিয়ে চলেছে। এই কাব্যে প্রসিদ্ধ ল্যাটিন কবি ভার্জিলকে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দান করেছেন দান্তে। এখানে ভার্জিল হচ্ছেন মানুষের সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানসত্তা ও শিল্পসত্তার প্রতীক যে জ্ঞান ও শিল্পপ্রতিভা মানুষ ঈশ্বরের করুণা ব্যতিরেকেই নিজের স্বাধীন চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা লাভ করে। কিন্তু দান্তের মতে শিল্প ও দর্শন যত বড়ই হোক না কেন তা কখনো ধর্মের সমপর্যায়ে উন্নীত হবার গৌরব লাভ করতে পারে না। এই জ্ঞান ও প্রতিভা ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গে সার্থক-ভাবে সংমিশ্রিত নয় বলেই মানুষকে তা স্বর্গলাভের অধিকারী করে তুলতে পারে না। কাব্যে তাই ভার্জিল স্বর্গপথের পথিক হয়েও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন না; তবে তিনি মৃত আত্মাগুলিকে আপন আপন পাপকর্মের প্রতি সচেতন করে দিয়ে তাদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করেছেন প্রচুর। এইভাবে দেখা যায় 'ডিভাইন কমেডি'র প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার অন্তরালে, এক একটি রূপকাত্মক অর্থ অতি সুন্দরভাবে আত্মগোপন করে আছে। Can Grande della Scala নামক একজন অনুরাগী পাঠককে লেখা একখানি চিঠিতে দান্তে নিজে একথা স্বীকার করে গেছেন :

"The subject of the whole work, then, taken merely in the literal sense is "the state of the soul after death straight-

forwardly affirmed", for the development of the whole work hinges on and about that. But if, indeed, the work is taken allegorically its subject is : "Man, as by good or ill deserts, in the exercise of his free choice, he becomes liable to rewarding or punishing justice". মানুষের ইচ্ছাশক্তি মূলতঃ স্বাধীন। দান্তের মতে এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করছে তার পাপপুণ্য।

জিওফ্রী চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর নামকরণের মধ্যে যে ধর্ম-পরিক্রমার আভাস পাওয়া যায় কাহিনীর মধ্যে কোথাও সে আভাস সত্যমূর্তি লাভ করবার সুযোগ পায়নি কখনো। সমসাময়িক ইতালীয় কবি ও কথা-সাহিত্যিক বোকাশিওর 'দি ডেকামেরন' থেকে গল্প বলার এই অভিনব রীতি সম্পর্কে বিশেষ প্রেরণা লাভ করলেও এখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন চসার। তাছাড়া গল্প বলতে গিয়ে শুরুতে মানবজীবনের সমস্ত আশা আকাংক্ষা ঈশ্বরের উপর নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে যে ঈশ্বর প্রশস্তি গেয়েছেন বোকাশিও, তা কাহিনীর সাহিত্যরসের ধারা বাঁধার পথে একান্ত প্রতিবন্ধক। সাহিত্যে ভক্তিরসের কোনো স্থান নেই ; তাই তাকে অন্য কোনো রসের আশ্রয়ে সাহিত্যে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু বোকাশিও প্রথমেই ভক্তিভাবের উচ্ছ্বসিত প্রাবল্যে ফেটে পড়েছেন।

"Ladies, it is most meet and right, that everything we do, should be begun in the name of Him who is the maker of all things. Certain it is, that all earthly things are transitory and mortal ; attended with great troubles, and subject to infinite dangers which we who live embroiled with them and are even part to them, could neither endure, nor find a remedy for, were it not for the especial grace of God that enables us." (The Decameron, Novel I)

বোকাশিওর এই উগ্র ও অত্যধিক ঈশ্বরনির্ভরতা কিন্তু চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর মধ্যে একেবারে নিরুক্ত ও নিরুচ্চার। এখানে লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবেরির সেন্ট টমাস চার্চের পথে একদল তীর্থযাত্রী একে একে যে কাহিনী শুনিয়েছে তা তৎকালীন ইংলণ্ডের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের

দৈনন্দিন বাস্তব জীবনেরই সুখ-দুঃখের কাহিনী। তাতে কল্পনার বর্ণালী অনুরঞ্জন নেই এতটুকু। এখানে নাইট বলেছে তার বীরত্বের কথা, জমিদার বলেছে তার প্রেমের কথা, বাথের স্ত্রী বলেছে তার পাঁচ পাঁচটি স্বামীর ব্যবহারের কথা ও বিবাহ সম্পর্কে তার স্বাধীন মন্তব্য—এমনি করে এক একজন মানুষের জীবনের কথা এক একটি কাহিনী হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের কয়েকটি সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ যে জ্ঞান লাভ করেছে সেই জ্ঞানের কথাই চসার যথাসম্ভব আত্মনিরপেক্ষ হয়ে বিশেষ সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তে ধর্মকে যত সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবেই প্রয়োগ করুন না কেন, অন্তত যখন তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেন, la sua voluntade e' nostra pace, অর্থাৎ তোমারই ইচ্ছার উপর আমাদের সকল শান্তি নির্ভর করছে, তখন তাঁর উৎকট ধর্মাসক্তি ও অকুণ্ঠ ধর্মনির্ভরতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একদিকে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অকপট স্বীকৃতিদান ও অন্যদিকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্থিতি-স্থাপকতার উপর জীবনের ভালোমন্দ সবকিছুর জন্য অকুণ্ঠ নির্ভরতা দান্তের কাব্যপ্রতিভার মধ্যে এক জটিল বৈপরীত্যের উদ্ভব করেছে। এদিক থেকে ভার্জিলের কাব্যদৃষ্টি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এক মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই তিনি অকুণ্ঠভাবে বলতে পেরেছেন :

> "Felix qui potuit rerum cognoscere causas
> Quique metus, et inexorable fatum."

সেই মানুষই প্রকৃতপক্ষে সুখী যে কার্যকারণ নিয়মকে জানতে পেরেছে এবং নির্মম নিয়তি ও সকল রকমের ভয়কে পদানত করতে পেরেছে। মানুষের এই নির্ভীক ও দুর্বার আত্মশক্তির প্রতি অকপট বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই ভার্জিলের কাব্যপ্রতিভা সমস্ত সংশয় ও বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এতখানি।

মানবজীবনের উত্থানপতনে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিবেশ-প্রভাব উভয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, একথার শেক্স্পীয়ার মূলতঃ

বিশ্বাসী হয়েও মাঝে মাঝে শিশুসুলভ এক সকরুণ অসহায়তায় ঈশ্বরের কোলে ঢলে পড়েছেন। 'কিং লীয়ার'-এ তিনি বলেছেন :

> "As flies to wanton boys, are we to to the gods ;
> They kill us for their sport."

আবার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত যুবরাজ হ্যামলেট কাতরভাবে বলে উঠেছে :

> "O God O God !
> How stale, flat, unprofitable seems to me
> All the uses of the world."

পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইওরোপীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মগত সংস্কার ও বিশ্বাসের যে একাধিপত্য চলে তা একমাত্র বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও তার ক্রমোন্নতির দ্বারাই কিছুটা প্রশমিত হয়। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে মানুষের মনের অন্ধকার দিগন্তে যে স্বাধীন চিন্তার অভ্যুদয় হয়, তার স্বচ্ছ আলো মানুষকে কিছুটা সত্যসন্ধিৎসু করে তুললেও তার মনের উপর থেকে এই ধর্মগত একাধিপত্যকে প্রশমিত করতে পারে নি বিন্দুমাত্র। পরে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচলিত ধর্মচেতনার বলিষ্ঠ দেহ থেকে ক্যাথলিক কুসংস্কারের কালো খোলসটাকে ছাড়িয়ে নূতন একটা পোশাক পরিয়ে দেয় মাত্র। প্রভূত সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই ধর্মসংস্কার চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করতে সক্ষম হয় নি। একমাত্র ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব ও টমাস হাক্সলের কার্যকারণ নিয়ম সম্পর্কে সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বহু চিন্তাশীল মানুষের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং তখন থেকে অনেকে ক্রমশ ঈশ্বরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। তাছাড়া বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত পদক্ষেপে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোসহ অন্যান্য বাস্তব অবস্থাগুলি একে একে বদলে যাওয়ার পর নূতন যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে নূতন যে সব বাস্তব অবস্থা গড়ে ওঠে, তার ফলে মানুষের প্রচলিত জীবনভঙ্গিমার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তিত জীবন-ভঙ্গিমা এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ভাবজগতে। প্রাচীনকালে মানুষ জগৎ ও জীবনের যে সব বস্তু বা ঘটনাকে এক অসহায় মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সহজভাবে গ্রহণ করত, এখন সেগুলিকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে লাগল। এই নূতন যুগসন্ধিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর যাদের আস্থা অবিচল ও

অঙ্কুর ধরে গেল তাঁরাও যুক্তিসিদ্ধ এক চেতনার স্বচ্ছ আলো দিয়ে ধর্মের স্বরূপটিকে বিচার করতে শুরু করলেন।

তাঁরা বুঝতে পারলেন, ধর্ম মানেই আগেকার সেই অন্ধ সংস্কারপ্রবণতা ও কতকগুলি অতিপ্রাকৃত উপদেবতায় বিশ্বাস নয়; ধর্মচেতনা আসলে হচ্ছে মানুষের নীতিচেতনারই পরিণত রূপ। মানুষের মনে ন্যায় অন্যায় ভালো মন্দ প্রভৃতি বিষয়ে যে সহজ ও সাধারণ নীতিবোধ আছে, ধর্মের ঈশ্বর হচ্ছেন সেই চূড়ান্ত নীতির প্রতীক। দার্শনিক কান্ট বললেন, ধর্ম হচ্ছে নীতি। ফিকটে বললেন, ধর্ম হচ্ছে জ্ঞান; এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে এমন এক বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারিত করে, যার সাহায্যে মানুষ জীবনের অনেক যৌন সমস্যার সমাধান ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে এক আত্মিক সঙ্গতি খুঁজে পায় এবং যা একান্ত-ভাবে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটায়:

"The essence of religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish object of desire."

স্বার্থান্ধ আবেগানুভূতিগুলিকে এক আদর্শ ও মহত্তম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল ধর্মের প্রকৃত কাজ। ধর্ম সম্বন্ধে এই দার্শনিক প্রত্যয় কিন্তু কোনো কাব্য বা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় নি। বরং যে সব ধর্মপন্থীদ দল ধর্মকে নীতির প্রতীক হিসেবে না দেখে সমগ্র বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত এক অনন্ত অদ্বৈত সত্যের প্রতি আত্মিক প্রবণতারূপে গণ্য করেন তাঁদের মত বিশেষভাবে প্রভাবিত করে অনেক কবিকে। এই সব কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ ও জর্মান কবি শিলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন সর্বেশ্বর-বাদী। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিশ্বাস ছিল, এক সর্বব্যাপী ঐশ্বরিক সত্তা প্রকৃতি-জগৎ ও মানুষের মনোজগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটনার অন্তস্থলে ঘূর্ণীভূত কারণ-রূপে নিহিত থেকে সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছে, যার:

"...Dwelling is in the light of the setting sun
And the round ocean and the living air,
And the blue sky and in the mind of man:
A motion and a spirit that impels

All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things."

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ও মানুষের অন্তরে বিরাজিত এই ঐশ্বরিক সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন ব্রহ্ম যিনি মানব মনের চেতনায় এক পরম আনন্দানুভূতি-রূপে প্রতিফলিত এবং যিনি "অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান" প্রতিটি বস্তুর অন্তরে তার চূড়ান্ত সত্যরূপে সমাহিত। যিনি বিশ্বসাথে যোগে বিহার করেন এবং যাঁকে স্পর্শ করা না গেলেও সকল দেহেই তিনি সহজভাবে ধরা দিয়েছেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই ধর্মগত প্রত্যয়ের প্রাণনালী থেকে রস সংগ্রহ করেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয় প্রধানত পরিপুষ্ট লাভ করেছে। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তাবোধ তাঁদের অনেক কবিতাকে মহত্বের গৌরব দান করেছে, সে আত্মীয়তাবোধ মূলত এই ধর্মচেতনার উপরই নির্ভরশীল, তা কখনোই স্বতোৎসারিত বা বিশুদ্ধ আবেগানুভূতি সঞ্জাত নয়। অনেক সময় তাঁদের ধর্মচেতনা ও জীবনচেতনা ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত হয়ে এক নীরস জ্ঞানগত কৃত্রিমতায় ঘনীভূত ও প্রকট মূর্তি ধারণ করে মূল কাব্যরসের সঙ্গে সম্মুখ বিরোধে অবতীর্ণ হয়েছে।

ক্যাজামিয়াঁর মতে কেল্টীয় ধর্মাবলম্বী ইয়েট্‌সের অতীন্দ্রিয় ধর্মপদ্ধিতা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সর্বেশ্বরবাদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তাঁর এই সর্বেশ্বরবাদ তাঁর কাব্যে কোথাও উগ্রতায় প্রকটিত হয়ে উঠতে পায়নি ; বরং তা তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাববস্তুর কাছে গোপনে আত্মসমর্পণ করে এক স্বপ্নমেদুর কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন, অজস্র প্রতীকী বস্তুর প্রান্তরালে সহজ সৌন্দর্যে অবগুণ্ঠিত। শিলার তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অনেক কথা বললেও ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা সম্পর্কে একেবারে নীরব। তাঁর মতে যে ঈশ্বর মানুষের জন্মের পূর্বেও মানুষকে ভালোবাসতেন তিনি স্বর্গ থেকে এক ঐশ্বরিক শৃংখলারূপে নেমে এসে মানুষের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ শক্তিসমূহকে সংহত ও শৃংখলাবদ্ধ করে সৃষ্টির পথে চালনা করেন।

ব্রাউনিংয়ের ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদ কিন্তু এদের সকলের থেকে পৃথক। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর মানব-জগৎ ও প্রকৃতি-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষ শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম—এই তিনটি গুণের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করতে পারে। এদের মধ্যে প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট গুণ, কারণ এই প্রেমই

মানুষের শক্তি ও জ্ঞানকে উন্নত করে। যে ঈশ্বরের ইচ্ছাচক্রে মানুষের ভাগ্য গঠিত তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদকে বিশ্বের ভালো মন্দ সব কিছুর মধ্যে নিহিত দেখেছেন ব্রাউনিং।

"All I could never be

All men ignored in me

This, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped."

ব্রাউনিংয়ের সকল শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবকল্পনা ও আদর্শ প্রেম সম্পর্কে সকল চেতনা এই উগ্র ঈশ্বরানুভূতি থেকে যে উৎসারিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ কারো থাকতে পারে না।

তিন

যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে একেবারে বিশ্বাস করেন না, দার্শনিক প্রত্যয়ের দিক থেকে তাঁদের সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—একজন বস্তুবাদী ও অপরজন নাস্তিকতাধর্মী অস্তিত্ববাদী। বস্তুবাদীদের মূল কথা হল, বস্তু-জগতের ভিতরে বা বাইরে আর কোনো সত্তা নেই। আমরা যাকে চেতনা বা আত্মা বলে থাকি তা যে সকল উপাদান নিয়ে কোনো বস্তু গঠিত, বস্তুর সেই সব উপাদানগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এদেশে চার্বাক দর্শনে এই জড়বাদী বস্তুধর্মিতার কথা সুন্দর-ভাবে উল্লিখিত আছে :

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে···" অর্থাৎ জল, মাটি, অগ্নি, বায়ু পৃথিবীর এই চারটি মৌলিক পদার্থ থেকেই চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্ত্য অষ্টাদশ শতকে যদিও ফরাসী বস্তুবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম ও ফিউডাল পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তথাপি আমার মনে হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক-মাত্র কার্ল মার্কসই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধর্মের সমস্ত অসারতা প্রমাণ করে তার প্রকৃত স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করেন। মার্কসের মতে—

"Religion is nothing but the fantastic reflection in man's mind of those external forces which control their daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatural forces."

ধর্ম হচ্ছে মানুষের মনে এমন এক অদ্ভুত মানসিক ক্রিয়া যার মধ্যে যে

সকল পারিপার্শ্বিক পার্থিব শক্তি তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, সেইসব শক্তিগুলি এক একটি অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। মার্কস বললেন, আদিমকালে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে যে অসহায়তা অনুভব করত, সেই অসহায়তাবোধ থেকেই ধর্মবিশ্বাসের প্রথম উদ্ভব হয়। আবার আজকের দিনে সমাজে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী অনুরূপ এক দুর্বলতা ও অসহায়তা অনুভব করছে এবং এই দুর্বলতা ও অসহায়তাবোধের পূর্ণ সুযোগ নিয়েই সেই পুরনো ধর্মবিশ্বাস এক দুষ্ট কীটের মতো তাদের মনের মধ্যে গোপনে পুষ্টিলাভ করে তাদের সমস্ত শক্তি ও সাহসকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে। এই ধর্মবিশ্বাস তাদের শেখাচ্ছে, যে সুযোগ ও সম্পদের অধিকার থেকে এ জীবনে তারা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত, যা তারা লাভ করতে পারছে না তাদের শক্তি দিয়ে তা তারা মৃত্যুর পর সব পাবে ঈশ্বরের অবিসংবাদিত মধ্যস্থতায়। এই-ভাবে ধর্ম তাদের এক ভ্রান্ত ও মোহপ্রসারী আশার মোহিনী মায়ার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদের সংগ্রামী শক্তিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। তাই তিনি বললেন, "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart, of the heartless world. It is the opium of the people." ধর্ম হচ্ছে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, সব চেয়ে নিষ্ঠুর জগতের মর্মবাণী, ধর্ম হচ্ছে সেই আফিম যা সেবন করে মানুষ তার সমস্ত কর্মশক্তিকে নিজের হাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

নাস্তিকতাধর্মী বা জড়বাদী অস্তিত্ববাদের মুখপাত্ররূপে জাঁ পল সার্ত্র তাঁর 'd' Exi-tentialisme est un humanisme' গ্রন্থে ঘোষণা করলেন, ঈশ্বর বলে কোনো কিছু নেই। কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বর কখনো মানুষ সৃষ্টি করেন না বা মানুষের ভাগ্য নিরূপণ করেন না। মানুষের জন্মের আগে বা মৃত্যুর পরে অথবা তার জীবনের অলক্ষ্য ঊর্ধ্বে কোনো ঐশ্বরিক সত্তা উপস্থিত থেকে তার সমগ্র অস্তিত্বকে চূড়ান্তভাবে পরিবৃত করে নি। মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে সে নিজে দায়ী এবং মানুষ যে আছে, তার এই অস্তিত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা; এই অস্তিত্বের অন্তরালে কোনো স্বরূপ বা সত্তা আছে কিনা সেটা বড় কথা নয়, কারণ "existence is prior to essence."

ঈশ্বর নেই বলেই এমন কোনো নৈতিক অনুশাসন নেই যার দ্বারা মানুষ

তার কর্মাকর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আসলে মানুষ তার সারাজীবনের সমস্ত কর্মের জন্য সে নিজে দায়ী। সার্ত্র বলেন :

"The first effect of existentialism is that it puts everyman in possession of himself as he is, and places the entire responsibility for his existence squarely upon his shoulders···Thus we have neither behind us, nor before us, in a luminous realm of values, any means of justification or excuse."

উজ্জ্বল মূল্যের এক স্বর্গজগতে এমন কোনো চূড়ান্ত সত্তা অধিষ্ঠিত নেই যাকে উদ্দেশ্য করে আমরা মহাভারতের দুর্যোধনের মতো জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে নিশ্চিন্তে বলতে পারব :

"জানামি ধর্মং ন চ প্রবৃত্তিং জানাম্যধর্মং ন চ নিবৃত্তিং
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত অবস্থার যে মহাসত্যে উপনীত হয়, সে সত্য আমাদেরি ঐচ্ছিক কর্মের একান্ত প্রতিফল ছাড়া আর কিছু নয়। অবাধ অপ্রতিরুদ্ধ স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে চারিদিকের শূন্যতাকে ভেদ করে দিনে দিনে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে আমাদের যে অস্তিত্ব এক মহাশিল্পীর মতো আমরাই তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলি, আমাদেরি কামনার কারুকার্য দিয়ে তাকে আমরা অলঙ্কৃত করি, আশা ও উদ্দেশ্যের রসে তাকে সঞ্জীবিত করি, শক্তি ও সাধনা দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জর্মান কবি রেনিয়া রিল্‌কে তাঁর 'Die Sonette an Orpheus' কবিতায় মানুষের এই অবাধ উন্মুক্ত অস্তিত্বের জয়গান গেয়ে মানবজীবনে যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যকে নিন্দিত করেছেন, কারণ তা মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ ব্যাহত করে :

"It is life, it thinks it knows best as it orders, produces and destroys with equal resolve."

কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেও মানুষের অস্তিত্বকে চারিদিকের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে অবাধ স্বাধীনতার শূন্যে সংস্থাপিত করার ফলে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের অজানিতে, সেই সমস্যার দ্বারা তাঁদের অস্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়ে পারেনি। জাঁ পল সার্ত্রের "দি এজ্ অফ্ রিজন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র অনেট নায়ক ম্যাথিওর

কাছে অস্তিত্ববাদের এই অপূর্ণতার কথাটিকে ব্যক্ত করেছে স্পষ্ট ভাষায়: "you live in a void, you have cut your bourgeois connections, you have no tie with the proletariat, you're adrift, you're an abstraction, a man who is not there···you renounced everything in order to be free. Take one step further, renounce your freedom : and everything shall rendered unto you". ম্যাথিও নিজেও পরে স্বীকার করেছে তার উদ্দেশ্যহীন এই নির্বিশেষ স্বাধীনতা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। বস্তুত সমাজ ও সামাজিক পরিবেশের সুষ্ঠু সহযোগেই আমাদের অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে সার্থকতা লাভ করতে পারে।

সাহিত্যে ধর্মচেতনার সঙ্গে জীবনচেতনার যুগান্তকারী সংঘর্ষে প্রথম শহীদ হচ্ছে এসকাইলাসের 'প্রমিথিয়াস বাউণ্ড' নাটকের নায়ক বন্দী প্রমিথিয়ুস। দেবরাজ জিয়াসের আদেশ অমান্য করে মানবজাতিকে জ্ঞানের আলো দান করে যে অপরিসীম শাস্তির বোঝা মাথা পেতে নিয়েছিল প্রমিথিয়াস, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। দূর পৃথিবীর কোনো এক নির্জন দুর্গম প্রান্তে স্কাইথিয়া পাহাড়ের একটি বিশাল প্রস্তরস্তূপের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঝড়, জল, বজ্রপাত প্রভৃতি সমস্ত বিপর্যয় নীরবে সহ্য করবে, তবু স্বর্গে গিয়ে জিয়াসের দাসত্ব করবে না। জিয়াসের চর হারমিসকে তার শেষ কথা বলে দিল প্রমিথিয়াস: "In sooth all gods I hate···I shall never exchange my fetters for slavish serrility. 'Tis better to be chained to the rock than bound to the service of Zeüs.

প্রমিথিয়াসের নির্ভীক উক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন এসকাইলাস ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন মানবতার জয়গান গেয়েছেন অন্যদিকে তেমনি মানবতা নিরপেক্ষ দেব-মহিমার অসারতাকে সপ্রমাণিত করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গ্যেটেও 'প্রমিথিয়াস' নামে একটি কবিতায় এক আশ্চর্য প্রত্যক্ষ-ভাষিতার সঙ্গে বলেছেন, যে ঈশ্বর আশাহত মানুষের অবাস্তব কল্পনায় দ্বারা সৃষ্ট এবং নির্বোধ শিশু ও ভিখারীদের অহেতুক বিশ্বাসের বলে সঞ্জীবিত, তিনি জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কখনই সে ঈশ্বরের শরণাগত হবেন না।

"I sit here, make men in my image, a race which shall be like me to suffer, to weep, to enjoy and be glad and to ignore you as I did."

ঈশ্বরের কাছে না গিয়ে তিনি এই জগতে থেকেই তাঁর আদর্শ দিয়ে এমন সব মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর মতো হাসি কান্না ও সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসবে এবং তাঁর মতোই ঈশ্বরকে অস্বীকার করবে।

চার

অনেকে মনে করতে পারেন, যে সব সাহিত্য ধর্ম বা ঈশ্বরকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাও ধর্মের দ্বারা নঞর্থক (Negative) দিক থেকে প্রভাবিত। তাঁদের মতে সাহিত্যে ধর্মসম্বন্ধীয় কোনো কথাই থাকবে না। কিন্তু যাঁরা ধর্মের কোনো কথাই একেবারে অবতারণা না করে সাহিত্য রচনা করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁরা একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের অনেকে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বহিরঙ্গগুলিকে যথাযথ চিত্রিত করতে গিয়ে তাদের সমস্ত প্রতিভাকে এমনভাবে নিঃশেষিত করে ফেলেছেন যে অন্তর-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। আবার অনেকের প্রতিভা অতি তীক্ষ্ণ এক আত্মসচেতনতা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবৃত্তি আবেগানুভূতিকে বিশ্লেষণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্তাঁদালের 'স্কারলেট এণ্ড দি ব্ল্যাক' ও এমিল জোলার 'জার্মিনাল' ছাড়া এমন জীবনধর্মী ও বাস্তবানুগ সাহিত্য খুব কমই পাওয়া যায় যেখানে লেখক দুই দিক থেকেই কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। বস্তু-জগৎ ও মনোজগৎ—এই দুই-এর সুষ্ঠু সামঞ্জস্যসাধনের উপরই মানব-জীবনের ভারসাম্য নির্ভর করে। সুতরাং যাঁরা বাস্তবানুগ জীবনধর্মিতাকে আজ সাহিত্যে অবিসম্বাদিত আদর্শ বলে মেনে নিতে সম্মত তাঁরা নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করবেন না যে, জীবনের বাহির ও ভিতর, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুটিকেই সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পরিস্ফুটিত করার যে সমান্তরালবর্তিতা, তাই হবে মহৎ সাহিত্যের সৌধ রচনার পক্ষে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ ভিত্তি।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা ধর্মকে একেবারে উহ্য বা অনুপস্থিত না রেখে বা ধর্মকে অস্বীকার করবার কোনো চেষ্টা না করে সমাজ ও জীবনকে চিত্রিত করতে গিয়ে সমসাময়িক জীবনের খাতিরেই বাধ্য হয়ে ধর্মকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। যে সব জীবন ও সমাজের কথা সাহিত্য বলতে চায় সেই সব জীবন ও সমাজের সঙ্গে ধর্ম যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে থাকে তাহলে সাহিত্যে ধর্মের এই অবাঞ্ছিত অথচ বৈধ অভ্যাগমকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী'র মধ্যে দেখা যায়, পর পর দুবার চার্চ থেকে বিশপ ডেকে ধর্মীয় আচার আচরণের দ্বারা মৃতপ্রায় এম্মা বোভারীকে সারিয়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে তৎকালীন একটি কুসংস্কারপ্রসূত সামাজিক রীতিই প্রতিফলিত হয়েছে এবং শেষের দিকে মুমূর্ষু এম্মার পাশে বিশপ ও কেমিষ্ট হোমের মধ্যে ধর্মগত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে বিতর্কটিকে লেখক বিশেষ আত্মনিরপেক্ষভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসে বিপ্লব মন্ত্রের মূর্ত প্রতীক পাভলভের মা শোষিত ও ক্ষুধিত জনগণকে মুক্তির বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ও খ্রীষ্টের বাণী (God's truth, Christ's truth) শুনিয়েছেন। এখানেও লেখক আত্মনিরপেক্ষভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তখনকার দিনে ঐ সব মানুষের মধ্যে জীবনসত্যের সঙ্গে ধর্মের সত্যকে একাত্ম করে দেখবার একটা বিশেষ প্রবণতা ছিল। 'রেজারেকশান্' উপন্যাসে টলস্টয় কিন্তু সচেতনভাবে তাঁর আত্মগত খ্রীষ্টীয় ধর্মচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। পাপের অন্ধকার ও দুঃসহ গ্লানির বোঝা ঠেলে শুচিশুভ্র চৈতন্যের নির্মল আলোকের মধ্যে কিভাবে মানবাত্মা নবজন্ম লাভ করে, তা পরিব্যক্ত করবার জন্য 'রেজারেকশান' নামকরণটিকে বেছে নিয়েছেন লেখক। এখানে একটি নৈতিক ভাবসত্য ধর্মীয় নামকরণের মধ্যে অতি সহজেই দ্যোতিত হতে পেরেছে। শেষের দিকে 'নিউ টেষ্টামেন্টের কতকগুলি নীতি-উপদেশ সংযোজিত করে কাহিনীকে যেভাবে অহেতুক অবিমৃশ্য ধর্মচেতনার দ্বারা কণ্টকিত ও খ্রীষ্টীয় ক্ষমাগুণ প্রচারের দ্বারা উৎপীড়িত করেছেন তাতে উপন্যাসের সার্বজনীন রসস্রোত ব্যাহত না হয়ে পারেনি; তাতে 'রেজারেকশান্' মহৎ উপন্যাসের গৌরব থেকে বঞ্চিত না হয়ে পারেনি। সহসা ধর্মচেতনার দ্বারা তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বলে গেছেন টলস্টয়:

"Five years ago faith came to me; I believed in the doctrine of Jesus, all my life suddenly changed. I ceased to desire that which previously I desired, and on the other hand I took to desiring what I had never desired before. That which formerly used to appear good in my eyes appeard evil, that which used to appear evil appeared good."

পরিবর্তনশীল সমাজের পটভূমিকায় প্রচলিত ধর্মচেতনার সঙ্গে নবলব্ধ-জীবনচেতনার সংঘর্ষের ফলে যে সংশয়ের ও যুগযন্ত্রণার সৃষ্টি হয় ডস্টয়েভস্কি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তাকে রূপায়িত করলেও বহুক্ষেত্রে তিনি জীবন ছেড়ে ধর্মের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। 'দি কারামাজোভ ব্রাদারস'-এ আইভান কারামাজোভের মতো তাঁর কোনো কোনো নাস্তিক চরিত্র ধর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেও অমিত্রি কারামাজোভের মতো যারা ধর্মবিশ্বাসী, এবং অপরাধী ও স্বভাবত পাপাত্মা হলেও যাদের অপরাধপ্রবণতা খ্রীষ্টীয় পাপ-চৈতন্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ, সেই সব চরিত্রের উপর তিনি তাঁর সমস্ত সহানুভূতি নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন :

"Unless you sin, you will not repent : unless you repent you shall not be saved."

খ্রীষ্টের অনুকরণে অমিত্রির এই নীতি-উপদেশ লেখকেরই উপদেশ। কিন্তু অসংখ্য অন্যায় করেও সকল মানুষ কেন অনুতাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে সাধু হয় না, ঈশ্বর মঙ্গলময় হওয়া সত্ত্বেও কেন মানুষ মানুষের হাতে শোষিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হচ্ছে প্রতিদিন, অথবা ক্ষমার দ্বারা সমস্ত অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার হয় কিনা—এইসব মৌল প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে যেতে পারেননি ডস্টয়েভস্কি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "I am till now a child of the times, a child of disbelief and doubt, and I know I shall remain such till the grave."

কিন্তু যদিও নিজেকে সংশয় ও অবিশ্বাসে ক্ষতবিক্ষত যুগমানসের সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছিলেন, তথাপি তাঁর সাহিত্য এই সাক্ষ্য দান করে যে, তিনি সমস্ত সংশয়ের কুয়াশা সরিয়ে ধর্মের মধ্যেই তাঁর আকাংক্ষিত সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বাস্তববাদী প্রসিদ্ধ রুশশিল্পী রেপিন ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন,"Dostoyevsky is a great talent in art, a profound thinker and a warm heart, but he is a broken and down-cast man, one who is afraid to tackle the vital problems of human life and looks backwards the whole time."

তাঁর শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্যই মানুষের অমিত প্রাণশক্তির প্রবল বেগটিকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে ধর্মের মোহ মেদুর আশ্রয়ে অসহায়ভাবে ঢলে পড়েছিলেন ডস্টয়েভস্কি। তিনি কখনই একথা বিশ্বাস করে যেতে পারেননি, মানুষই একদিন এইসব অত্যাচার অবিচারের

অবসান ঘটিয়ে স্বর্ণযুগ নিয়ে আনবে পৃথিবীতে। তিনি শুধু বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর মঙ্গলময়। "Thou art just Lord, for thy ways are revealed." এ্যালোশা কারামাজোভের মুখে বাইবেলের এই কথাটি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর মনের গভীরতম বিশ্বাসের কথাটিকেই বলে গেছেন ডস্টয়েভস্কি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরও সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূলে অনুরূপ এক ধর্মচেতনার অন্তঃসলিলা অবাধে বয়ে চলেছিল। তিনিও অন্তরে বাইরে ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করতেন সব সময়।

"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥"

তোমার কল্যাণতম যে রূপ, আমার কাছে আজ তা দীপ্যমান প্রত্যক্ষ। যে পুরুষ সমগ্র বিশ্ব চরাচরে বিরাজিত, আমার মধ্যেও সেই পুরুষ অভিন্নভাবে বিদ্যমান। ঈশোপনিষদের এই বাণীতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ যাঁর অধিকাংশ কাব্যপ্রেরণার একমাত্র উৎসস্থল ছিল সর্বব্যাপী এক অখণ্ড ঐশ্বরিকসত্তা এবং যাঁর একমাত্র মনের কথা হল, "শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক"। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে কতকগুলি ঘটনার রূঢ় আঘাতে তাঁর ধর্ম-নির্ভর কাব্যসত্তায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় সহসা। তখন তিনি বুঝতে পারেন, জীবনে শুধু শান্তিই সত্য নয়, শুধু অবিমিশ্র ভালো দিয়েই এ জগৎ গঠিত নয়; ভালো, মন্দ, ললিত-কঠোর, বিরোধ-বিষমতা সব কিছুর দ্বৈত অস্তিত্বের অসম সংমিশ্রণেই এই জগৎ ও জীবন গঠিত। তখন ঈশ্বরের ক্ষমাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে মনে, সত্যতার ভয়াবহ সংকটে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর উগ্র ধর্মচেতনাকে পরিহার করে চলতে পারেননি কখনো রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ব্রহ্মবাদের উপর অবিচল আস্থার বিচ্যুতি ঘটেনি কখনো এতটুকু। তথাপি তার 'রূপনারানের কূলে' নামক ছোট কবিতাটি তাঁর সাময়িক সত্যোপলব্ধির এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

"রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম।"

উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসী কবি র‍্যাঁবোও সাম্রাজ্য, শোষণ, রক্তপাত

ও অত্যাচার সমন্বিত মানবসভ্যতায় ঘনীভূত সংকটে ক্ষুব্ধ হয়ে সব কিছুর ধ্বংস প্রার্থনা করেন এবং মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে ধর্মের শোচনীয় অক্ষমতা ও ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে নিতান্ত সঙ্গতভাবেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর 'Les Premieres Communious' কবিতার প্রথমেই তিনি বলেছেন, "Really it is idiotic, these village churches where fifteen ugly brats, dirtying pillars and pronouncing divine prattle with thick burt, listen to a black grotesque with sweaty shoes."

কোনো সাহিত্যে লেখকের আত্মসাক্ষিক ধর্মপ্রীতি বা ধর্মনির্ভরতা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ যে সাহিত্যে কোনো অদৃশ্য ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত সত্তাকে মানব জীবনের নিয়ামক ও প্রযোজক কর্তারূপে উপস্থাপিত করা হয়, প্রাকৃত বস্তু বা ঘটনাকে প্রাকৃত কারণ দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয় না, সে সাহিত্যের পরিণতি পাঠকের মনে বিষাদাত্মক বা হর্ষাত্মক কোনো বিশুদ্ধ রস বা আবেগানুভূতির সঞ্চার করতে পারে না। মানুষ যখন জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও কালকে ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য ও অপরিহার্য বিধান বলে মেনে নেয় তখন স্বভাবতই সে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির উপর কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশা আরোপ করে না। তখন মানুষ এক সহজ উদাসীনতায় ও ভক্তি-স্রাবী ভাবালুতায় জীবনের সব কিছুকে গ্রহণ করে নেয়। তাই দেখা যায়, ধর্মনির্ভর সাহিত্য মানুষের মনে একমাত্র যে রসের সৃষ্টি করতে পারে তা ভক্তিরস বা শান্ত রস। সাহিত্যে এই দুটি রসই নিকৃষ্ট, তাই এদের কোনো সম্মানযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট নেই সেখানে। চারদিকের সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন ঘটনার সহিত জীবনের দৈনন্দিন সংঘাতের ফলে ভাবগত প্রতিক্রিয়ারূপে অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে যে রসক্ষরণ হয় সেই রসই সাহিত্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ রস। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে যে সত্য মানুষ উপলব্ধি করে অন্তরে, সেই সত্যই হচ্ছে সাহিত্যের সত্য। জীবন কখনো আঘাত সহ্য করে, কখনো সে আঘাত দেয়, কখনো সে সক্রিয়, কখনো নিষ্ক্রিয়, কখনো সে অন্যায় করে, কখনো সে অন্যায়ের প্রতিকার করে—এমনি করে সুখ ও দুঃখ, বিরোধ ও বিষমতার বিচিত্র তরঙ্গ তুলে জীবনের যে দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি, সকল যুগের সাহিত্যে সেই অগ্রগতিকেই অনুভব করতে চায় মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে। জীবন ও তার সমস্ত জৈবিকতা থেকে উৎসারিত যে সহজ চেতনাপ্রবাহ মানুষের প্রতিটি স্নায়ু ও শিরায় সতত প্রবাহিত, সেই চেতনার কথা না বলে যখন কোনো সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে প্রথমে কোনো ধর্মতত্ত্ব বা দর্শনতত্ত্বকে আপ্তবাক্যরূপে গ্রহণ করে ক্রমে তার থেকে জীবন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পান, তখন তিনি একই সঙ্গে জীবন ধর্ম ও শিল্প ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন।

পারমাণবিক বাস্তবতা

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

১৯৫১ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের আমেরিকান 'কলিয়ার্স' পত্রিকাখানা পাশে রয়েছে। এতে জে. বি. প্রিস্টলে-র একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক যুদ্ধে সোভিয়েত দেশ জয় করেছে এবং সেখানে "শিল্পকলার" মুক্তি" এসেছে।
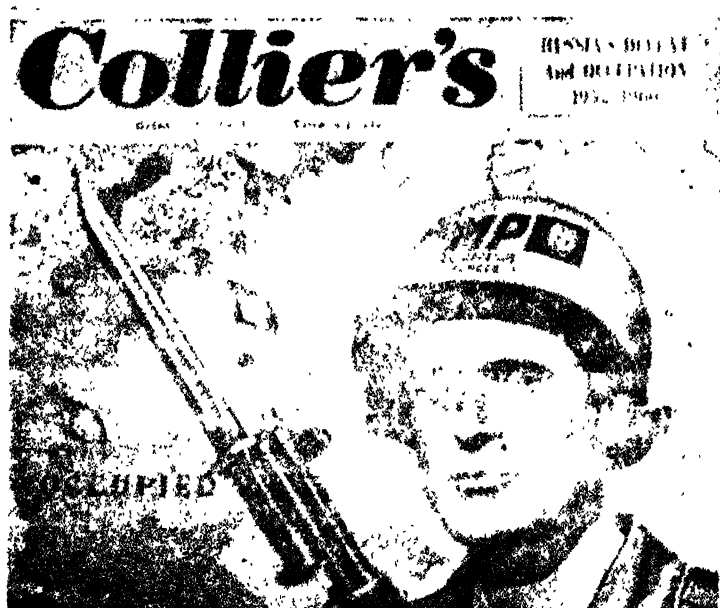
প্রিস্টলে মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এখন শান্তি আন্দোলনে।

মস্কোয় মার্কিন অ্যাটমবোমা বর্ষণের 'ফোটো' শোভিত মার্কিন এম. পি-র (মিলিটারি পুলিশ) বুটের তলায় "অধিকৃত" সোভিয়েত দেশের মানচিত্রের প্রচ্ছদপটে সজ্জিত সেই যে 'কলিয়ার্স' পত্রিকায় "তৃতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রিম দৃশ্য" তুলে ধরে ১৯৬০ সাল নাগাদ সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়েছিল, সে পত্রিকাখানা উঠে গেছে। কিন্তু

"১৯৬১ সালের কর্মসূচী সংক্রান্ত বিবৃতিতে" ইউ-এস এয়ারফোর্স অ্যাসোসিয়েশন "সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার...জাতীয় লক্ষ্য" ঘোষণা করেছেন, সেই পরিকল্পনা রয়েছে। সেই অ্যাসোসিয়েশনটি মার্কিন বিমানবাহিনীরই বেসরকারী মুখপত্র, তা কারও অজানা নয়। সে-মুখপত্রের সুবিদিত পৃষ্ঠপোষক হলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মারণাস্ত্র শিল্পের শিরোমণিগণ। তাতে ঘোষিত "জাতীয় লক্ষ্য" অনুযায়ী সামরিক প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ কৌশলগুলি নিয়ন্তর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কদের অসংখ্য উক্তিতে—সেই যে পরিকল্পনাটিকে "পৃথিবীর উপর মৃত্যু পরোয়ানাস্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর দলিল" বলে ধিক্কার দিয়েছেন, বিভীষিকায় শিউরে উঠেছেন বৃটিশ দার্শনিক—আজ শান্তি-সৈনিক—বার্ট্রাণ্ড রাসেল। সেই রাসেল ১৯৪৮ সালে "নিবর্তনমূলক" যুদ্ধের জন্যে; মস্কোয় অ্যাটম-বোমা বর্ষণের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কেন?

১৯৫৯ সালে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে এই 'কেন'র জবাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "তখন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল শুধু এক পক্ষে, তাই সম্ভাবনা ছিল রুশেরা নতি স্বীকার করবে" (বারুচ পরিকল্পনায়—যাতে পশ্চিমী সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ 'আন্তর্জাতিক' নিয়ন্ত্রণের নামে বোমার উপর এবং পৃথিবীর সমস্ত পারমাণবিক কাঁচামালের উপর একচেটিয়া দখল থাকত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রেরই হাতে)।

প্রশ্ন: "ধরুন যদি তারা নতি স্বীকার না করত...তাহলে আপনি ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করতে বলতেন রুশদের উপর—ঐ অস্ত্রের বিভীষিকা সম্বন্ধে আপনি আমার সঙ্গে কথায় যে শব্দগুলি ব্যবহার করলেন তা সত্ত্বেও?"

তার জবাবে রাসেল বলেন: "হ্যাঁ, তাই...তখন ভেবেছিলাম, এবং আশা করেছিলাম রুশরা নতি স্বীকার করবে, কিন্তু হুমকি তো দেওয়া চলে না যদি না সেটা কার্যে পরিণত করার জন্যে প্রস্তুত থাকা যায়।"

জে. বি. প্রিস্টলে তো নিশ্চয়ই নিজের ধারণা অনুযায়ী মানবিক শিল্পকলারই "মুক্তি" সাধনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর অ্যাটমবোমা-বর্ষণের দাবি জানাচ্ছিলেন! আবার এখনও মানবিকতারই প্রেরণায় পারমাণবিক শান্তি চাওয়া হচ্ছিল। এই "দুই মানবিকতা"র মধ্যে একটা প্রভেদও নিশ্চয়ই রয়েছে। ইতিমধ্যে এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন যা ঘটেছে তা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন নতি স্বীকার করেনি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল

মত বদলেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে "নিবর্তন-মূলক" পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনাটাকে দানবীয় কিংবা "পৃথিবীর উপর মৃত্যুপরোয়ানাস্বরূপ" মনে করছিলেন না, কারণ, তখন তাঁর "আশা ছিল" অপর পক্ষের আত্মরক্ষা করবার, আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত হানবার ক্ষমতা ছিল না।

পারমাণবিক কর্মনীতি কোন্‌টা কখন কেন মানবিক কিংবা দানবীয় গণ্য হচ্ছে?

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতির 'বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটি'র সভাপতি জেরোম্‌. বি. ভাইস্‌নার-এর মতো ব্যক্তির হিসাবও দেখা যেতে পারে। তাঁর মূল ন্যায়-নীতিজ্ঞান, চিন্তা-ভাবনার গতিবিধি কোন্‌ দিকে চলে, তা বলা বাহুল্য : ("দেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্যে যারা অনেকে গত পনর বছর যাবত কঠোরভাবে কাজ করেছেন তাঁদের থেকে খুব একটা পৃথক নয় আমার অভিজ্ঞতা")। সেই ভাইস্‌নার বলেছেন : "আমাদের প্রত্যেকটি অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েতকে অগ্রসর হতে দেখেছি, ফলে, কাল-গতিতে একমাত্র লক্ষণীয় ফল হয়েছে এই যে, আমাদের উভয় জাতিই ক্রমে অধিকতর ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন এমন সব অস্ত্রশস্ত্র সৃষ্টি করেছে যার বিরুদ্ধে কোনো আত্মরক্ষাব্যবস্থা হয় না" ('আর্মস কন্ট্রোল অ্যাণ্ড ডিসআর্মামেন্ট' : আমেরিকান ভিউজ অ্যাণ্ড স্টাডিজ। ডি. জি. ব্রেনান সম্পাদিত। জোনাথান কেপ)।

ভাইস্‌নারই বলেছেন : "যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি দেখা যাচ্ছে যে, ত্বরান্বিত বেগে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা চলতে দেওয়া হলে এক-একটি বছর কাটবে আর আমাদের দেশের নিরাপত্তা হবে আরও কম, বেশি নয়।"

এ উপলব্ধি কি ঘটত যদি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক একচ্ছত্রা-ধিপত্য না ভাঙত? রাসেলই তো বলেছেন, "পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল শুধু এক পক্ষে···তাই আশা ছিল···!"

কিন্তু এখন অপর পক্ষ হয়তো পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করেছে। পার-মাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব আজ যে রকেটের উপর নির্ভরশীল তার আয়তন আর নির্ভুলতার শ্রেষ্ঠত্ব তো তর্কাতীতই হয়ে গেছে। সেই অপর পক্ষ সর্বতোভাবেই অন্তত সমতা লাভ করেছে, তা নিয়ে তো কথাই নেই। নইলে কি ভাইস্‌-

নায়কের ও "ওয়াকিবহাল মহলে" ঐ উপলব্ধি ঘটত? রাসেল মত বদলাতেন? প্রিস্টলে শিল্প-কলার মুক্তি-সাধনের লড়াইয়ে অ্যাটমবোমার হাতিয়ার ত্যাগ করতেন?

পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নাগাসাকি হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত 'পরীক্ষা' দেখিয়েও কম আহ্বান জানানো হয়নি নতি স্বীকার করবার জন্যে!

জাতিসংঘের 'রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা কমিশন'-এর সুপারিশ অনুসারে ১৯৪৬ সালের ২৪এ জানুয়ারি তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 'পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশন' বসাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল; সেই বছরই মার্চ মাসে আমেরিকার ফুলটন-এ গিয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হিটলারের "পবিত্র আর্যজাতি" স্থলে "ইংরেজী ভাষাভাষী জাতগুলিরই" পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার একমাত্র অধিকার ঘোষণা করে, কমুনিস্টবিরোধী জেহাদ ঘোষণা করে বললেন, তাঁরা যাকে বলেন "স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের মহান নীতি" তার পক্ষে যে কোনো বাধা এলে পৃথিবীর সর্বনাশ হবে—চার্চিলদের অ্যাটমবোমার ঘায়ে পৃথিবীটা ফিরে যাবে প্রস্তরযুগের বর্বরতার মধ্যে। সেই বছরই জুন মাসে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বারুচ পরিকল্পনা মারফত সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সমস্ত দেশের পারমাণবিক শক্তির মূল কাঁচামাল (ইউরেনিয়ম ইত্যাদি) মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত সংস্থার হাতে দেবার প্রস্তাবে অ্যাটমবোমা বিনষ্ট করবার কাজ অনির্দিষ্ট এবং অসম্ভব করে রেখে সেই প্রস্তাবের পিঠেপিঠেই বিকিনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মার্কিন পারমাণবিক যুদ্ধের মহলা দেখানো হল—তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন নতি স্বীকার করল না। হিরোশিমা-নাগাসাকি বিস্ফোরণে 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' বিকট ঘোষণার পর প্রস্তরযুগীয় বর্বরতা বর্ষণের চার্চিলী দম্ভোক্তি দিয়ে বিকিনির বিকট গর্জন তুলে বারুচ পরিকল্পনারূপী 'চরমপত্র' দিয়েও পারমাণবিক-অস্ত্রবিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতি স্বীকার করানো গেল না।

তখনকার রাসেল এবং প্রিস্টলেরা যে-মানবতার জিগির তুলে, আর শিল্পকলার যে-মুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন তা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারমাণবিক শক্তি আয়ত্ত করা থেকেও নিরস্ত করা গেল না, বরং সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শক্তি-দৈত্যটাকে বোমায় পুরে হিরোশিমা নাগাসাকি আর বিকিনির দানবদের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে প্রহরাও

বসাল, তেমনি সর্বপ্রথম তারাই সে দৈত্যটাকে বশ মানিয়ে, লাগিয়ে দিল মানুষের সেবায়: সেই হল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বা শান্তির কর্মনীতির সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির সেই পরম-কল্যাণরূপ মিলে পৃথিবীতে শান্তির কামনা বৃহত্তম গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করল। ট্রুম্যানেরা আর চার্চিলেরা, তখনকার রাসেলেরা আর প্রিস্টলেরা মানবতা এবং মুক্তির নামে যে দানবীয় পৈশাচিকতার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে, সমগ্র পৃথিবীকে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে 'চরমপত্র' দিচ্ছিলেন, তা প্রত্যাখ্যান করবার হিম্মত পৃথিবীতে এসেছিল এইভাবেই।

রাসেলেরা আর প্রিস্টলেরা সেদিন যদি অপপ্রচারের আঘাতে আঘাতে, "প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের" ঝড় তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত্র করে নিরস্ত্র রাখতে পারতেন তাহলে ট্রুম্যান-চার্চিলদের মনস্কামনা পূর্ণ হত— সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শ্মশানে পরিণত হত, সোভিয়েত ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত পৃথিবী থেকে।

এবং সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জাতীয় লক্ষ্য গ্রহণ করে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পেন্টাগনের মুখপত্রগুলি ও মুখপাত্রদের আজ এত কঠিন অবস্থায় পড়তে হত না, সেদিনকার রাসেলদের আর প্রিস্টলেদের অ্যাটমবোমার মানবিকতা, সংস্কৃতির অভিযান যদি সফল হত।

তা সফল হয় নি। তাই ইতিমধ্যে নতুন নতুন '১৯৪৮-এর রাসেল' আর নতুন নতুন '১৯৫১-র প্রিস্টলে'র বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম জার্মানিতে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে পৃথিবীর চিরশত্রু জার্মান সমরবাদ আর নাৎসী যুদ্ধবাজটিকে। পশ্চিম জার্মান সশস্ত্র শক্তির মোট ১৮০জন জেনারেল আর অ্যাডমিরালের প্রত্যেককেই হিটলারের জেনারেল আর অ্যাডমিরালদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই জেনারেলরাই অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার প্রধান প্রধান পদে। সেই জেনারেলদেরই একজন—হেউসিঙ্গার—এখন ওয়াশিংটনে ঐ সামরিক চুক্তি সংস্থার স্থায়ী সামরিক (পরিকল্পনা রচয়িতা) কমিটির চেয়ারম্যান। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রকেট অস্ত্রশস্ত্র এবং অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই নাৎসী যুদ্ধবাজের হাতে—যারা জার্মানির "১৯৩৭ সালের সীমান্ত অনুযায়ী রাইখের উত্তরাধিকারী" হিসাবে নিজেদের জাহির করছে দম্ভভরে, যারা

হিটলারের পরাজয়ের প্রতিশোধ প্রকাশ্যেই দাবি করছে, যাদের সীমান্ত-পরিবর্তন প্রভৃতি আর প্রতিহিংসা কামনা দেখে আজ সেই রাসেলেরা এবং প্রিস্টলেরাও সন্তুষ্ট।

হিটলারেরই সেই যুদ্ধযন্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেও নিশ্চেষ্ট থাকতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে—যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ একই দানবের আক্রমণে সৈন্যক্ষয়ই হয়েছিল মার্কিন বৃটিশ যুক্ত অঙ্কের বারো গুণ বেশি, নিযুত-নিযুত নরনারী আর শিশু হয়েছিল অপহৃত, নির্যাতিত এবং গণহত্যার শিকার; যে-সোভিয়েত ইউনিয়নে বোধহয় একটি পরিবার নেই যার প্রিয়জন নিহত হয় নি ঐ দানবদের হাতে। সেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত্র, আপেক্ষিক-নিরস্ত্র থাকতে আহ্বান জানাতে পারে কে? সে জেনে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, সেই ১৯৪৮-এর রাসেল আর ১৯৫১-র প্রিস্টলের অ্যাটমবোমার মানবতা আর অ্যাটমবোমার সাংস্কৃতিক মুক্তিরই সেবাইত।

পশ্চিম জার্মানিতে পুনরুজ্জীবিত নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রটাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধেরই সর্বনাশ ঠাসা রয়েছে। সেই একই হেউসিঙ্গার আর স্পাইডেলরা তার আস্ফালন করছে। মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী যুদ্ধকামীরাই এই পুনরুজ্জীবনদাতা। কাইজারের আমল থেকে চার-পুরুষের মৃত্যু-ব্যবসায়ী ক্রুপ্‌স্ এবং হিটলারের যুদ্ধযন্ত্রের সমস্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি সেখানে পুনরুজ্জীবিত এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঐ একই মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী আনুকূল্যে। তা তো রোধ করা সম্ভব হয় নি। এটাই বাস্তবতা।

শুধু তাই নয়। তার পেছনে এবং নেতৃত্বে রয়েছে আরও বড় যুদ্ধযন্ত্র—পেন্টাগন, যার ফাশিস্ট প্রকৃতি দ্রুত বাড়তে দেখে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের 'পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটি'র সভাপতি ম্যান্সফীল্ডের মতো ব্যক্তিকেও প্রকাশ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হয়েছে। সেই পেন্টাগনের উদ্যোগে মার্কিন সরকারী কর্তৃপক্ষ কি ভাবে পারমাণবিক মহাযুদ্ধ অনিবার্য করে তুলবার মনোবিকার সৃষ্টি করছে সমগ্র দেশে, তা নিজের চোখে দেখে বিবরণ লিখে পাঠিয়েছেন লণ্ডনের 'নিউ স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক কিংস্‌লে মার্টিন, যাঁকে "কমিউনিস্ট ঘেঁষা" নাম দিতে খোদেরও আটকাবে। সে-দেশে

'কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান', 'জন বার্চ সোসাইটি', 'আমেরিকান ফাসিস্ট পার্টি' প্রভৃতি মিলে সরকারী কর্মনীতি দিয়ে তৈরি জমিনে যে-ব্যাপক ফাসিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা দেখে মার্কিন "মুক্ত গণতন্ত্রের" বহু প্রচারককেও আজ পশ্চিমে, এ দেশে, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতি তো রোধ করা যায় না। এটাই পৃথিবীর বাস্তবতা।

তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদে ঠাসা এই বাস্তবতা। আজ তৃতীয় মহাযুদ্ধ মানে যে-মৃত্যু তা কোটির অঙ্কে প্রকাশ করতে হলেও ক-কুড়ি কোটি, সেই পদ্ধতির শরণ নিতে হয়। পেন্টাগন আর নাৎসী যুদ্ধবাজ মিলে মানুষের সভ্যতার কেন্দ্রগুলিকে, আশা-আকাঙ্ক্ষার বনিয়াদগুলিকে, স্বপ্নের সূত্রগুলিকে, জীবনের অঙ্কুর অবধি এই যে পারমাণবিক ভস্মস্তূপে পরিণত করতে চাইছে—সেই ধ্বংসস্তূপের উপর অবশিষ্ট প্রাণ আর প্রাণীদেরও পুরুষানুক্রমিক পারমাণবিক মৃত্যুধারা সঞ্চারিত করে দিতে চাইছে, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর চেষ্টা কি আর হয়েছে কখনও কিংবা হতে পারে?

এই নিদারুণ সর্বনাশকে নিয়তির মতো ভবার বলে মেনে নিতে হবে? এই নিদারুণ বাস্তবতাকে ঝুঁটি ধরে টান মেরে বদলে দেবার যে কোনো উপায় অবলম্বন করা হবে না? পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আবেদনে, দাবিতে, ক্রোধে দানবকে নিরস্ত করা যায় নি। সে পৃথিবী থেকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত অস্ত্রকে বিদায় করতে দেবে না কিছুতেই। সে তার হাইড্রোজেন-বোমারু বিমানবহর সর্বক্ষণ উড়িয়ে রেখে, ঐ মৃত্যুদর্শী শকুনীর ঝাঁকটার পরিচালক মন্ত্রীটিকে গর্তে লুকিয়ে রেখে সেখান থেকে পৃথিবীকে আক্রমণ করতে চাইছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ দিয়ে। সে-দানবটাকে তো অন্য কোনো উপায়ে নিরস্ত করা যায় নি। তার বিকারগ্রস্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করার কোনো উপায় থাকলে তো তা প্রয়োগ করা চাই-ই। পৃথিবীর উপর তৃতীয় মহাযুদ্ধের আক্রমণ চালাতে গেলে গভীরতম বিবরেও মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের সোনার তাল আর তাদের শিরোমণিদের জীবন রক্ষা পাবে না, তাদের মাথায় এই উপলব্ধিটা সবলে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ নেই। সর্বমানবের শুভেচ্ছায় তো ফল হয় নি। এই তো সেদিনও ঐ-দানব জাতিসংঘের দরবারে দাঁড়িয়ে, জাতিসংঘেরই ঘোষিত অনুজ্ঞা উপেক্ষা করে বলেছে, "না, হাইড্রোজেনবোমা প্রয়োগ করার অধিকার আর দায়-দায়িত্ব" ছাড়ব না। জাতিসংঘেরই অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে বলেছে, "না, আফ্রিকায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ

করতে থাকব, আফ্রিকা থেকে পারমাণবিক যুদ্ধ ঘাঁটি অপসারিত করব না।"

সেই দানবের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, গভীরতম বিবরে প্রবেশ করেও সে পৃথিবীতে সর্বনাশ ছড়িয়ে দেবার পর নিস্তার পাবে না, একমাত্র তবেই তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হতে পারে। একমাত্র তবেই সে বুঝবে যে—আমেরিকার চার, আট, কিংবা ষোল কোটি মানুষকে বলি দিয়েও সে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়ে কোথাও গিয়ে নিস্তার পাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ কিংবা আরও কিছু বেশি পরিমাণ মেগাটন মাত্রার বিস্ফোরণ তার মাথায় সেই উপলব্ধিটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তাতে পৃথিবীর কয়েক কুড়ি কোটি মানুষের জীবন বাঁচবে, কিন্তু "তার ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয়তা এত সামান্য যে বৃটিশ বিজ্ঞানী মহলগুলিও মনে করছেন যে, এ বুঝি সেই নিউট্রন বোমা" (স্টেট্‌সম্যান) এবং বৃটিশ সরকার প্রথম দফায় অনেক আতঙ্কের অপপ্রচার চালাবার পর তাঁদের সরকারী বিজ্ঞানীরাও বলেছেন যে, সোভিয়েত পঞ্চাশ মেগাটন পরীক্ষার পর দুধে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের পরিমাণ কমে গেল! সোভিয়েত সরকার যে যুদ্ধবিকারগ্রস্তদের উত্তপ্ত মাথাকে একটু শীতল করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে—প্রস্তাবিত জার্মান শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে কেনেডি আর আদেনাউয়ার আর ম্যাকমিলান আর অগলদের সরকারগুলির উগ্রতম যুদ্ধ-প্রস্তুতির মুখে—ঘন ঘন প্রকাশ্য পারমাণবিক আক্রমণ চমকির পর বাধ্য হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আবার আরম্ভ করবার সিদ্ধান্তের সঙ্গেই বলেছিলেন, তেজস্ক্রিয় কণাপাত যাতে সর্বনিম্ন মাত্রায় হয়, সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে, তার সত্যতা এবং কার্যকারিতা তো বৃটিশ সরকারী বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতিতে (এবং আমাদের দেশে অধ্যাপক সত্যেন বসুর মতো বিজ্ঞানীর বিবৃতিতে) প্রমাণিত হল।

পেন্টাগন আর পশ্চিম জার্মান যুদ্ধবাজ অতর্কিত আক্রমণের যে হিসাব কষছিল তাতে অন্তত কিছু গোলমাল বেধে যাবার প্রমাণ আছে। "সীমাবদ্ধ" পারমাণবিক আক্রমণ চালিয়ে বার্লিন সমস্যা "সমাধানের" পথ নির্দেশ করা হচ্ছিল 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল'-এর মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান পত্রিকায়, কিন্তু তা ছাড়াই পশ্চিমীদের আলাপ-আলোচনায় বসবার দিকে ঝোঁকটাই বরং ইতিমধ্যে বেড়েছে। কত মেগাটনের কটা আঘাত অতর্কিতে হানলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টা আঘাত হেনেও আর এঁটে উঠতে পারবে

না বলে যে-মার্কিন হিসাব চলছিল সেটা পঞ্চাশ এবং আরও বেশি মেগাটন বোমার অস্তিত্বের ফলেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে অনেকেই মনে করতে আরম্ভ করেছেন যে, বড় বিপদ কোন্‌টা—সোভিয়েত পারমাণবিক পরীক্ষার বিতর্কমূলক তেজস্ক্রিয়তা, না, মার্কিন-পশ্চিম জার্মান অতর্কিত আক্রমণ দিয়ে বাধানো তৃতীয় মহাযুদ্ধে কয়েক কুড়ি কোটি মানুষের মৃত্যু !

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরারম্ভের সোভিয়েত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার (৩০শে আগস্ট) অনেক আগে থেকেই সারা পৃথিবীর জানা ছিল যে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো মুহূর্তে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করবে। বহু সরকারী বিবৃতিতেও তার আভাস এবং পেন্টাগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহল থেকে প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সবারই জানা ছিল। তবু শত সতর্কতা সত্ত্বেও সেটুকু তেজস্ক্রিয়তা উদ্ভূত হতে পারে তার অনিষ্টকারিতা জেনেও, বহু সৎ শুভেচ্ছাপ্রণোদিত নরনারীও ভুল বুঝে বিক্ষুব্ধ হতে পারেন তা বুঝেও ('মার্কিন পরীক্ষা' অচিরেই আরম্ভ হত, তখন সেই "সুযোগে" সোভিয়েত 'পরীক্ষা' পুনরারম্ভ করতে কারও ভুল বোঝাবুঝিরও যুক্তি থাকত না) সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অগ্রণী হয়ে 'পরীক্ষা' আরম্ভ করলেন—সেটা অকারণে নয়। অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কার শত পরিস্থিতিগত প্রমাণ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্যও ছিল: আমেরিকান এয়ারফোর্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনা, পশ্চিম জার্মানিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমক্রেটিক এবং ফ্রী ডেমক্রেটিক পার্টির নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠনের আগে দুই পার্টির মধ্যে গোপন রফার প্রকাশিত ব্যবস্থাবলী ইত্যাদি। তৃতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর পারমাণবিক সর্বনাশের আশঙ্কায় আমাদের দেশের সরকারী নেতারাও যেসব কথা বলে থাকেন, তা তো শুধু কথার কথা নয়। এবং সে আশঙ্কা থাকলে সোভিয়েত দেশের মানুষের, তাদের সরকারের কতখানি সতর্ক এবং সক্রিয় হওয়া কর্তব্য তা কি তাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভীষণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় না ?

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার বাস্তব সামরিক প্রয়োজনই ছিল, সেটা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেনেডি এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের বিবৃতিতেও স্বীকৃত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, এখন তাঁদেরও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করবার "প্রয়োজন হতে পারে।" আগে তাঁরা বলছিলেন, সোভিয়েত 'পরীক্ষার' কোনো সামরিক

প্রয়োজন ছিল না—ওটা নাকি শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য, যদিও যারা আক্রমণেচ্ছু তারা ছাড়া আর কারও আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

পশ্চিমীরা এবং তাঁদের সমর্থকেরা বলেছিলেন, সোভিয়েত 'পরীক্ষা'র ফলে সর্বনাশ হয়ে গেল, তবু এখন তাঁরা সেই 'পরীক্ষা'ই চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন! এমনকি বলছেন, "পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ চালিয়ে যাব।" তাতে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন না, কি বিপদ দেখছেন না, তাঁরা এর আগে যা করছিলেন সেটা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার আশঙ্কায়, না শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করবার কোনো বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে? বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে তার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা স্থাপন করার যে-প্রস্তাব করা হয়েছিল কেনেডি-ম্যাকমিলান যুক্ত বিবৃতিতে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ঠিক সেই প্রস্তাবেরই ভিত্তিতে 'পরীক্ষা' নিষিদ্ধ করবার সোভিয়েত পরিকল্পনাটিকে মার্কিন-বৃটিশ পক্ষ গত ২৭শে নভেম্বর জেনেভায় প্রত্যাখ্যান করলেন—সেটা কি তাঁদের 'পরীক্ষা'র বিরোধী মনোভাবের পরিচয়? সোভিয়েত 'পরীক্ষা'র বিরুদ্ধে তাঁরা যত প্রচার চালাচ্ছিলেন, সেটাকে তাঁরা নিজেরাই তো অপপ্রচারের ভস্মরাশি বলে প্রতিপন্ন করে দিলেন। কিন্তু সেই অপপ্রচারেরই ভস্মরাশি উড়িয়ে উড়িয়ে আমাদের দেশকেও 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' বিষের আবহাওয়ায় দূষিত করে তুলবার কি ব্যর্থ সমারোহই না দেখা গেল!

সাম্প্রতিক সাহিত্য

সিভিলিয়নের আত্মকথা

প্রদ্যোৎ গুহ

প্রাচ্যবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠির মধ্যে জন বিম্‌সের নাম হয়তো অপরিচিত নয়। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে।

গ্রীক, লাতিন, জর্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষা ছাড়াও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় বিম্‌স্ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিন খণ্ডে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ (১৮৭২-৭৯) রচনা করেছিলেন। তাঁর বাংলাভাষার ব্যাকরণ (১৮৯১) ১৯২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত আই. সি. এস. শিক্ষানবীশদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। বিম্‌স্ তুর্কী ভাষা থেকে বাবরের স্মৃতিকথার ইংরেজি তরজমা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভূগোল (অসমাপ্ত) রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এসব তথ্য হয়তো অনেকের জানা ছিল কিন্তু বিম্‌স্ যে একটি আত্মচরিত রচনা করে গিয়েছিলেন এবং তা যে পূর্ব-ভারত সম্পর্কে একটি তথ্যের স্বর্ণখনিবিশেষ তা হয়তো অনেকেই জানতেন না।

বিম্‌স্ তাঁর আত্মচরিত লিখতে শুরু করেন ১৮৭৫ সালে কিন্তু কাজের চাপে লেখা এগোয় মন্দ-মন্থর গতিতে এবং শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৩ সালে অবসর গ্রহণের পর পুনরায় তিনি লেখার কাজে হাত দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা শেষ করে যেতে পারেন নি। ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিম্‌স্ তাঁর আত্মচরিত প্রকাশের জন্য লেখেন নি, লিখেছিলেন প্রধানত নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য যাতে তাঁর "উত্তরপুরুষেরা জানতে পারে তাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে দিনযাত্রা নির্বাহ করত।" বিম্‌সের পাণ্ডুলিপি তাই এতকাল পারিবারিক দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেই চাপা পড়েছিল।

সম্প্রতি ফিলিপ মেসন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে প্রাক্তন সিভিলিয়ানদের চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদির খোঁজখবর করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান পান এবং পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান। মেসন তাঁর বইয়ে পাণ্ডুলিপিটি থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রধানত মেসনের এই আবিষ্কারের ফলেই বিমসের মৃত্যুর ৫৯ বৎসর পরে তাঁর সেই অসমাপ্ত আত্মচরিত 'জনৈক বেঙ্গল সিভিলিয়নের স্মৃতিকথা' নামে বিলেত থেকে এই বছর প্রকাশিত হয়েছে।

বিমস্ ছিলেন কোম্পানি-নিযুক্ত সিভিলিয়নদের শেষ দলের অন্যতম। কার্যব্যপদেশে তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে, পরে ওড়িশা এবং সর্বশেষে বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ বৎসরকাল কাটিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার হিসাবে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিলেত ফিরে যান। মধ্যে কিছুকাল তিনি 'বোর্ড অব রেভিনিউ'তেও কাজ করেছেন।

বিমস 'প্রাসাদপুরী' কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন ১৮৫৮ সালের ১০ই মার্চ। তখনও তথাকথিত 'মিউটিনি'র হাঙ্গামা সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নি। রানী ভিক্টোরিয়া সম্রাজ্ঞী পদে বৃত হয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন নি। তখনও ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব চলছে।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিতের ভূমিকায় লিখেছেন, "যে ভারতবর্ষে আমি আমার জীবনের এত বড় একটা অংশ কাটিয়ে এসেছি আজ তা একটা বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তখন জীবনযাত্রার যে অবস্থা ছিল, যে সব প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল তার অনেক কিছুই আজ আর নেই। আমার জীবনের যে অংশ ভারতে অতিবাহিত হয়েছে তার বিবরণ সেই অধুনা বিলুপ্ত অবস্থার বিবরণ হিসাবেই হয়তো কাজে আসবে।"

বিমস্ সত্যিকথাই লিখেছেন। তিনি যে সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা ছিল একটা পর্বান্তের যুগ। 'মিউটিনি' পরবর্তীকালে, ১৮৫৮—৫৯ সালে, ভারতবর্ষ শুধু যে তার নামমাত্র সার্বভৌমত্ব হারিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল তাই নয়, তখন একশ বছরের কোম্পানির শাসনেরও অবসান হয়েছিল। কোম্পানির আমল ছিল বৃটিশের রাজ্যবিস্তারের কাল। 'মিউটিনি'-পরবর্তীকালে যে যুগের সূচনা হল তাকে বলা যেতে পারে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনের যুগ। সেই যুগে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা কিভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করল, শাসন এবং বিচারব্যবস্থা কিরকম ছিল,

দেশের অবস্থা কি ছিল, সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত বিশেষ করে পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িশা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় তার একটা প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায় বিমসের আত্মচরিতে।

বিমস্ কার্যব্যাপদেশে যখনই কোনো নতুন অঞ্চলে গেছেন আত্মকাহিনীতে তার বিবরণ দিতে গিয়ে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার ধরন, ভূমিব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেকালে রাজপুরুষরা এবং সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গ-সমাজ কিভাবে দিন কাটাত তারও একটা তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় বিমসের স্মৃতিকথায়। ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিমসের আত্মচরিতের গুরুত্ব এই কারণেই।

ভারতবর্ষে বিমসের কর্মজীবনের শেষ পনেরো বছর কেটেছে বাংলাদেশে। তার মধ্যে মাত্র এক বছরের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই এক বছর তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে। বাকী চোদ্দ বছর তিনি কাটিয়েছেন চুঁচুড়া, বর্ধমান, ভাগলপুর ও কলকাতায়। আত্মকাহিনীর এই অধ্যায় বিমস্ লিখে যেতে পারেন নি—এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ আফসোসের কথা। এই সময় বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গদের ইলবার্ট বিলবিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়েছিল। এডুকেশন কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করছিল। বিমস্ কমিশনে সরকারের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তার বিবরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাছাড়া, এই অধ্যায় লিখিত হলে পাঠক নিশ্চয়ই সেকালের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেত।

বিমসের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের হলেও তাঁর কলম ছিল সাহিত্যিকের। তাঁর আত্মকাহিনী তাই উপন্যাসের মতো থেমে থেমে পড়তে হয়। নীলকরদের অনাচারের কাহিনী আমাদের অজানা নয়, কিন্তু বিমস্ যখন তাদের ছবি আঁকেন তা যেন ইতিহাসের পাতা থেকে কায়া পরিগ্রহ করে উঠে আসে। সেকালের অযৌক্তিক লবণ আইনের বিরুদ্ধে বিমস্ যে সংগ্রাম করেছিলেন, যার ফলে এই আইনের কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল তার বিবরণও গল্পের মতো পড়া যায়। কিভাবে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করা হত এই প্রসঙ্গে বিমস্ তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। উদয়গিরির বৌদ্ধ (জৈন ?) ধ্বংসাবশেষ বিমস্ আবিষ্কার করেছিলেন। তারও মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এই

স্মৃতিকথায়। আর এই সব তথ্যের মাঝে মাঝে বিমল্ কালি-কলমে নানা মানুষের এমন সব জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কলকাতা-সমাজের প্রজাপতি-স্বভাবা লুলু, কিংবা 'প্রাচীন নাবিক' অ্যালফ্রেড বণ্ড কিংবা পরোপকারী শ্রীমতী হাওয়েকে ভোলা অসম্ভব।

গ্রন্থ-পরিচিতিতে ফিলিপ যেমন ঠিকই লিখেছেন, লেখার ক্ষমতা বিমলের প্রায় নির্দিষ্ট। তাঁর মন স্বচ্ছ, কী বলবেন তিনি তা ভাল করেই জানেন এবং নির্দিধায় তা বলেন। ট্রলপের মতো তিনি দ্রুত লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, থেমে থেমে 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বা কলমের পেছন কামড়ে কামড়ে' তাঁকে লিখতে হত না।

তাঁর ইংরেজি সহজ সরল, মোটেই ভিক্টোরীয় যুগের মতো কটমট নয়। কার্লাইল রাস্কিনের যুগের লেখক হলেও তাঁর ভাষা সুইফট, ডিফোর মতোই সরল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন।

Memoirs of a Bengal Civilian : John Beames. Chatto & Windus, London. 30 Sh.

পুস্তক পরিচয়

ইলিশমারির চর ॥ আবদুল জব্বার। ইউনিভার্সাল বুক ডিপো। পাঁচ টাকা ॥

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় বাংলাসাহিত্যের কৌলিন্যের সার্থক উত্তরসূরী আবদুল জব্বার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইলিশমারির চর' সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। বইটি পশ্চিম বাংলার মৎস্য-জীবীদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রল শব্দলিপি।

উপন্যাসটি নদীমাতৃক। জয়নদ্দি-হরেন-কানাই-কাশেম ও তাদের প্রাত্য-দিনের জগতের শক্তিশালী পরিপ্রেক্ষিতই হল নদী। মূল চরিত্র জয়নদ্দি পুরুষানুক্রমে মৎস্যজীবী তাই তার জীবনসংগ্রামে নদীর ভূমিকা অবধারিত ও অনস্বীকার্য। গ্রামীন সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে মহাজন ভবনদির বলি হয় ধর্মপ্রাণ, সহজবিশ্বাসী মৎস্যজীবীরা। জয়নদ্দি, হরেন ও কানাইয়ের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের মূল্যে কামড় বসায় ভবনদি। সহস্রবাহুতে শোষণ করে।

ভবনদির শোষণের ভয়াবহ রূপ চঞ্চল করে জয়নদ্দিকে। সে মহাজন তারিণীর কাছে নৌকা জমা নেয়, ভবনদির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারপর গ্রামে দেখা দেয় অন্য এক চেতনা। তারিণীর শিক্ষিত ছেলে রতন, তার বন্ধু আনোয়ার, মেয়ে রোহিণীর সঙ্গে আসে শিক্ষা ও শ্রেণীচেতনার ঢেউ। প্রচলিত জীবনস্রোতে বাধা পড়ে। অন্ধ আবিলতা, তাড়ির নেশা ও ধুঁকে ধুঁকে নিজেদের নিঃশেষ করার দিন শেষ হয়ে দেখা দেয় জীবনের মূল্য নির্ণয়ের নতুন ক্ষণ। মাঝে মাঝে মামলাবাজ ভবনদির অসুস্থ উন্মত্ততা প্রকট হয়। গ্রামে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় অন্তরতর চেতনার জোয়ার আসে। কার্তিকের শেষ। একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রযাত্রার দিন আসে। জয়নদ্দি-হরেন-কাশেমরা পাঁচপীরের নাম করে নৌকা ছাড়ে বদর

বদর। আর চোখের জল মুছতে মুছতে যে যার বাড়ি চলে যায় সিন্ধু, শাকিনা, কাশেমের মা, জয়নদ্দির মা।

একটার পর একটা দিন এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। ইতিমধ্যে লোভী তরবদির অনুচরেরা একদিন গভীর রাতে হানা দেয় সিন্ধুর ঘরে। সন্তানসম্ভবা সিন্ধুর আর্তনাদ তাদের জান্তব পিপাসাকে আরও প্রকট করে, প্রাণহীন সিন্ধুর দেহটাকে খালের ধারে পুঁতে রাখে। তরবদির এই চক্রান্ত ধরা পড়ে যখন সমুদ্র থেকে ফিরে আসে জয়নদ্দির দল। প্রতিশোধের জ্বালায় পাগল সাজে হবেন। তারপর একদিন পাগলামির ভান করে খুন করে হবেন তরবদিকে। মহাজন তরিণীর ব্যবস্থায় ছাড়া পায় হবেন।

পরদিন ভোর না হতেই শাকিনা ডেকে তোলে জয়নদ্দিকে। এতদিনের পরিশ্রমে ছোটখাটো মহাজন হয়েছে সে। মায়ের পায়ে সালাম করে তারা বেরিয়ে পড়ে নদীতে।

জয়নদ্দি নৌকোয় উঠে দাঁড়ায়। আশ্চর্য হয়ে দেখে ইলিশমারির চরের সবুজ গাছপালার মাথার ওপর দূরে পূর্বদিগন্তে রক্তিম আলোর বন্যা ভাসিয়ে দিয়ে উঠেছে নতুন দিনের সূর্য। এক দার্শনিক ভাবনায় ভরে ওঠে তার প্রাণমন।

এই হল কাহিনী। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে লেখকের মুন্সীয়ানাকে বার বার অভিনন্দন জানাতে হয়। মূল চরিত্র জয়নদ্দি, স্ত্রী শাকিনা, যৌবনমুখর সিন্ধু, মহাজন তরবদি, রতন, রোহিণী প্রভৃতি চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি পাঠককে কাহিনীর দিগন্তে পৌঁছে দেয়। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রকট হলেও ইলিশমারির চরের মৎস্যজীবীদের জীবন বর্ণনায় এর প্রয়োজন ছিল মনে হয়।

শিল্পী খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ চিত্রটি সুন্দর।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

চর্যাপদের হরিণী ॥ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। তিন টাকা ॥

শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পকে ইতোমধ্যেই গতানুগতিক কথা-সাহিত্যধারা থেকে পৃথক করে তোলার সাধনায় বিশিষ্ট। তিনি ইদানিং নানা বিতর্কের কেন্দ্রবর্তীদের অন্যতম কতকটা এই কারণেই। বর্তমান

গল্পগ্রন্থের শেষ গল্পটি সেই বিতর্কাবর্তের মূল কেন্দ্রের একটি বলে খ্যাতি ও বহুল পরিমাণে অখ্যাতি দুইই অর্জন করেছে। আমরা গল্পগ্রন্থের সমস্ত গল্পগুলির পটভূমিকায় নাম-গল্পটির আলোচনা করব। গল্পগ্রন্থটির মধ্যে গল্পকার দীপেন্দ্রনাথের একটি বিবর্তন লক্ষণীয়। জাসানের লেখক ধীরে ধীরে খাম নরকের প্রহরী এবং চর্যাপদের হরিণী লিখছেন। কয়েকটি পৃথিবী এসব গল্পের আগে লেখা। একটা কথা এরই সঙ্গে মনে হবে, সেটা হল কয়েকটি পৃথিবী এবং চর্যাপদের হরিণীই এই গ্রন্থের মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী গল্প। তার মধ্যে কয়েকটি পৃথিবী এই গ্রন্থের দুর্বলতম রচনা। তথাপি এ কথা ঠিক নয় যে কয়েকটি পৃথিবী গল্পে বাস্তবকে অধ্যয়নের প্রকরণগত দুর্বলতাকে অনুধাবন করেই লেখক চর্যাপদের হরিণীর নিরীক্ষামূলকতার দিকে ঝুঁকেছেন। এ ঝোঁক বা প্রবণতার উৎস অন্যত্র।

এই ঝোঁক সার্থক কি অসার্থক সে আলোচনার পূর্বে, দীপেন্দ্রনাথের বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে একটি কথা—তাঁর গল্পগুলির প্রসঙ্গেই—আলোচিত হওয়া দরকার। জাসানের মতো আবহাওয়া-পরিবেশ প্রবল গল্পে দীপেন্দ্রনাথের শক্তির সম্ভাবনার বিকাশে আমরা নিশ্চয় চমৎকৃত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা তখনো অমোচিত যে বাস্তবতা বলতে বিশিষ্টভাবে তিনি কী বুঝছেন? যখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু সাহিত্যে পরিবেশ অঙ্কনে নানা শিল্পের পরিচয় দিচ্ছেন, তখন জাসানের মতো গল্পে দীপেন্দ্রনাথের নিজস্ব সাফল্য অবশ্যই প্রশংস্য—বিশেষ যখন দেখা যায় যে একই সময়ে অমৃত-এ এবং নতুন সাহিত্য শারদীয় সংখ্যায় সমরেশবাবুর গঙ্গা ও দীপেনবাবুর জাসান প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়—এই সাফল্য সত্ত্বেও তিনি চর্যাপদের হরিণীর মতো বিতর্ক সৃষ্টিকারী গল্প লিখেছেন। সাফল্যের স্বর্ণসড়ক পরিত্যাগ করে এই কণ্টক-সাধনার মূলে নিশ্চয় নিছক খেয়াল-খুশি নয়। সে কারণের মূল সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে জাসান ছাড়া বাকি সব গল্পেই লেখক যা ধরতে চেয়েছেন তা হল মানুষের বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। একমাত্র জাসানেরই বিষয়বস্তু ছিল মানুষের জীবন-জীবিকার সমগ্রতাকে দেখবার মেঘ দৃষ্টি রোদের ঝলকে দারুণ। খাম, নরকের প্রহরী এবং চর্যাপদের হরিণীর বিষয় হল সে ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ভগ্নাংশ-স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনতা। কাটামুণ্ডুর চোখের জলে শরৎ প্রভাতে খাণ্ডত জীবনের বেদনা। বিষ্টুচরণের শেষ স্বপ্নের দর্পণের মিথ্যা প্রতিফলনে তার জীবনের ভাঙাচোরা রূপের ছায়া। সুধা এবং ভাস্কর নাটকীয় বক্তৃতার মধ্যেও

তাই—জীবনের ভগ্নাংশে বিক্ষিপ্ততার আভাস। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাঁদের গল্পে জীবন-জীবিকার সমগ্রতাকে সার্থকভাবে ধারণ করেও, জীবনের বিক্ষিপ্ততার যন্ত্রণাকেই বাস্তবাধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে তাঁর মনে হল কেন? এ প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর অবশ্য শিল্পীর কাছেই লভ্য। কিন্তু শিল্প-গ্রাহীদের নিজেদের কাছেও এ উত্তর হয়তো একেবারে দুর্লভ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত মানসে নানা ব্যর্থতার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি ভগ্নাংশেই ছিল ভাঙনের স্বাক্ষর। জীবনের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এই কয়েক বছরে কী আকার ধারণ করেছে, কী পরিমাণে বেড়ে উঠেছে রাশি রাশি আত্মপ্রবঞ্চনার নিদর্শন, তার জন্য পৃথক আড়ম্বর না করে দুটি সম্প্রতি প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। এ বছরের শারদীয় সংখ্যা নতুন সাহিত্যে রণজিৎ দাশগুপ্তের কলিকাতা মহানগরীর সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের কয়েকটি দিক,—প্রবন্ধটি প্রথম মন্তব্য প্রসঙ্গে, এবং উক্ত সংখ্যা চতুষ্কোণে অশোক রুদ্রের মার্কসবাদীর আত্মজিজ্ঞাসা প্রবন্ধটি দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রচুর আলোকসম্পাতী প্রবন্ধ। তথ্যে পরিসংখ্যানে এবং ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ দুটি আজকের জীবনের নাগরিক ব্যর্থতার স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে কথা মার্কসবাদীদের অধিকতর প্রণিধানযোগ্য সেটা হল এই—শ্রমিক আন্দোলন এখনো মধ্যবিত্ত নেতৃত্বাশ্রয়ী বলেই এখনো আন্দোলনের কোনো প্রবল জাহ্নবীধারা গড়ে ওঠেনি। বামপন্থী লেখকমানসে এদিক থেকে কোনো সম্বল নেই। যা আছে তা ইতঃস্তত কয়েকটি অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের স্মৃতিমাত্র। এর প্রেরণা বেশিদূর নয়। তার থেকে অনেক বেশি প্রবলাকারে সচেতন শিল্পীমানসে অনুভূত হয়েছে জীবনের ভগ্নাংশিক বিক্ষিপ্ততা যার প্রামাণিক স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে ধৃত। কাটামুণ্ড-চেহারায় জীবনের যথার্থ বাস্তব অধ্যয়ন সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে নরকের প্রহরীর লেখক পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত সঙ্কটের চেহারা আঁকিতে গিয়ে চর্যাপদের হরিণী লেখেন। যে ভাঙা আয়নায় ভূতো মুখ দেখত এবং ক্রুদ্ধ হত, সুধাময়ের স্বগত অবগাহনে সেই ভাঙা দর্পণেরই অন্তার্থ। তাই সুধাময়েরও মনে পড়ে যায় অনিবার্যভাবে কাটামুণ্ডের প্রতীক। শুধু অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ তাড়নায় ভূতো যেখানে অক্ষমতায় স্পষ্ট—সুধাময় সেখানে নিজেই সেই ভাঙা দর্পণটা বলে গল্পের বস্তুতা পরিস্ফুট হয়েছে। দর্পণ এবং প্রতিবিম্ব উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ এই বোধ নিয়ে দীপেনবাবু অগ্রসর হয়েছেন বিমূঢ়, বেপথু, বহ

ইতিমেন্টির কাটাকুটিতে জটিল বাস্তবের সমগ্রতাকে রূপায়িত করার জন্ত। সুধাময় উকিলবুদ্ধি কি কফিবুদ্ধি (ভাসান) নয়। কলকাতার প্রতিদিনও জমজমাট বেদনা নয়। বরঞ্চ চতুর্দিকবর্তী মন্থর ক্লান্তিতে সুধাময়েরাও এখানে অকিঞ্চিৎকর। তাই সময়-সচেতন সুধাময়দের চিন্তায় নিজেকেই ব্যক্ত করার প্রবণতা। এই ব্যক্তির দৌলতেই গল্পটিতে যা কিছু চমৎকার হয়েছে। নতুবা গল্পটি একটি বিশেষ দুর্বলতার দুর্ভোগ বহন করছে। সে দুর্বলতা হল বস্তু-সম্পর্ক-শূন্যতা। দীপেনবাবুই পরবর্তী কয়েকটি গল্পের সার্থকতার মূলে দৃঢ় বস্তুভিত্তি। জটায়ু, যযাতির সন্তান তার প্রমাণ। এই বস্তুভিত্তিকতার গুণেই সেখানে গাল্পিক সার্থকতা নূতন আস্বাদ বিতরণে সক্ষম হয়েছে। চর্যাপদের হরিণী গল্পের চূড়ান্ত দৌর্বল্য এইখানে যে সুধাময় চিন্তার সাহায্যে যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা বাস্তব-ভূমির দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এই ত্রুটির জন্যই যে প্রতীক নির্বাচিত করা হয়েছে তা গল্পের প্রসঙ্গ-প্রকরণের প্রয়োজনে স্বভাবজ নয়। বরঞ্চ মনে হয় আরোপিত। চর্যাপদের হরিণ-হরিণী লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ প্রতীক না হওয়ায় লেখক নিজেই প্রতীক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গল্পের সাবলীলতার ধারাতেও ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। অবশ্য এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়—এই গল্পটির তাৎপর্য গল্পটির নিজস্ব ব্যর্থতাতেও হারায় না। এবং এই একটি গল্পের সার্থকতায় ও ব্যর্থতায় নব নিরীক্ষার সার্থকতা অসার্থকতার কিছু সমাধানও হয় না।

গল্প গ্রন্থটির সার্থকতম গল্প ভাসান এবং নরকের প্রহরী। মানুষের যন্ত্রণাকে দীপেনবাবু মানুষ হিসাবেই অনুধাবন করতে চান। এখানে তিনি কোনো ব্যাখ্যাসূত্রের ধার ধারেন না। গভীর পর্যবেক্ষণ ও শান্ত সহানুভূতির আলোকে তিনি যখন মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনের পাতাগুলি একে একে খুলতে থাকেন তখন তাঁর শক্তির বিশিষ্টতা স্বতঃস্বীকার্য। একটা মেলায় ছুটো সার্কাসের কতকগুলি মানুষকে নিয়ে তিনি যে গল্প (নরকের প্রহরীতে) গড়ে তুলেছেন তা শুধুমাত্র গরীব মানুষের দুর্দশার গল্প নয়—তার ব্যঞ্জনায় অজানিতে সজ্জিত হয়েছে আধুনিক জীবনের রূপক। ফেনিলোচ্ছল মুহূর্ত-সর্বস্ব জীবনের বিকার, কাটামুণ্ডুর খণ্ডিত জীবনের যন্ত্রণাকে দেখেও চিনতে পারে না—সে বাবা বলে উপহাস করে। এখানে বেদনার চূড়ান্বিত মুহূর্ত সৃজনে তিনি সিদ্ধকাম। কিন্তু এই সিদ্ধিতেই তিনি থেমে থাকেন নি। এবং এইখানে বলা যেতে পারে দীপেন-বাবুর লেখক-সততা। তিনি যেমন ভাসানের সাফল্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েননি,

তার পরে ঘাম লিখেছেন, যেমনি নরকের প্রহরীর সাফল্যেও আবিষ্ট না হয়ে তিনি বাস্তবকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করার ব্যাপারে অনলস থেকেছেন। লিখেছেন চর্যাপদের হরিণী। যে নির্বস্তুকতার জন্য গল্পটি ব্যর্থ হয়েছে সেই শূন্যতা পূরণের জন্য তিনি প্রয়াসশীল—সে নিদর্শনও অবিদ্যমান নয়। বাস্তবকে নানা দিক থেকে একজন লেখক ধরবার চেষ্টা করেন। যখন তিনি শক্ত মুঠোয় তাকে ধরতে পারেন তখন তাঁর প্রসঙ্গ প্রকরণ সবই সার্থক। দীপেনবাবু নিজের সাফল্য এবং ব্যর্থতা থেকেই সে শিক্ষা গ্রহণ করছেন ও করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নায়কত্ব বাংলাদেশে যে বিরল সংখ্যক মনস্বীর জীবনে, কর্মে যুক্তি এবং মননশীলতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব করেছিল, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরও মধ্যে বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্য অর্জনের মূলে ছিল তাঁর চরিত্র। সমাজতত্ত্বের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বশে ও মার্কসবাদের অধ্যবসায়ী ছাত্ররূপে ধূর্জটিপ্রসাদ 'সবুজপত্র'গোষ্ঠীর মধ্যেও স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত ছিলেন। সেই একই কারণে পরবর্তীকালে 'পরিচয়' পত্রিকার আসরেও তিনি ছিলেন স্তম্ভবিশেষ। সুধীন দত্তের সম্পাদনাভার ত্যাগের পরও 'পরিচয়' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রীতি, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

তাঁর বিশাল ও কর্মময় জীবনের অধিকাংশই কেটেছে উত্তর প্রদেশে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির অধ্যাপক রূপে। অধ্যাপনাসূত্রে ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ আর ঘনিষ্ঠ। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্য প্রায় প্রবাদে পরিণত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ছাত্র-ফেডারেশনের সম্মেলনে ধূর্জটিপ্রসাদের বিখ্যাত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতার পরিচয় আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কর্মব্যপদেশে তাঁকে কয়েকবারই বাইরে যেতে হয়েছে। জেনেভায় আন্তর্জাতিক সমাজ-তান্ত্রিক এ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন, মস্কোয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কংগ্রেস, প্যারিসে ইউনেস্কো সেমিনার, বান্দুং সম্মেলন প্রভৃতি বিবিধ আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তাঁকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। হল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত বৈদগ্ধ্য ও যথার্থ রসগ্রাহীর মূর্ত রূপ। সংস্কার এবং ভাবালুতার বিরুদ্ধে যুক্তি আর মননের শাণিত অস্ত্র প্রয়োগে চিরদিনই তিনি

অকুণ্ঠ ছিলেন। বাংলাদেশের ভাবরাজ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনায় তাঁর অবদান সামান্য নয়। উদার প্রগতিশীল একটি জীবনদর্শনের আলোয় জগৎ ও জীবনকে দেখার বাসনায় বহুবারই তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। আবার তথাকথিত সহজ-সরল-জনপ্রিয় প্রগতিশীলতার চোরাবালিতে পা দিতেও তাঁর অনীহা ছিল। তাই কল্লোলযুগের বহু ঢক্কানিনাদিত 'বস্তী-সাহিত্যে'র মারাত্মক কতকগুলি ভানকে তিনিই নির্মম সমালোচনা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সময় ও পরিবেশগত প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই কৌতূহল বজায় রেখে যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ের সাধনায় মূলত তিনি বিকাশশীল মানবসভ্যতার পক্ষেই তাঁর সমর্থন ঘোষণা করে গেছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একত্রে একটি গ্রন্থ রচনা করে ধূর্জটিপ্রসাদকে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বহুপূর্বে রচিত নিবন্ধাবলী আজও মৌলিক, আজও পথনির্দেশক। 'টেগোর : এ স্টাডি' পুস্তিকাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্যতম আকর-গ্রন্থ। তাছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহুবিধ প্রবন্ধাবলী বিষয়ের গুরুত্বে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনায়, স্টাইলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের গৌরব বিশেষ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত প্রমুখ অনেকানেক মনস্বীর সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদও প্রবন্ধকার হিসেবে, তাঁর বিশেষ কালগত ভূমিকার জন্য আমাদের দেশের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী।

এমনই আর-এক কীর্তি তাঁর 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত'-'মোহনা' উপন্যাসত্রয়ী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিতীয় যে কথাসাহিত্যিক সেদিন বাংলাসাহিত্যে স্বীকার করেছিলেন, তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ। সেই প্রবল শরৎচন্দ্রীয় তথা কল্লোলীয় ভাবালুতার দিনে উপন্যাসের নতুন সংজ্ঞা উপলব্ধিতে ধূর্জটিপ্রসাদই বাংলাদেশকে বাধ্য করেছেন। বিষয়ে, বিন্যাসে, ভাষা ব্যবহারে, সমস্যার উপস্থাপনায়, এক কথায় উপন্যাস রচনায় উদ্দেশ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—আজও তা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত-ক্ষীণ এবং অবজ্ঞাত হলেও রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের হাতে যে নতুন কথাসাহিত্যের আন্দোলন জন্মগ্রহণ করল—তা পরবর্তীকালেও নানা বিচিত্র

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকাশমান। উপন্যাসত্রয়ীর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাই ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের অশেষ ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন।

সম্বর্ধনা

বীর এসেছিলেন, ইউরি গাগারিন। কলকাতা প্রস্তুত ছিল। আর ময়দানের সমাবেশে প্রত্যক্ষ করলাম মাটির সঙ্গে মহাকাশের যোগ। মহাজাতি সদনে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির প্রীতি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সত্যেন বসু বললেন "রূপ আর মানুষ" এক হয়ে গেছে।

এক হয়ে যাচ্ছে। দেশ আর দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের দুর্জয় পাদস্পর্শ নিছক কল্পনা থাকছে না। অতীতের রূপকথা ভবিষ্যতের বাস্তবতার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। ইউরি গাগারিন সভ্যতার অমোঘ বিজয়বার্তা এবং বিশ্বমানবসংস্কৃতির বাণী দেশে দেশান্তরে বহন করে বেড়াচ্ছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির মানপত্রে বলা হয়েছে "আজ পৃথিবীর একদল পরাভববাদী হাহাকার করছেন, বিশ্বের ধ্বংস আসন্ন—মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমগ্র মানবতা অনিবার্য বিনাশের পথে অগ্রসর। কিন্তু আপনার স্বদেশবাসী বৈজ্ঞানিকদের কল্পনাতীত সাফল্যে আপনি এবং আপনার মিত্র মেজর গেরম্যান তিতভের সার্থক মহাশূন্যবিজয়ে এ আশংকা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম মহাকাশযাত্রীরূপে সমগ্র প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করবার গৌরবে এই সত্যই আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মানবতা আজ আত্ম-ধ্বংস চায় না—সূর্যসূর্যান্তে গ্রহেগ্রহে বিপুলতম আত্মবিস্তার ও বিকাশের পথে সে অগ্রসর। ৎসিওলকোভস্কির গাণিতিক দিব্যদৃষ্টি আজ বিশ্বমানবের প্রত্যক্ষ সত্য। এই নূতন ইতিহাস রচনার পথে প্রথম পদচিহ্ন আপনিই অংকিত করেছেন। মানুষের চিরলালিত স্বপ্ন ও সাধনা রূপায়িত হয়েছে⋯।"

নাট্যপ্রসঙ্গ

২৭শে নভেম্বর গেরোসিম লেবেদফ দিবস উপলক্ষে লিটল্‌ থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা মঞ্চে এক সময়োপযোগী আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশে

নবনাট্য আন্দোলন নতুন চলচ্চিত্রের আন্দোলনের মতোই ক্রমশ এক ঘটনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে জীবনবিমুখতা, ঐতিহ্যহীনতা ও আঙ্গিক সর্বস্বতার অভিযোগ এরই মধ্যে উঠেছে। এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের পক্ষে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপক্ষে উৎপল দত্ত মুখ্য আলোচক ছিলেন। নবনাট্য আন্দোলন ও দর্শক সমাজ এই আলোচনা থেকে প্রভূত উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

শুধু নাট্যপরিবেশন নয়, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন তথা দর্শক রুচি গড়ে তোলার পেছনে লিটল থিয়েটার গ্রুপের এ জাতীয় প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমশই তাঁরা এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। এই দলটির কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। বাংলা দেশের গণনাট্য আন্দোলন ও সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এঁদের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ভূমিকাও স্মরণ করি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 'বহুরূপী' জীবিত থেকেও যেন নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় ছিন্নমূল চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তৃপ্তি মিত্র পেশাদারী নাটকে অভিনয় করে এবং 'বহুরূপী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণী ব্যক্তি একে একে দল ছেড়ে হয়তো এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। কচিৎ দু একটি অভিনয়, তাও পুরনো নাটকের অভিনয় মারফৎ মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার হলে 'বহুরূপী' নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের আদর্শ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল আবেগে যখন দেশে এক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রমঅগ্রসরমান, তখন 'বহুরূপী'র প্রয়াসও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা সেই আশা রাখি। কারণ প্রথমাবধি যত সীমাবদ্ধতাই থাক, 'বহুরূপী' ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি এই আন্দোলনের সহযাত্রী হন তাহলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অনেক শক্তিশালী হবে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার এই সম্প্রদায় সম্প্রতি একটি নতুন নাটক, 'বিসর্জন', মঞ্চস্থ করেছেন। 'পরিচয়' 'বহুরূপী'র পুরনো বন্ধু। তাই 'বহুরূপী'র প্রতিটি উদ্যোগ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি। 'বিসর্জন' দেখার সুযোগ আমরা এখনও অর্জন করি নি। তাই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব হল না। আমরা ভরসা রাখি 'মুক্তধারা'র মতো এই নাটকটি 'কাঞ্চনরঙ্গ'র বন্যায় ভাসিয়ে যাবে না। বরং 'বিসর্জন' 'বহুরূপী'র জীবনে

নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দেবে। বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রূপে এঁরা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলনকে, নিজেদেরও অগ্রসর করতে তৎপর হবেন।

এই ক্রমবর্ধমান নবনাট্য আন্দোলনে 'শৌভনিক' সম্প্রদায়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যাত্রার ঐতিহ্য অদ্যাবধি জীবন্ত। তদুপরি নাট্যগোষ্ঠী ও দর্শক সমাজ উভয়েরই আর্থিক অবস্থা খানিকটা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্রীয়', অর্থাৎ সংকটাপন্ন। এই বাস্তব কারণগুলির সম্মুখীন হয়েই 'শৌভনিক' এ দেশে মুক্তাঙ্গন রীতিতে নাট্যপ্রদর্শনের এক বলিষ্ঠ আন্দোলন শুরু করেছেন। ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁরা একটি 'মুক্ত অঙ্গন' ও বেশ কিছুদিন হল পরিচালনা করছেন। শুধু 'শৌভনিক' নয়, বহু নাট্য প্রতিষ্ঠানই নামমাত্র চাঁদার বিনিময়ে এই মঞ্চ ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের দেশে জাতীয় থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হবে জানি না। কিন্তু এই 'মুক্তাঙ্গন' মঞ্চ, সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতিই সে অভাব আজ খানিকটা পূরণ করতে পারছে। সৎ উদ্যোগ যে কোনো প্রতিকূলতাই সহ্য করে না; শিল্পী তাঁর সৃষ্টি নিয়ে, দেশবাসী তাঁদের সাংস্কৃতিক আগ্রহ নিয়ে যে নিজেরাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন এই ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ।

তাছাড়া এই মুক্তাঙ্গন রীতির প্রভাবে আমাদের যাত্রা ও থিয়েটার যে অনেকখানিই পুনর্গঠিত হতে পারে—তারও সম্ভাবনা অস্বীকার করি না।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'; গোর্কীর 'মা'; ইবসেনের 'গোষ্টস'; রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'মুক্তির উপায়', 'রাজা ও রাণী', 'বাঁশরী' প্রভৃতি নাটক 'শৌভনিক' সম্প্রদায় এই মুক্তাঙ্গন রীতিতেই মঞ্চস্থ করেছেন। নাটক নির্বাচনেই এই গোষ্ঠীর বৈদগ্ধ্য ও সমাজ সচেতনতার যথার্থ পরিচয় পাই। 'মৃচ্ছকটিক', 'মা' ও 'গোরা' যাঁরা পর্যায়ক্রমে অভিনয় করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে নতুন কিছুই বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দ্বিতীয় মহীপাল', 'মা-হংসী', 'মানুষ' প্রভৃতি নতুন নাটকও এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন।

গেরাসিম লেবেদেফ ও মুক্ত অঙ্গন প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণে পঁচিশে নভেম্বর 'শৌভনিক' সম্প্রদায় তাঁদের মঞ্চে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনীর আয়োজন করেছিলেন। নতুন নাটক 'কল্পনা'-র কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য এইদিন অভিনীত হয়েছে। এই ডিসেম্বর থেকে নাটকটির সম্পূর্ণ প্রদর্শন শুরু হবে।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব

নবগঠিত সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে কয়েকটি অসাধারণ চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁরা পরিচয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। বাংলা দেশে এ যাবৎ যতগুলি চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, গুণগত বিচারে এটি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম প্রধান বলে বিবেচিত হবে। উৎসবের বাইরে 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস'-এর অতিরিক্ত ছটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে উদ্যোক্তারা বিরল সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

সম্প্রতি তরুণ পরিচালক আঁদ্রে মুঙ্কের জীবনাবসান হয়েছে। শেষ দিনে তাঁর 'ব্যাড লাক' প্রদর্শিত হল। এই অসাধারণ চলচ্চিত্রটির পরিচালক মুঙ্কের অকাল জীবনাবসানে আমরা আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছি। প্রসঙ্গত বলা দরকার আইজেনস্টাইনের সহযোগী প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান এডুয়ার্ড টিসে-রও সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। রুশ চলচ্চিত্রের স্বর্ণবিশেষ এডুয়ার্ড টিসেকে বাদ দিয়ে আইজেনস্টাইনের কোনো চলচ্চিত্রের কথাই যেন ভাবা যায় না। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে মোট পাঁচটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ও কয়েকটি শর্ট দেখানো হয়েছে। কার্টুন, ডকুমেণ্টারি ইত্যাদি শর্টসিরিজে কয়েকটি ছিল নিরীক্ষামূলক।

আঁদ্রে ওয়াজদার 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস' এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। ওয়াজদার 'কানাল' আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-জগতে ওয়াজদা, মুঙ্ক প্রভৃতি তরুণ পরিচালক 'পোলিশ স্কুল' নামে এক স্বতন্ত্র স্কুল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস'কে বলা হয় 'পোলিশ পটেমকিন'।

আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত এই 'পোলিশ স্কুল' চলচ্চিত্রের আন্দোলনে কি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন প্রদর্শিত প্রতিটি ছবিই তার প্রমাণ। অবশ্য 'আওয়ার্স অব হোপ' ও 'এ্যাটেনশন' আমি দেখি নি।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে এদেশে কত ভুল, মিথ্যে ধারণা প্রচারিত হয় তার উদাহরণ এই ছবিগুলি। বাস্তবতার কি গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য অন্বেষণে এঁরা নিয়ত নিরীক্ষাশীল তারও প্রমাণ, বিশেষত ওয়াজদা ও মুঙ্কের ছটি ছবি। আর 'নাইট ট্রেন' এবং 'ইভ ওয়াণ্টস্ টু স্লীপ'ও অন্য কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের নবজাত ও গৌরবময় চলচ্চিত্রের আন্দোলনেও অনিবার্যভাবেই বাস্তবতা, আঙ্গিক, দর্শকরুচি প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক সমস্যা এসেছে। অত্যধিক সরলীকরণের প্রভাব দেখেছি 'তিন কন্যা'য়, ও আঙ্গিকসর্বস্বতার ফল প্রত্যক্ষ করেছি 'কোমল গান্ধার'-এ। অথচ সময় ও সমাজের প্রতি অনুগত থেকে, আঙ্গিক বিষয়ে চূড়ান্ত আধিপত্য অর্জন করে, জীবনের মৌলিক সমস্যা ও সর্বব্যাপী রূপকে ফুটিয়ে তোলার পারদর্শিতা আবার এই তরুণ পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে দেখা গেল। আমাদের দেশেও সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ তাঁদের সম্পর্কে আমাদের প্রভাবিত হতে বাধ্য করেছেন। আশা করব এঁদেরই কেউ বা যোগ্য কোনো ব্যক্তি অচিরে বিশেষত 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস' ও 'ব্যাড লাক' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করবেন।

প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়ে গেল। ১১ থেকে ১৯শে নভেম্বর ক্যাথিড্রাল রোডের অ্যাকাদেমী ভবনে অনুষ্ঠিত শ্রীমতী অর্জুন রায়ের প্রদর্শনীটি ছিল সত্যিই বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের চারিপাশে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে অনুপম শিল্পসম্ভার ছড়িয়ে আছে, শ্রীমতী রায়ের শিল্পী চোখ তা আবিষ্কার করেছে ও তাঁর হাতের সামান্য স্পর্শে সেই অবজ্ঞাত শিল্পকর্মই হয়েছে এই প্রদর্শনীর সম্পদ। গাছের ডাল, কাঠের টুকরো বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে দর্শকের সামনে এক জগৎ উদ্‌ঘাটিত করেছে।

সমকালীন শিল্পীসংঘ কয়েকজন সাম্প্রতিক শিল্পী প্রতিষ্ঠিত এক উল্লেখযোগ্য শিল্পসংস্থা। ৩০শে অক্টোবর থেকে ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত আকাদেমি ভবনে এঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকর্মের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। চিত্রকর্ম ছাড়া ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শনও ছিল। সোমনাথ হোড় প্রমুখ স্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নবাগত কয়েকজন শিল্পীর কাজও এই প্রদর্শনীর সম্পদ।

অজয় মুখোপাধ্যায় তরুণ শিল্পী। আকাদেমি ভবনে ৯ থেকে ১৫ই নভেম্বর এঁর চিত্রের একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অধিকাংশ সাম্প্রতিক শিল্পীর মতোই অজয় মুখোপাধ্যায়ও চিত্রকলার বিষয় ও প্রকরণের প্রাসঙ্গিক সমস্যায় আক্রান্ত এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসও তাঁর আছে।

১লা থেকে ৭ই নভেম্বর আকাদেমি ভবনে প্রখ্যাত শিল্পী তুফান রাফাইয়ের

চিত্রকর্মের একটি উপভোগ্য একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাকাইয়ের প্রদর্শনীটি বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত একথা 'পরিচয়' পাঠকদের অজানা নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

৩রা ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী।

এই রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তিনি অনুপস্থিত। মহাকাশ-বিজয়ী ইউরি গাগারিন মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগতি, বিশ্বমৈত্রী ও দৃপ্ত শান্তির বার্তা বহন করে যখন কলকাতার বুকে এসে দাঁড়ালেন, তখনও তিনি ছিলেন না। কলকাতার উপকণ্ঠে হিন্দ মোটর কারখানার শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর বর্বর পুলিশী হামলা, স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে মালিকপক্ষ এবং সরকারের যৌথ প্রয়াসে মধ্যযুগীয় অন্ধকার—আর মানুষ বাঁচার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেখানেও তিনি থাকতে পারেন নি।

তাই বারবার আজ মানিকবাবুকেই মনে পড়ছে। একদিকে সভ্যতার নিশ্চিত অগ্রগতি, অন্যদিকে অবক্ষয়ী পশুশক্তির শেষ আস্ফালন—বিকাশ আর বিনাশের এই দুই পরস্পরবিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে আজ বারবার তাঁর কথাই মনে পড়ে।

দেশবাসী মানিকবাবুকে শ্রদ্ধা করেন, চোখের মণির মতো তাঁরা এই মহৎ মানুষ ও গুণী শিল্পীর স্মৃতিকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন?

কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক হাজার মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষের জীবন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যেখানে সংকটাপন্ন, সেখানে সমাজ ও সভ্যতার ধাত্রীপুরুষ সাহিত্যিককুল নীরব থাকেন কি করে?

সৎ, বিবেকবান সাহিত্যিকদের কাছে তাই আমাদের আবেদন—আসুন আমরা দল বেঁধে সেই নিপীড়িত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াই। আসুন আমরা বলি—ভালোবাসি, ঘৃণা করি। কাল্পনিক বা দূরবর্তী বিপদের আশঙ্কায় ঘরে মুখ না লুকিয়ে আসুন বাংলা-দেশের লেখক ও শিল্পীরা একত্রে আবার মানুষের পাশে দাঁড়াই।

আজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। কিন্তু বাংলাভাষায় ছোটো বকুলপুরের যাত্রী কি আর দেখা হবে না?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-নাটিকা 'স্পেশাল ট্রেন'

বিপ্লব ও ধর্মঘটের শহর কলকাতায় গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নতুনতর ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই দিনটি ছিল 'হিন্দ মোটরস দিবস'। বি পি-টি ইউ সির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা এই দিনটিতে সভা শোভাযাত্রা ও অর্থসংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দ মোটরস্-এর ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা জানিয়েছিলেন। যদি শুধু এইটুকুই হত, তবে তা কলকাতার পক্ষে নতুন কোনো ব্যাপার হত না। কলকাতার সংগ্রামী ঐতিহ্যে এ-ধরনের বহু দিবসই রক্তের অক্ষরে চিহ্নিত। কিন্তু গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখটি আরো একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। কীর্তিমান নট উৎপল দত্ত ও তাঁর সহকর্মীরা এইদিন হিন্দ মোটরস্-এর শ্রমিকদের সংগ্রামকে উপজীব্য করে একটি পথ-নাটিকায় অভিনয় করেছেন।

নাটিকাটির নাম 'স্পেশাল ট্রেন'। সরাসরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনা মঞ্চে, বিনা আলোকসম্পাতে, বিনা মেক্-আপে, বিনা আবহসঙ্গীতে প্রায় আধঘণ্টা ব্যাপী অভিনয়। যান্ত্রিক সহায়তা নেওয়া হয়েছে শুধু একটি লাউডস্পীকারের। তাও পুলিশের আপত্তিতে ডালহৌসি স্কোয়ারের অনুষ্ঠানে এই যান্ত্রিক সহায়তাটুকুও পাওয়া যায় নি। এমন অনাড়ম্বরভাবে, এমন রাস্তার ওপরে জনতার ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের একটি নাটিকার অভিনয় যে সম্ভব তা নিজের চোখে না দেখলে আর নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত।

অভিনয় বললাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয় বলে মনেই হয় নি। বাস্তব ঘটনাগুলোই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। অথচ, যাকে বলা হয় নাটকের 'অ্যাকশন', তার বিশেষ সুযোগ এই পথ-নাটিকায় ছিল না। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংলাপ কথোপকথনের মাধ্যমে এই নাটকের বিস্তার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা ছিল যে নাটক শেষপর্যন্ত না ময়দানের বক্তৃতার চেহারা নেয়। কিন্তু নাটক শেষ হবার পরে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমরা আর শুধুমাত্র শ্রোতা নই, হিন্দ মোটরস্ শ্রমিকদের লড়াইয়ে আমরাও সামিল হয়েছি, সাতার দিনের অকম্প্র ধর্মঘটের গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত। কলকাতার রাস্তাই কিছুক্ষণের জন্যে হয়ে উঠেছিল হিন্দ মোটরস্-এর লড়াইয়ের ময়দান। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ব্যক্তিরূপে চঞ্চল হয়েছি, উত্তেজনায় অস্থির, আবেগে টলোমলো, প্রতিজ্ঞায় কঠোর। তারই মধ্যে কেউ একজন ঝুলি হাতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর

আমরা পকেট খালি করে সমস্ত পয়সা সেই ঝুলির মধ্যে ফেলেছি। আর তারপরেও শান্ত হতে পারি নি। ধর্মঘটী শ্রমিকের গলায় গলা মিলিয়ে স্লোগান তুলেছি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

খুব সম্ভবত এমনটিই হয়ে থাকে। উপলক্ষটি ছিল আমাদের কাছে খুবই বাস্তব। আর নাটকের চরিত্রগুলো আমাদের কাছে এতই পরিচিত ছিল যে তাদের মুখের একটি-দুটি কথা থেকেই আমরা অকথিত অনেক ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। অর্থাৎ, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘটতে পেরেছিল। তাই কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পেরেছিলাম যে আমরা কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। কিছুক্ষণের জন্যে ভাবতে পেরেছিলাম যে হিন্দ মোটরস্ শ্রমিকদের লড়াই আমাদেরও লড়াই।

অথচ পরে ভেবে দেখেছি, উৎকর্ষের বিচারে এই নাটকটিকে সেরা নম্বর দেওয়া চলে না। দোষত্রুটি অনেক। খুঁটিয়ে বিচার করতে বসলে ফিরিস্তিটা খুবই দীর্ঘ হবে। কিন্তু সে-আলোচনায় এজন্যে যাব না যে আমরা যারা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হ্যাজাকের আলোয় নাটিকাটির অভিনয় দেখতে দেখতে কখন যেন নিজেরাই নাটিকার কুশীলব হয়ে উঠেছিলাম—সেই আমরাই হচ্ছি প্রমাণ যে খুব মোটা কথা খুব মোটা দাগে তুলে ধরতে পারলেও নাটকীয় সার্থকতা লাভ করা চলে। নাটকের উৎকর্ষ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক ভাড়া-করা পেশাদারী মঞ্চের শৌখিন কেরামতি না পেলে ঠিক যেন জাঁকিয়ে বসতে পার না।

৬ই ডিসেম্বরের স্মরণীয় দিনটিতে কলকাতার পাঁচটি বিভিন্ন জায়গায় এই পথ-নাটিকার অভিনয় হয়েছিল। সকাল সাড়ে-সাতটায় গড়িয়াহাট মোড়ে, সাড়ে-আটটায় হাজরা মোড়ে, বিকেল সাড়ে-পাঁচটায় ডালহৌসি স্কোয়ারে, সন্ধে সাড়ে-ছটায় ময়দানের মনুমেন্টের নিচে, সাড়ে-সাতটায় শ্যাম স্কোয়ারে। সারা শহর জুড়ে যেন এক নতুন ধরনের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানটি হবার কথা ছিল পাঁচমাথার মোড়ে। কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, যানবাহন বন্ধ হবার যোগাড়। শেষপর্যন্ত সবাই মিলে মস্ত একটি মিছিল করে হাজির হয়েছিল শ্যাম স্কোয়ারে। পথ-নাটিকা শুধু আর পথেই থাকে নি, ময়দানে ও স্কোয়ারেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাটিকাটি রচনা করেছেন উৎপল দত্ত। প্রধান একটি চরিত্রের অভিনয়েও তিনি ছিলেন। একটি কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে আমাদের দেশের

একজন সেরা নাট্যকার ও অভিনেতার এমন সচেতন আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত কলকাতার মতো শহরেও বোধ হয় এই প্রথম। আর উৎপল দত্তর সঙ্গে তাঁর যে সব সহকর্মী যোগ দিয়াছিলেন তাঁদের কৃতিত্বও কিছুমাত্র কম নয়। সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চক্রবর্তী, রমাবন্ধু চৌধুরী ও বিধান মুখোপাধ্যায়।

নাটিকাটি শুরু হচ্ছে কারখানায় অবস্থানকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর ও লেবর অফিসারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। তারই মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের যাতায়াত। যেমন, একজন নিরীহ ট্রেনযাত্রী, একজন দালাল এবং সবার শেষে একজন ধর্মঘটী মজুর। চরিত্রগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধুই কথা বলেছে। কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, কথাগুলো কোনো সময়েই বক্তৃতার মতো শোনায় নি। হিন্দ মোটর ওয়ার্কস ও তার শ্রমিকদের ধর্মঘট—দুই দিকেই এমনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে একদিকের শোষণ ও অপর দিকের সংগ্রাম সম্পূর্ণ একটি পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। এই পথ-নাটিকাটির অসাধারণ সাফল্যও এই কারণেই।

ইলিয়া এরেনবুর্গের বিখ্যাত উপন্যাস 'প্যারীর পতন'-এ সিয়েন কারখানায় ধর্মঘটের একটি ছবি আছে। এই ধর্মঘট চলার সময়ে কারখানার ভেতরে মঞ্চ খাড়া করে নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হয়েছিল। যে অভিনেত্রীটি শ্রমিকদের ডাকে বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছিল তার নাম জেনেৎ। "নিষ্ফল বসন্ত থেকে কিছুটা অংশ সে অভিনয় করল। অভিনয়ের শেষে প্রশংসা আর অভিনন্দনের ঝড় উঠল যেন। হাততালির শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। জেনেতের মনে হল, ফাঁৎ অতেভ্‌র্‌য়ার জনসাধারণ জেগে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে জয়ের পথে—সে আর এখন সামান্য অভিনেত্রী জেনেৎ নয়, বীরনেত্রী আন্দাসুসিয়া ডাক দিচ্ছে জনসাধারণকে।" উৎপল দত্তর স্পেশাল ট্রেন'ও এমনি এক সংগ্রামের ডাক, জয়ের ঘোষণা। আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি, তাঁর প্রয়াস শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধকে ঘনিষ্ঠতর করবে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা অনুসৃত হবে।

অমল দাশগুপ্ত

গন্ধর্ব-র নবনাট্যোৎসব

তরুণ নাট্যগোষ্ঠী গন্ধর্ব-কে সাধুবাদ জানানো আগেই দরকার ছিল। যদিও নিছক সাধুবাদের জন্য নিশ্চয়ই এই দুঃসাহসিক নাট্যপ্রযোজনায় তাঁরা হাত দেন নি। গত ১৬ই এপ্রিল থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাস ধরে গন্ধর্ব নাট্যসম্প্রদায় মিনার্ভা মঞ্চে বারোটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করলেন। নামকরা লেখকদের পেশাদারী নাটক নির্বাচনে এঁদের ঝোঁক ছিল না। তরুণ ও তরুণতরদের রচনাকেই গন্ধর্ব মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এবং এর কারণ, পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনাতেই এঁদের আগ্রহ। গতানুগতিক অভিনয় কিংবা প্রযোজনা দুই-ই এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বর্জন করেছেন। নতুনতর জীবনবোধে অনুপ্রাণিত এই নাট্যসম্প্রদায়ের তরুণ শিল্পীরা কোনো গোঁড়া আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ নন। কিন্তু জীবনের প্রতি আনুগত্য এঁদের রয়েছে। এবং এই আনুগত্যই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে দিয়েছে সার্থকতা। নবনাট্য আন্দোলনের যে ধারা আজকের বাংলা নাটককে জীবনমুখী করেছে, গন্ধর্ব তারই উত্তরাধিকারী। জীবনের জটিল প্রশ্নের গ্রন্থি উন্মোচনের দায়িত্ব নিয়েছেন এযুগের সাহিত্যশিল্পী। নাটকের বক্তব্য ও আঙ্গিকেও তারই সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস আমাদের আশান্বিত করে।

গন্ধর্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে এই নাট্যোৎসবের প্রস্তাবনায় পূর্বগামীদের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল: গন্ধর্বের 'নবনাট্য উৎসব' যে কাঠামোভাঙা এবং সংস্কারবিহীন জীবনাভিমুখীনতার দাবি রাখছে, তা অন্যান্য নাট্যোৎসব থেকে বর্তমান উৎসবকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করবে। নাটক নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, "ট্র্যাডিশনকে বাদ দিয়ে জীবনের সঙ্গে যোগহীন উৎকট পরীক্ষামূলক নাটক করার মোহ আমাদের নেই। বাংলা নাটকের মৌল সুরের সঙ্গেই নবতর যুক্তিবাদী তথা জীবনবাদী নাটক সৃষ্টি করাকেই আমরা অভীষ্ট মেনেছি।" আমি আনন্দিত যে গন্ধর্ব-র এই বক্তব্য তাদের প্রযোজিত নাট্যোৎসবে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করেছে। এই নাট্যোৎসবে বারোটি একাঙ্ক অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি কাব্যনাট্য। একটি রাম বসু-র 'নীলকণ্ঠ' অপরটি কৃষ্ণ ধরের 'একরাত্রির জন্য'। এ ছাড়া বাকী দশটি একাঙ্ক জীবনরীতিসমৃদ্ধ

হলেও শিল্পরীতিতে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। প্রতীকী, প্রহসন এবং মনস্তাত্ত্বিক নাটকও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

অতনু সর্বাধিকারী-র 'অন্তস্বর', গিরিশঙ্করের 'রক্তকরবীর পরে', অময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রঙ', সুরঞ্জন মিত্রের 'নেপথ্য দর্শন', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দেবরাজের মৃত্যু', মনোজ মিত্রের 'পাখির চোখ', তৃপ্তি চৌধুরীর 'মাটির রঙ সবুজ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুখের মতো সমুদ্র', ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'একচক্ষু' ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'উড়ো পাখির ছায়া' অভিনীত নাটকগুলির নাম। এই নাট্যোৎসবের নির্দেশনায় ছিলেন তরুণ শক্তিমান অভিনেতা ও পরিচালক শ্যামল ঘোষ। মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীতে হৃদয় কুশারী, আলোকসম্পাতে রঞ্জিত মিত্র এবং শব্দপ্রক্ষেপনে প্রভাত হাজরার কর্মকুশলতা উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল। মঞ্চসজ্জার দিক থেকে 'অন্তস্বর' ও 'একরাত্রির জন্য' এবং সর্বাঙ্গীন প্রযোজনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'সুখের মতো সমুদ্র' এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে। 'সন্ধ্যার রঙ', পাখির চোখ', 'একচক্ষু' এবং 'রক্তকরবীর পরে' তিনটি বিভিন্ন স্বাদের নাটক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দর্শকদের চিহ্নিত করেছিল। এবং নতুনতর নাট্য আঙ্গিক পরিবেশনে গন্ধর্বগোষ্ঠীর এই উৎসব নাট্যামোদীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন নাটকের অভিনয়কর্মে যাঁদের পরিশ্রমী নিষ্ঠা এই উৎসবকে সাফল্য দিয়েছে তাঁদের মধ্যে মমতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা চক্রবর্তী, বিজু ভাওয়াল, মনোজ মিত্র, গিরিশঙ্কর, কণিষ্ক রায়, অবনী ভট্টাচার্য, দেবকুমার ভট্টাচার্য ও অসিত দে-র নাম উল্লেখ্য। তবে যৌথ প্রচেষ্টাতেই উৎসব সার্থক হয়। তাই স্বতন্ত্র নামোল্লেখে এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই যে অনুল্লিখিত অন্যান্য শিল্পীদের যত্ন ও নিষ্ঠা ছাড়াই গন্ধর্বর ছয়মাসব্যাপী এই নাট্যোৎসব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

সুমিত রায়

লেখকদের প্রতি নিবেদন

- অনুগ্রহ করে কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হরফে লিখবেন
- রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন
- এতৎসম্পর্কিত চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে লিখবেন
- উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে লেখা সম্পর্কে মতামত জানানো বা অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হয় না
- সম্পাদকীয় দপ্তর তিন মাস পরে অমনোনীত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দায়ী থাকবেন না

গ্রাহকদের সুবিধার্থে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত ২৯শ বর্ষের বর্ষসূচীর প্রথম পৃষ্ঠাটি আমরা আর একবার প্রকাশ করলাম।

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৬—আষাঢ় ১৩৬৭ [১৮৮১—৮২]

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৮—আষাঢ় ১৩৬৯ (১৮৮২-৮৩)

সাইকেল শিল্পে
সর্বপ্রথম...
CYCLES

পৌষ **সূচীপত্র** ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৮৮৩। ১৩৬৮

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে

অংশু দত্ত

৯ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি আফ্রিকার রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি এবং বিশ্বরাজনীতিতে আফ্রিকার ভূমিকা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন নতুন করে চিন্তা করবার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের নিম্নলিখিত আলোচনা তাই সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্রের কাছে প্রাসঙ্গিক হবে, তাছাড়া ভারতবাসী হিসাবে আমাদের ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তথা সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকার রাজনীতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার বিশেষ প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এই বিশেষ প্রয়োজনটির কথা বলে আমাদের বক্তব্যের অবতারণা করা যাক। ট্যাঙ্গানাইকার ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে এই বিশেষ প্রয়োজনের স্বভাবসিদ্ধতা বোঝা যাবে। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের মাঝামাঝি ট্যাঙ্গানাইকার সমুদ্রতীর, অনতিদূরে জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপ। যার ওপর সবচেয়ে বড় বন্দর হল দার-এস-সালাম। আরব সাগরে নৌবাহন করার পক্ষে এদের উপযোগিতা অপরিসীম। তার ওপর আছে আরব সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নিয়মিত মৌসুমী বায়ু, যার কল্যাণে কোনো রকম যান্ত্রিক শক্তি ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র পালের ওপর নির্ভর করে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারত। বহুদিন থেকে এমন নৌবাহন চলে আসছে। এবং কোনো কোনো পুরাণে পূর্ব-আফ্রিকার কিছু কিছু ভৌগোলিক উল্লেখও পাওয়া যায়। ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার যোগাযোগ নিকটতর হয় এই উভয় অঞ্চল ইওরোপীয় অধিকারে আসার পর থেকে। ট্যাঙ্গানাইকা অবশ্য প্রথমে জার্মান উপনিবেশ ছিল। প্রথম

মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর এখানে বৃটেনের ম্যাণ্ডেট শাসন প্রবর্তিত হয়। সে যাই হোক বৃটিশ শাসনের তাগিদে বহু ভারতীয় এখানে আসে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ব্যবসায়ী। কিন্তু তা ছাড়াও ছিল রেলপথ ও অন্য পরিবহন ব্যবস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিসের নিম্ন ও মধ্যপর্যায় কর্মচারী। ফল হয়েছে এই: আজ সংখ্যার দিক থেকে এরা নেহাৎ নগণ্য নয় (১৯৪৮ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০-এরও বেশি), আর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) এদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে।[১] টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা পাওয়ার পর এঁদের তীব্র আফ্রিকান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। এখনই অনেক অঞ্চলে আফ্রিকান সংযোগ ভারতীয় একচেটিয়া কারবারীদের কোনঠাসা করেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর আফ্রিকার প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই বাড়বে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে থাকার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হটিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা বর্ণ-সংঘর্ষের রূপ নেবে কি না। স্পষ্টই বোঝা যায়, সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। আশার কথা, পূর্ব আফ্রিকার অন্য দেশগুলির তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণ-সম্পর্ক (অর্থাৎ আফ্রিকান-ভারতীয়-ইওরোপীয় সম্প্রদায়ত্রয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ) অনেক স্বাস্থ্যকর। কেনিয়ার মতো ট্যাঙ্গানাইকায় আফ্রিকান কোনো সমাজ এত শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়নি। কেনিয়ায় এসেছে বহু ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক। বিস্তৃত এলাকা তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। ফলে অনেক আফ্রিকান উপজাতি জমিচ্যুত হয়ে অন্য উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিড় বাড়িয়েছে, ইওরোপীয় আবাদে অস্থায়ীভাবে বাস করেছে; এবং কেউ কেউ শহরে ছিন্নমূল আফ্রিকানদের দলে এসে মিশেছে। আফ্রিকান বিক্ষোভ ও অশান্ত প্রতিবাদ, আফ্রিকান অগ্রগতিতে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সক্রিয় বাধাদান, ভারতীয়দের ত্রিশংকুর মতো অবস্থা, এই সমস্ত উপাদান কেনিয়ার বর্ণ-পরিস্থিতিকে জটিলতর করেছে। ট্যাঙ্গানাইকা বিশাল দেশ (পশ্চিমবঙ্গ,

১। শ্রীংকোপোপির হিসাব অনুসারে এশীয়গণ (যাদের মধ্যে ভারতীয়রা সর্বাধিক) ট্যাঙ্গানাইকার আমদানী বাণিজ্যের ৫০% এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ৬০% নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া, এদের কারো কারো হাতে আছে ছোটখাট বাগিচা ও কলকারখানা।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সমান হবে)। সেখানে উচ্চ মালভূমিতে কিছু কিছু ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সত্য কথা। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তা কিছুই নয়। এমনকি শুধুমাত্র সংখ্যার হিসাবেও কেনিয়ার ইওরোপীয় বাসিন্দারা টাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি হবে। অতএব টাঙ্গানাইকার রাজনীতিতে ইওরোপীয়রা আফ্রিকান-বিরোধী চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ ছাড়া টাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় সমাজের পক্ষে কেনিয়ার ইওরোপীয় সমাজের মতো যূথবদ্ধ হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এখানে ছিল জার্মান প্রভুত্ব। এবং সরকারী আনুকূল্যে অনেক জার্মান ঔপনিবেশিক এদেশে বসবাস সুরু করে। ম্যাণ্ডেট শাসনে অবশ্য ইংরেজ নাগরিকেরা টাঙ্গানাইকায় বসতি করতে আসে। কিন্তু কেনিয়ার মতো সুসংবদ্ধ ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় টাঙ্গানাইকায় জন্ম নেয়নি।

এর সঙ্গে যোগ করতে হয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা। টাঙ্গানাইকা প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশন্সের ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অধীনে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থায় যদিও শাসনক্ষমতা বৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তবু লীগ অফ নেশন্স ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দেশের শাসন, রাজনৈতিক প্রগতি ও বর্ণসম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা ও উপদেশদানের অধিকার ছিল। আন্তর্জাতিক জনমতের সক্রিয় ভূমিকায় বৃটেনের পক্ষে টাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের যথেচ্ছ সুযোগ-সুবিধা দান সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বর্ণবৈষম্য যে ছিল না তা নয়। সরকারী বেসরকারী অফিসে, বর্ণের ভিত্তিতে দক্ষিণার তারতম্য ছিল, হোটেল রেস্তোঁরা রেলস্টেশন প্রভৃতি সর্বজনগম্য স্থানে আফ্রিকানদের ইওরোপীয়দের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হত না। হাসপাতালে ইউরোপীয় রোগী এবং জেলখানায় ইউরোপীয় কয়েদীরা সুখসুবিধা পেত। এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালে সরকারী স্কুলে পড়পড়তা আফ্রিকান ছাত্রের জন্য যা খরচ করা হয় ইওরোপীয় ছাত্রের জন্য খরচ করা হয় তার আটাশ গুণ বেশি টাকার। কিন্তু কেনিয়ার মতো এত চরম প্রভেদ, এমন অন্ধ আফ্রিকান বিদ্বেষের গোঁড়ামী টাঙ্গানাইকায় জন্ম নিতে পারেনি।

এককথায়, এতকাল পর্যন্ত টাঙ্গানাইকায় বর্ণসম্পর্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঈর্ষা দ্বেষ ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও,

প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়নি। এর পেছনে বিশ্বরাজনীতির প্রভাব ও আন্তর্জাতিক কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ইদানীংকালে বোধহয় এর পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে আফ্রিকান রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ট্যাঙ্গানাইকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নাম ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন (ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, সংক্ষেপে টি. এ. এন. ইউ. বা 'টান্যু')। এর নেতার নাম শ্রীজুলিয়াস নিয়েরেরে। শ্রীনিয়েরেরের নেতৃত্বে 'টান্যু' অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৫৪ সালে এর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই সারাদেশে 'টান্যু'র শাখা সংগঠন বিস্তৃত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ট্যাঙ্গানাইকার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 'টান্যু' সমস্ত আফ্রিকান আসন এবং বেশ কিছু এশীয় ও ইওরোপীয় আসন দখল করে। ১৯৬০ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে 'টান্যু'র সভ্য ও সমর্থকেরা ৭১টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসনে নির্বাচিত হন।

শুধুমাত্র আফ্রিকানরা এই দলের সভ্যপদ পেতে পারলেও একে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া উচিত হবে না। আগে বলা হয়েছে, এশীয় ও ইওরোপীয় আসনগুলিতেও 'টান্যু' সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের বহু নেতা শ্রীনিয়েরেরে তথা 'টান্যু'র নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। এঁদের পক্ষে এ কাজ সহজতর হয়েছে, কারণ 'টান্যু' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণ ও জাতি-আশ্রয়ী রাজনীতির নিন্দা করেছে। 'টান্যু'র শৈশবে জুলিয়াস নিয়েরেরে বলেন, ট্যাঙ্গানাইকার রাজনীতিতে জাতি বা বর্ণের স্থান নেই। অল্প কিছুদিন আগে যখন ট্যাঙ্গানাইকার বিধানসভায় নাগরিকতা-আইন আলোচিত হচ্ছিল, তখন কিছু কিছু চরমপন্থী আফ্রিকান সদস্য দাবি তোলেন যে, বর্ণের ভিত্তিতে ট্যাঙ্গানাইকার নাগরিকত্ব নির্ধারিত করা হোক। শ্রীনয়েরেরে এ দাবি খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করেন এই কথা বলে যে, দেশের প্রতি আনুগত্য ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা উচিত হবে না।

শ্রীনিয়েরেরে ও তাঁর সহযোগী নেতারা একাধিকবার বলেছেন স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকায় অনাফ্রিকান সম্প্রদায়সমূহের কোনো ভয়ের কারণ নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রগতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় ও ইওরোপীয় নেতারাও

মোটামুটি 'টানু'র সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। 'টানু'র সমর্থনে ভারতীয় ও ইওরোপীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে জয়লাভ এবং শ্রী নিয়েরেরের মন্ত্রিসভায় ভারতীয় ও ইওরোপীয় মন্ত্রিগণের অংশগ্রহণ এই সহযোগিতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সহযোগকে স্থায়ী করতে হলে ভারতীয় ও ইওরোপীয়দের সমস্ত রকমের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মোহ ছাড়তে হবে। এক স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রে সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো স্থান নেই, একথা অনাফ্রিকানরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারেন ততই মঙ্গল। একথা ঠিক যে অনাফ্রিকান নেতৃবৃন্দ আফ্রিকার নেতৃত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা শুধু উপরতলায় নেতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। সাধারণ ভারতীয় ও সাধারণ ইওরোপীয়কে নিজেদের ট্যাঙ্গানাইকার অধিবাসী বলে মনে করা দরকার। যে পরিমাণে তারা বৃহত্তর ট্যাঙ্গানাইকান সমাজের অংশীদার হতে চাইবে ও তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং যে পরিমাণে ট্যাঙ্গানাইকার আফ্রিকানরা অনাফ্রিকান সম্প্রদায়সমূহকে আত্মীকরণ করতে চাইবে; সেই পরিমাণে ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণসম্পর্ক সুস্থ হবে। অবশ্য ব্যাপারটা লিখতে যত সহজ, কাজে তত অনায়াসসাধ্য নয়। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর (বিশেষতঃ যদি তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার মানে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে) সমীকরণ এক জটিল ও বহুবিলম্বিত প্রক্রিয়া। হাজার বছর একসঙ্গে বাস করেও হিন্দু ও ইওরোপীয় খ্রীষ্টানরা একীভূত হয়নি। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পার্শীরা এসেছে ১২শ বছর আগে, তবু তাদের পৃথক সত্তা এখনও যায়নি। অতএব, অন্তর্বিবাহ ইত্যাদির ফলে ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের অবসান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন আশা করার কোনো কারণ নেই। নাতিদূর ভবিষ্যতে যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব অস্বীকার না করে ট্যাঙ্গানাইকার সামগ্রিক স্বার্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ মিলিয়ে দেওয়া। ট্যাঙ্গানাইকার ভারতীয়গণ আপন স্বার্থে এই উদ্দেশ্যে কাজ করবেন এমন আশা আমরা ভারতবর্ষ থেকে করতে পারি। ভারত সরকার আর একবার ট্যাঙ্গানাইকার ভারতীয়দের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে পারেন (ইতিপূর্বে শ্রীনেহেরু সাধারণভাবে আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের তা বলেছেন)

যে তাদের নিজদের ট্যাঙ্গানাইকার মানুষ বলে মনে করতে হবে এবং স্বকীয় পরিশ্রম, উদারতা ও অনসূয়া দিয়ে আফ্রিকানদের সম্প্রীতি জয় করতে হবে।

স্পষ্টত ট্যাঙ্গানাইকায় যদি আফ্রিকা-ভারতীয় সম্পর্ক পারস্পরিক প্রীতি ও বিবেচনার ভিত্তিতে সুসংগঠিত হতে পারে, তবে পূর্ব আফ্রিকার অন্যত্র প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা সহজতর হবে। পক্ষান্তরে যদি তা না হয় এবং যদি বর্ণসংঘর্ষে সেখানকার ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ভারতবর্ষ এক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হবে। সংখ্যাল্পতার সুযোগ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করা হলে তাদের সমর্থনে কথা বলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের থাকবে। অথচ তা করতে গেলে অতি সুনিশ্চিতভাবে আমরা আফ্রিকা (বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকায়) ভারতবিরোধী মনোভাব শক্তিশালী করব। একথা ঠিক যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনের প্রতিবাদ আমরা করেছি, যদিও সে প্রতিবাদ খুব কার্যকর হয়েছে এমন দাবি কেউ করবে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সে প্রতিবাদ বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী ইওরোপীয় শাসকদের বিরুদ্ধে, যে ইওরোপীয় শাসনকর্তারা আফ্রিকানদেরও শোষণ ও উৎপীড়ন করছে। এবং সে প্রতিবাদে আর কিছু না হোক প্রায় সারা পৃথিবীর সমর্থন আমরা পেয়েছি। ট্যাঙ্গানাইকার ব্যাপার একটু অন্য ধরণের হবে। এখানকার ভারতীয়দের একটা বড় অংশ অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের শোষণ করছে। আমরা জানি অনেক সময় শোষিত-নির্যাতিতদের প্রতিবাদ তথাকথিত শোভনতার সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। তা ইতিহাসেরই নিয়ম। কোনো কোনো নির্দোষ ব্যক্তিও লাঞ্ছিত হতে পারেন। কিন্তু এই অজুহাতে যদি কোনো বিদেশী সরকার কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু শোষকসম্প্রদায়ের পক্ষে এগিয়ে আসে, তবে তার পক্ষে অন্যদেশের সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। এমনকি, ভারতবর্ষের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহও সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। অতএব, এই উভয় সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যদি ট্যাঙ্গানাইকায় অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হতে দেওয়া যায়। অবশ্য এই ব্যাপারে ভারতের কর্মোদ্যম সীমিত। তবু নানা পরোক্ষ উপায়ে আমরা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি।

ট্যাঙ্গানাইকার, তথা সমগ্র পূর্ব আফ্রিকার রাজনীতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার "বিশেষ প্রয়োজন" আমাদের এইখানে।

দুই

অন্য অনেক আফ্রিকান রাষ্ট্রের তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল মাত্র ৪টি: উত্তর পূর্বে মিশর ও ইথিওপিয়া, পশ্চিমে লাইবেরিয়া ও দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তার সঙ্গে যুক্ত হল পূর্বতন ইতালীয় উপনিবেশ লিবিয়া, ১৯৫৬ সালে সুদান টিউনিসিয়া ও মরক্কো, ১৯৫৭ সালে ঘানা, ১৯৫৮ সালে গিনি, আর তারপর ১৯৬০ সালে ক্যামেরুন, টোগোল্যাণ্ড, মালি যুক্তরাষ্ট্র (যা থেকে পরে সেনেগাল বিচ্ছিন্ন হয়), নাইজার, দাহোমে, উর্ধ্ব ভলতা মরিতানিয়া, কোৎ দিভোয়ার, কঙ্গো (পূর্বতন বেলজিয়ান), নাইজেরিয়া, সোমালিয়া ও মাদাগাস্কার। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে স্বাধীনতা পেল পশ্চিম আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন। সর্বশেষে ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা এল ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে, অর্থাৎ যখন ইতিমধ্যেই ২৪টি আফ্রিকান দেশ স্বাধীন হয়েছে।

তবু মনে রাখা দরকার আফ্রিকা মহাদেশের (বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার) বিচারে ট্যাঙ্গানাইকার স্বরাজপ্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হলেও, পূর্ব আফ্রিকার অন্য দেশের পূর্বসূরী হল স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকা। সুদান, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড (যে দেশ ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন সোমালিয়া গঠন করেছে) ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ ছাড়া উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকা হল প্রথম দেশ যেখানে আফ্রিকানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেল। শুধুমাত্র এইজন্যই ট্যাঙ্গানাইকার আঞ্চলিক নেতৃত্ব করার সুযোগ ছিল। এছাড়া অবশ্য অন্য কারণও রয়েছে। প্রথম হল, এ দেশের আয়তন, দ্বিতীয় লোকসংখ্যা, তৃতীয় ভৌগোলিক অবস্থান। এ সমস্তই হল ট্যাঙ্গানাইকার নেতৃত্বের পক্ষে অনুকূল। আর এর সঙ্গে বোধকরি যোগ করা যায় ট্যাঙ্গানাইকার ঐক্য। উগাণ্ডায় আফ্রিকান জাতীয় আন্দোলন বরাবর উগাণ্ডার আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং যদি মনে রাখা যায় যে বুগাণ্ডা হল উগাণ্ডার সমৃদ্ধতম অঞ্চল এবং বাগাণ্ডা উপজাতি (বুগাণ্ডার অধিবাসী) উগাণ্ডার একক বৃহত্তম উপজাতি ও সমগ্র উগাণ্ডার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ, তবে এই ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে। কেনিয়ার উপজাত রাজনীতিতে 'কানু' (কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল

ইউনিয়ন) ও 'কাডু'র (কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন) বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে। জাঞ্জিবারে আরব-আফ্রিকান বিভেদ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অংশগ্রহণ করছে। ট্যাঙ্গানাইকার আফ্রিকান নেতৃত্বের ঐক্যের একমাত্র তুলনা মেলে নায়াসাল্যাণ্ডে। কিন্তু নায়াসাল্যাণ্ড ট্যাঙ্গানাইকার তুলনায় খুবই ছোট দেশ। তাছাড়া ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক ঐক্য শুধু আফ্রিকানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সীভূলিয়াস নিয়েরেরে ও 'টানু'র নেতৃত্ব ভারতীয় ও ইওরোপীয়েরা পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। এমন সমর্থন নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান নেতা হেস্টিংস বাণ্ডার ভাগ্যেও জোটেনি। তাই, সব মিলিয়ে ট্যাঙ্গানাইকা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার নেতৃত্ব দিতে পারে এবং এদেশের অপেক্ষাকৃত সম্প্রীতিময় বর্ণসম্পর্ক এই বিরাট এলাকার পক্ষে আশীর্বাদের মতো হবে।

আফ্রিকান জাতীয় ইওরোপীয় গোঁড়ামিকে অন্য দেশে সম্প্রসারিত করার সুযোগও বর্তমান। পূর্ব আফ্রিকার নেতারা সেখানকার বিভিন্ন দেশ নিয়ে এক পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন। কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার নেতারা এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। উগাণ্ডার বাগাণ্ডা নেতৃত্ব সে দেশের অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে এক রাষ্ট্র গঠন করতেই গররাজী। অতএব, পূর্ব-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা ওঠে না। তবে উগাণ্ডার কোনো কোনো অ-বাগাণ্ডা নেতা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

ভবিষ্যতের যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান পূর্ব আফ্রিকান হাই কমিশন। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী। অবশ্য এর আগে, এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে (যথা, দেশরক্ষা, ডাক ও তার, শুল্ক ও আবগারী, আয়কর, বিমান-পরিবহন, মুদ্রা, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি) কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানাইকার জন্য সাধারণ শাসন প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু ১৯৪৮ সালেই পুরোদস্তুর পূর্ব-আফ্রিকান আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হল। এবং ৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাই কমিশনের এক্তিয়ারে-আনা বিষয়গুলির শাসনভার পেলেন। এর সঙ্গে বোধহয় পূর্ব-আফ্রিকান আপীল আদালতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯০৯ সালে আদালত স্থাপিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর এক্তিয়ার এডেন, উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার,

ট্যাঙ্গানাইকা, সেচেলেস দ্বীপ ও বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন অবশ্য শেষোক্ত দেশ স্বাধীন সোমালিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্ব-আফ্রিকান আপীল আদালতের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে।

সে যাইহোক, আইন প্রণয়ন, বিচার ও কার্যনির্বাহী এই তিন বিভাগেই পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এখনই চালু রয়েছে। অতএব, প্রচলিত ব্যবস্থাকে অল্প স্বল্প পরিবর্তিত করে এক পূর্ণায়তন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হওয়ার কথা নয়।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠন মিলে এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে যার সংক্ষিপ্ত নাম হল প্যানমেকা। পি. এ. এফ. এম. ই. সি. এ.: প্যান আফ্রিকান মুভমেণ্ট অফ ইষ্ট অ্যাণ্ড সেনট্রাল আফ্রিকা। অর্থাৎ পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার একীকরণ আন্দোলন)।

এই আন্দোলনে কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার সোৎসাহ সমর্থন আছে একথা আগে বলা হয়েছে। উগাণ্ডার নেতৃত্ব কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। যদিও ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে জাঞ্জিবারের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে যুক্ত, তবু সেখানকার আরব সুলতান ও অভিজাতেরা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে জাঞ্জিবারের অন্তর্ভুক্তি সুনজরে না দেখতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের পক্ষে জাঞ্জিবারকে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এবং খুব সম্ভবত সে চেষ্টায় তারা সাফল্যলাভও করবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার সমর্থন আসছে নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের কাছ থেকে। এই ছোট্ট দেশটি বহু-বিতর্কিত মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অংশীদার (অন্য দুই অংশীদার হল উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া)। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি, আফ্রিকানরা অনেক বেশি অনাচার ও বৈষম্যনীতির শিকার। তাই নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকানরা দাবি করেছে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেবার। বেশ কিছু ইওরোপীয় বাসিন্দা থাকায় উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নায়াসাল্যাণ্ডের সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা নগণ্য। উত্তর রোডেশিয়ার মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদও সেখানে নেই। তাই নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান অগ্রগতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। নায়াসাল্যাণ্ডের পক্ষে পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি যুক্তি

পাওয়ায় নামিল। তাই এখানকার আফ্রিকান নেতারা নায়াসাল্যাণ্ড সহ পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছেন। অনুমান করা শক্ত নয় যে কেনিয়ার আফ্রিকানদের সমর্থনের পেছনেও অনুরূপ মনোভাব রয়েছে। কেনিয়া হল 'শ্বেত' ঔপনিবেশিকদের শক্ত ঘাঁটি: সংখ্যায়, সমগ্র অধিবাসীর শতকরা-অনুপাতে, জমির মালিকানায়, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এবং রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতায়। একলা হাতে লড়ে প্রতিক্রিয়ার এই ঘাঁটিকে উৎখাত করতে কেনিয়ার আফ্রিকানদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলির আফ্রিকানদের সহযোগিতায় এ কাজ সহজতর হবে তাতে সন্দেহ কী? প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র শুধু সেই সহযোগিতাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবে মাত্র।

তিন

টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা আর একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: তা হল সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু অবস্থা। আজ আফ্রিকার অধিকাংশ স্বাধীন হয়েছে। পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি, আলজেরিয়া, উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া, নায়াসাল্যাণ্ড, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি স্পেনীয় পকেট, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুটোল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ড ছাড়া অন্য সব দেশ স্বাধীন হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। উগাণ্ডা আগামী বছরে স্বাধীনতা পাবে বলে ঠিক হয়েছে। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির স্বাধীনতাও আসন্ন। পূর্বোক্ত তালিকায় অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের নামও যোগ করা যায়, কারণ আন্তর্জাতিক আইনের বিধানে সে দেশ স্বাধীন হলেও সেখানে আফ্রিকানরা কোনো ক্ষমতা পায়নি। আর উল্লেখ করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন শাসিত দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার, যার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউনিয়ন সরকারের সঙ্গে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বহুদিন যাবৎ বাদ-বিতণ্ডা চলছে।

এতগুলি দেশে আফ্রিকানরা এখনো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বঞ্চিত হলেও যেসব দেশে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে তাদের তালিকা হবে বৃহত্তর, তাদের আয়তন ও লোকসংখ্যা হবে আরও বেশি। এ সব দেশের বেশির ভাগ স্বাধীনতা পেয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে এবং আগামী কয়েক

বছরে আলজেরিয়া, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, নায়াসাল্যাণ্ড ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির ভাগ্য নির্ধারিত হবে বলে আশা করা যায়। একদিক দিয়ে বলা যায়, ঘানা পশ্চিম আফ্রিকায় যে প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করে, পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকা থেকে সেই প্রক্রিয়ার শুরু। পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা ও পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকার অবস্থার তুলনা করার ইচ্ছা একেত্রে স্বভাবত আসে। উভয়তঃ আমরা এমন দেশের উল্লেখ করছি যে দেশ সমগ্র অঞ্চলের স্বাধীনতার পুরোধা। দুই দেশেই আমরা বিশেষ রকমের যোগ্য নেতৃত্বের (দলীয় ও ব্যক্তিগত) পরিচয় পাই।

এইখানেই কিন্তু এদের সাদৃশ্যের পূর্ণচ্ছেদ। ঘানা ও ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভিন্ন। ঘানা ছিল বৃটেনের গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ, ট্যাঙ্গানাইকা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে বৃটেন-শাসিত অছি-অঞ্চল। ঘানার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য বহু পুরাতন : ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ফান্তি কনফেডারেশন' থেকে তার জন্ম। ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু মাত্র কয়েক বছর আগে। এদেশের প্রথম ও অধুনা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল 'টানু'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৪ সালে। ঘানার রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক সময় শাসনতন্ত্র-সম্মত পথে না গিয়ে জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে (যথা এনক্রুমার নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের সারাদেশব্যাপী ধর্মঘট, যখন এনক্রুমাসহ বহুলোককে গ্রেপ্তার করা হয়)। পক্ষান্তরে ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে মসৃণ। প্রতিবাদ, ধর্মঘট ও জনবিক্ষোভের পথে 'টানু' বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে কখনও নামতে হয়নি। ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়ের কথা মনে রাখলে এই অবাধ ও অকুণ্ঠচিত্ত রাজনৈতিক প্রগতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনোত্তর রাজনীতিতেও এই দুই দেশের পার্থক্য দেখা যাবে বলে মনে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমবায়ে এক বৃহত্তর রাষ্ট্রগঠন এনক্রুমার স্বপ্ন ছিল। প্রস্তাবিত ঘানা-গিনি-মালি ইউনিয়ন গঠন অবশ্য সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের দিকে এক ধাপ অগ্রগতি। কিন্তু এনক্রুমার যতটা আশা ছিল তার সামান্য অংশই কার্যকরী হয়েছে। এর একটা বড় কারণ, ঘানার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিকাংশ হল ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশ এবং সে হিসাবে তাদের সরকারী ভাষা, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক ধারা পর্যন্ত ভিন্নধর্মী। এক অসাধারণ

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঘানা-গিনির সংযুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। পরে অবশ্য মালি প্রজাতন্ত্রের নামও এর সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু বাস্তবে তিনটি দেশের সাধারণ শাসন কাঠামো স্থাপনের কাজ বিশেষ এগিয়েছে বলে জানা যায়নি। এর তুলনায় পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা সহজতর হওয়া সম্ভব। এ সব দেশের সমস্যা অনেকখানি এক ধরণের। এদের রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি একখাতে বয়ে গেছে। এরা সকলেই ছিল বৃটিশ-শাসিত উপনিবেশ, আশ্রিতরাজ্য কিংবা অছি অঞ্চল। এবং সবচেয়ে বড় কথা এদের অনেকের ঘনিষ্ঠ সহযোগের ভিত্তিতে গঠিত ইস্ট আফ্রিকা হাই কমিশন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ চালাচ্ছে। তাই স্বাধীনোত্তর কালে ট্যাঙ্গানাইকার পূর্ব আফ্রিকা একীকরণের প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অনেকখানি থাকবে।

এসব পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের পূর্বেকার বক্তব্য এখনও বলবৎ আছে। অর্থাৎ ঘানার স্বাধীনতা যেমন পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তেমনি পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশের অগ্রগ। পরোক্ষভাবে বলা যায়, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে পূর্ব আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীরে এই প্রথম ফাটল ধরল (বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ও সুদানকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না)। এবং এই ফাটল যে আরো বেড়ে গিয়ে অন্য দেশকে গ্রাস করবে সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ট্যাঙ্গানাইকা অবশ্য কেনিয়া, উগাণ্ডা কিংবা জাঞ্জিবারের মতো বৃটিশ-শাসিত অঞ্চল ছিল না। আন্তর্জাতিক আইনে ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক অবস্থাকে অছি-অঞ্চল বলা হবে: এমন অঞ্চল যার শাসন পরিচালনা ছিল বৃটেনের হাতে, কিন্তু যার শাসন কর্তৃপক্ষকে তত্ত্বাবধান করার ও উপদেশ দেবার ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ছিল। ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এই অছি-ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচারের সুযোগ দিচ্ছে।

অছি-ব্যবস্থাকে ভালো করে বুঝতে গেলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে তার ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে তেমনি তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট সম্পর্কেও পরিপূর্ণ অবহিত থাকা দরকার। অছি-ব্যবস্থার পূর্বসূরী ছিল ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা। প্রথম মহা-যুদ্ধের পর জার্মান ও তুর্কী উপনিবেশসমূহ নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে প্রচুর

তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হয়। কতকগুলি দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও অস্ট্রেলিয়ায় ঐ সব উপনিবেশ সরাসরি দখল করার পক্ষে ছিল। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি উইলসনের নেতৃত্বে আর একদল তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে এক রকমের আপোষ হয় ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

পরাজিত শত্রুর উপনিবেশগুলি বিভিন্ন বিজেতাশক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। স্থির হল, এদের শাসন পরিচালিত হবে লীগ অফ নেশন্সের তত্ত্বাবধানে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার অসম মানের জন্য এ সমস্ত উপনিবেশকে (যাদের নাম হল ম্যাণ্ডেট বা 'ন্যাস' অঞ্চল) তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। 'ক' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট : যে সব দেশের অধিবাসীরা অল্প দিন বাদেই স্বাধীনতা আশা করতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়। ভূতপূর্ব তুর্কী সাম্রাজ্যের আরব-অধ্যুষিত উপনিবেশগুলি এই শ্রেণীতে পড়ল [সিরিয়া-লেবানন (শাসক : ফ্রান্স), প্যালেস্টাইন ও ইরাক (শাসক : বৃটেন)]। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া জার্মানীর অন্য সব আফ্রিকান উপনিবেশ 'খ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট পর্যায়ে পড়ল। কয়েকটি মৌলিক নীতি অনুসারে এখানকার শাসনকার্য পরিচালিত হবে বলে ঠিক হল। এই 'খ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট শাসনের প্রবর্তন করা হয় নিম্নলিখিত দেশসমূহে : বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী টোগোল্যাণ্ড, বৃটিশ ক্যামেরুন্স, ফরাসী ক্যামেরুন্স, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি (শাসক : বেলজিয়াম) এবং ট্যাঙ্গানাইকা (শাসক : বৃটেন)।

এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'মিত্রপক্ষীয়' নেতারা 'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট বলে বর্ণিত করলেন। শাসক দেশগুলি এইসব অঞ্চলকে নিজ দেশের অংশ হিসাবে শাসন করতে পারবেন বলে ঠিক হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনে বিশ্বজনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেছে বলে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাকে অভিনব আখ্যা দেওয়া যায়। একথা ঠিক যে, লীগ অফ নেশন্স তথা স্থায়ী ম্যাণ্ডেটস কমিশনের ক্ষমতা ছিল অতিমাত্রায় সীমিত। বলতে গেলে শুধুমাত্র উপদেশ দেবার ও সমালোচনা করবার অধিকার তাদের ছিল। তবু বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়। এবং এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে লীগ অফ নেশন্সের সমালোচনায় ম্যাণ্ডেট শাসক তার নীতি বদলিয়েছে। অতএব ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রবর্তকদের বৈপ্লবিক

পরিকল্পনা কিংবা বিশ্বপ্রেমী সদিচ্ছা ছিল একথা বলা না গেলেও, এ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক জগতে কোনো পরিবর্তনই আনেনি এমন যুক্তি দিয়ে একে নস্যাৎ করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লীগের অপমৃত্যুর আগেই একটি ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চল (ইরাক) রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা পায়। যুদ্ধোত্তর কালে বাকি 'ক' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটগুলিও স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হল। অন্য ম্যাণ্ডেট-শাসিত দেশগুলি (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া) নিয়ে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অধীনে অছি-ব্যবস্থার শুরু। ১৯৪৬ সালে অছি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নিম্নলিখিত অছি-অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে :

বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড : ১৯৫৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘানার সহিত সংযুক্ত।

ফরাসী টোগোল্যাণ্ড : ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।

ফরাসী ক্যামেরুন : ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।

বৃটিশ ক্যামেরুন : উত্তরাংশ স্বাধীন নাইজেরিয়ার সঙ্গে ও দক্ষিণাংশ স্বাধীন ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রের (পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরুন) সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

সোমালিল্যাণ্ড : অছি-অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র এই দেশটি ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতালীর পরাজয়ের পর ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডকে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সালে এ দেশটি স্বাধীনতা পায়।

রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি : শীঘ্রই স্বাধীনতা পাবে বলে স্থির হয়েছে।

ট্যাঙ্গানাইকা : ৯ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা পেল।

সামোয়া : আগামী বছরে স্বাধীনতা পাবে।

ট্যাঙ্গানাইকা ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির স্বাধীনতা লীগ পরিচালিত 'খ' শ্রেণীর সমস্ত ম্যাণ্ডেটের স্বাধীনতা সমাধা করবে।

'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট-অঞ্চলগুলি অবশ্য এতটা ভাগ্যবান নয়। এদের মধ্যে একমাত্র পূর্বোক্ত দেশ সামোয়ার স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হয়েছে। নাউরু (অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড ও বৃটেনের পক্ষে শাসন পরিচালনা করে অস্ট্রেলিয়া) ও পূর্ব নিউগিনির (শাসক : অস্ট্রেলিয়া) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু বলা মুস্কিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অছি-অঞ্চল (ক্যারোলিন, মার্শাল ইত্যাদি

দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত) লীগ অফ নেশন্সের আমলে জাপানের শাসনাধীনে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে এই অঞ্চলটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীর অছি-দেশে (স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া) রূপান্তরিত করে। এর শাসনভার দেওয়া হয়েছে আমেরিকান সরকারের হাতে এবং এর ওপর সম্মিলিত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান-ক্ষমতা কিছুটা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে এই অঞ্চলটা প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ কী হবে বলা যায় না। বাকি থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন এই দেশটিকে অছি-ব্যবস্থার মধ্যে আনতে অনিচ্ছা জানিয়ে একে নিজের 'পঞ্চম-প্রদেশ'-এ (ইউনিয়নে মোট ৪টি প্রদেশ আছে) পরিণত করতে চেয়েছে। সম্মিলিত জাতিসংঘ এতে আপত্তি জানালেও ইউনিয়ন সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি।

এই গেল অছি-অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক প্রগতির খতিয়ান। ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আসে মোট ১৫টি দেশ। এর মধ্যে এতদিন পর্যন্ত পরাধীনতা-মুক্ত হয়েছে ৮টি দেশ। ট্যাঙ্গানাইকা সহ আরও তিনটি দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। বাকি থাকে মাত্র ৪টি অঞ্চল, অদূর ভবিষ্যতে যাদের স্বাধীনতা-অর্জনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যদি ধরে নেওয়া যায়, শুধুমাত্র কিংবা প্রধানত অছি ও ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থার কল্যাণে পূর্বোক্ত দেশগুলির স্বাধীনতা এসেছে, তবে লীগ ও সম্মিলিত জাতিসংঘের পক্ষে তার চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে।

দুঃখের বিষয়, এমন কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থা অবশ্যই উল্লিখিত দেশগুলির স্বাধীনতা-অর্জনে কিছুটা সাহায্য করেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সমর্থন এসেছে অন্যস্থান থেকে। অথবা ভাষান্তরে বলা যায়, যে শক্তির প্রভাবে গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ সারা পৃথিবীর পরাধীন অঞ্চল সমূহ নিজ নিজ আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জন করছে, তারই এক প্রকাশ হল ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থা। এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয় যে, যে সময়ে মোট ৮টি ম্যাণ্ডেট বা অছি-শাসিত অঞ্চল স্বরাজ পেল, সে সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত) দুই ডজনেরও বেশি উপনিবেশ (যারা ম্যাণ্ডেট বা অছি-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না) স্বাধীন হয়েছে? একথা অবশ্য ঠিক যে ইরাক ১৯৩২ সালে ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়, কিন্তু তাতে লীগ অফ নেশন্স-এর কতটা হাত ছিল তা বিতর্কের বিষয়।

একথা ঠিক যে, সোমালিল্যাণ্ড অছি-অঞ্চল ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পাবে বলে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ স্থির করে। কিন্তু এর পেছনে বড় কারণ যে সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ, সেকথা সুবিদিত।

ইচ্ছা থাকলেও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ যে কোনো অছি-অঞ্চলের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে পারে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে টাঙ্গানাইকার ইতিহাস থেকে। ১৯৫৪ সালে ট্যাঙ্গানাইকায় জাতিসঙ্ঘপ্রেরিত এক মিশন প্রস্তাব করে, এই অছি-দেশটিকে ২০ বছর বাদে স্বাধীনতা দেওয়া হোক এবং শাসক-রাজ্য বৃটেন এই উদ্দেশ্যে রীতিমত এক পরিকল্পনা তৈরি করে সেই পরিকল্পনা-অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকুক।

জাতিসঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রস্তাব রীতিমত অভিনব। সম্ভবত যারা পৃথিবীর মানুষদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভর দেখতে চায় তারা প্রায় সকলেই একে অভিনন্দন জানান। প্রতিবাদ আসল কয়েকটি উপনিবেশ-শাসনকারী দেশ এবং বিশেষ করে বৃটেনের কাছ থেকে। সেই প্রতিবাদে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হল। এই ঘটনা ঘটেছে ১৯৫৮-৫৫ সালে এবং পূর্বোক্ত প্রস্তাব-অনুসারে ১৯৭৫ সাল ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বছর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আফ্রিকায় 'পরিবর্তনের হাওয়া' (না ঝড় ?) বয়ে গেছে। ১৯৫৫ সালে মাত্র বৃটিশ শাসকদের মনে হয়েছিল ১৯৭৫ সাল বড় বেশি কাছে। কয়েক বছর যেতে না যেতে সকলের (এমন কি বৃটিশ শাসকদেরও) মনে হল ১৯৭৫ সাল বড় বেশি দূরে।

উপরিউক্ত উদাহরণটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা সরলীকরণে যথার্থ সাহায্য করে। এর থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি : সাধারণভাবে সমালোচনা ও সুপারিশ করা ছাড়া অন্যভাবে অছি-অঞ্চলের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা জাতিসঙ্ঘের সাধ্যায়ত্ত হয় নি; এবং এতদুদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘকৃত কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে অছি-শাসকেরা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় ঘুরেছে যে অছি-অঞ্চল ও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার আয়োজন করতে হয়েছে। অবশ্য উল্লিখিত আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জাতিসঙ্ঘে যথাযথভাবে প্রতিফলন হওয়া স্বাভাবিক : জাতিসঙ্ঘে যা সমালোচনা হয়, তা সমস্ত রাষ্ট্রের

করে থাকে। প্রস্তাব যা ওঠে, তা আসে সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাও নির্ধারিত হয় সদস্য রাষ্ট্রের ভোট অর্থাৎ মতামত দ্বারা। অতএব আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে অছি-পরিষদ ও জাতিসঙ্ঘকে পৃথক করে বিবেচনা করা ভুল হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে অছি-ব্যবস্থা হল মহাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক নীতিগুলির প্রতিষ্ঠানগত রূপমাত্র। আর সেক্ষেত্রে, জাতিসঙ্ঘের সমালোচনা ও সুপারিশকে বলা যায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার ব্যারোমিটার।

তুলনাটা অবশ্য যত মুখরোচক, ততটা যথাযথ হল না। ব্যারোমিটারের পারা আবহাওয়ার সূচকমাত্র। তার উর্ধ্ব বা অধোগতি আবহাওয়াকে কোনো অংশে প্রভাবিত করে না। জাতিসঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা এমন কথা বলতে পারি না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় জাতিসঙ্ঘের আলাপ-আলোচনা, বাদ-বিতণ্ডা, সুপারিশ প্রভৃতি থেকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর এদের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। অর্থাৎ এ হল এমন এক ব্যারোমিটার যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে সেই পূর্বাভাসের মারফৎ আবহাওয়াকে কিছুটা পরিমাণে রূপান্তরিতও করে থাকে। আর যে পরিমাণে এই রূপান্তরণ ঘটে, সেই পরিমাণে জাতিসঙ্ঘ বিশ্বরাজনীতির নিরপেক্ষ ব্যারোমিটারের কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়।

অছি-অঞ্চলগুলির স্বাধীনতায় জাতিসঙ্ঘের অবদান সম্পর্কে এই হল আমাদের নিবেদন।

চার

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা গেল।

আমাদের প্রথম বক্তব্য ছিল, ট্যাঙ্গানাইকান-ভারতীয় সম্পর্ক আমাদের দেশের সঙ্গে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সম্পর্কের চাবিকাঠি। এবং আজ যদি আমরা ট্যাঙ্গানাইকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে আগামীকাল এর প্রভাব গিয়ে পড়বে অন্যান্য দেশের ওপর। এমন প্রভাব ট্যাঙ্গানাইকা থেকে অন্যত্র সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, কারণ পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার নেতৃত্ব অনেকাংশে ট্যাঙ্গানাইকার হাতে আসবে।

বর্তমান প্রবন্ধে এ-কথাও বলা হয়েছে যে ট্যাঙ্গানাইকান-ভারতীয় সম্পর্ক বিঘ্নিত হবে যদি প্রথমোক্ত দেশে আফ্রো-ভারতীয় প্রতিযোগিতা প্রকৃত সংঘর্ষের রূপ নেয়। অতএব, শুধু ট্যাঙ্গানাইকা-প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্যই নয়। এদেশের সঙ্গে সারা মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সুসম্পর্ক বজায় রাখবার জন্যও বটে, ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণসম্পর্ক সুপথে চালিত করতে হবে।

এই প্রবন্ধের অন্যতম সিদ্ধান্ত হল এই যে, ঘানার স্বাধীনতা যেমন সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক মুক্তির অগ্রদূত ছিল, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তেমনি মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার মুক্তিদূত। কিন্তু ঘানার পক্ষে পশ্চিম আফ্রিকায় এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যত না সহজ হয়েছে, ট্যাঙ্গানাইকার পক্ষে মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন তার চেয়ে কম কষ্টসাধ্য হওয়া সম্ভব।

আফ্রিকা তথা পৃথিবীর রাজনীতিতে এ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবং ভারতবর্ষের পক্ষে এ সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা কি নতুন করে বলতে হবে? পূর্ব-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র হবে আয়তনে ভারতবর্ষের অর্ধেক এবং আরব সাগরকে বাদ দিলে একে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলা চলে। এই দেশে থাকবে তিন চারটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর—মোম্বাসা, দার-এস-সালাম, জাঞ্জিবার। অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এমন অধিবাসীবৃন্দ যাদের উজ্জ্বল প্রাণশক্তি, কর্মোৎসাহ ও স্বভাবজ বুদ্ধি এক সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে।

সর্বশেষে ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা পরাধীন দেশগুলির মুক্তি প্রক্রিয়ায় অছি-ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ট্যাঙ্গানাইকা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম অছি-অঞ্চল। এ দেশের স্বাধীনতার পর আফ্রিকায় আর একটি মাত্র দেশ, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, অছি-ব্যবস্থার মধ্যে রইল। আর এই দেশটির স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অছি-ব্যবস্থার জন্য কতখানি তা বিতর্কমূলক। অছি-ব্যবস্থা তথা সারা জাতিসঙ্ঘকে, বিশ্বরাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অবিধেয়। কারণ বিশ্বরাজনীতির সর্বজনগ্রাহ্য মূলসূত্রের সাংগঠানিক রূপ হল জাতিসঙ্ঘ। অথচ, এই জাতিসঙ্ঘই আবার বিশ্বরাজনীতির অন্যতম কোরাম। তাই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মারফৎ জাতিসঙ্ঘ অছি-শাসিত দেশগুলির স্বাধীনতা কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে বলতে হবে। কিন্তু শেষ বিচারে আত্মপ্রত্যয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামগ্রিক ধারাই যে পরাধীন জগতে 'পরিবর্তনের 'ঝড়' বইয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি সে পরিবর্তনের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কর্তার ভূত

বিষ্ণু দে

কেন এ ভূতের ভয়? কর্তার-ভূত-কে
বলো না সাবেক-সুরে: ভূত মোর পুত্।
কি হবে হরদম এই রামনাম বলে?
যদিই কর্তা আজও লাফ দেন পুঁটকে
অথবা মচ্‌কে ঘাড়ে, বলো তো তাহলে
সমুদ্রপারের কোন্ সাহেব অদ্ভুত
আংরেজি মন্তরে আজ নামাবে ভূতকে?

সে কবে মিশেছে তার শ্মশানের ছাই
সারাটা দেশের সারা বিশ্বের মাটিতে।
ফুঁ দিলেই উড়ে যায়, এত ঘটা ক'রে
কাকে যে তাড়াও তুমি তাড়োয়াল ভাই রে।
হাওয়াকে ভড়পে তুমি বছরবছরে
ভাবো কি গলিয়ে দেবে গলির ঘাঁটিতে?
রাম বা লক্ষ্মণ কবে খুঁটে খায় ছাই?

ছাড়ো এ ভূতের খেলা, ঘাটে বা কবরে
কর্তার টিকিও নেই, গোরস্থান ভুলে
ভূতকে পাবে না, ভূত ছেড়ে বলো কানে
রামনাম সৎ হায়, সত্তার জোরে

দেখবে ভূতের ভয় সোজা যাবে ভুলে
কারণ ভূতের মাথা তোমারই গর্দানে।
ভূত কি থাকে রে বোকা, শ্মশানে কবরে ?

খেয়াখেয়া ছেড়ে দিয়ে বলো সোজাসুজি
চাও সুখ চাও স্বস্তি সচ্ছল আরাম।
তবেই দেখবে কর্তা নিজেই কবরে
পাশ ফিরে নিরুদ্দেশ, এবং যা বুঝি,
দুনিয়ার সব লোক তোমায় স্মরবে
নিশ্চয় ফেলবে হাফ—আরে রাম রাম!
আমরাও ওরে দাদা সুখ স্বস্তি খুঁজি।

শতাব্দীর অস্থি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর পূত অস্থি সংরক্ষিত মনন-কৌটায়
ছয়ঋতু পরিক্রমা ছয় দিক সকাল-সন্ধ্যায় ;
কালস্পর্শী অন্ধকারে চলে ফেরে ক'জন সৈনিক,
শিরস্ত্রাণ শুভ্রশির বর্মহীন তার চতুর্দিক।
সুদীর্ঘ চত্বরে তারা, আত্মমগ্ন, দুরন্ত উজ্জ্বল
বিস্ফারিত, আদিগন্ত খরস্রোত, জল ছলছল
বহে যায় ইতিহাস বর্ষে বর্ষে, নিষ্করুণ স্থির ;
পালটায় মানচিত্র, শতাব্দীর মন···শতাব্দীর।

প্রাচীন অক্ষরে লিপ্ত অস্থিলিপি, জন্মের সংস্কার ;
দিনরাত্র ধূসরতা স্তূপে স্তূপে পর্বত-প্রবাল,
ব্যাধি সাধ আজন্মের, ক্ষুদ্র ইচ্ছা, হৃদয়ের ভার
তীব্র স্রোতে বহমান, বর্ষে বর্ষে সেই লিপিকাল
যাদুঘরে, পাঠোদ্ধার, ক'খণ্ড শিলায় বিন্যাস,
ক'জন সৈনিক এই শতাব্দীর পূতঅস্থিনাশ !

তিমিরায়ণ

শেখ আব্দুল জব্বার

দুর্জ্ঞেয় মহারাত্রে আলোর বিনাশ চেয়ে হত, ক্লান্ত মানুষের যে-সব শ্বাপদ্য
আজো এই পৃথিবীর বুক জুড়ে আছে—
তাদের সবার মুখে নশ্বরতার রেণুই প্রসাধিত, আর
সব মূঢ়-জড়তার সীমার বাইরে যে বোধের আকার—
প্রবাল দ্বীপের মতো জেগে উঠেছিল ;
আজো যাকে ডুবিয়ে রেখেছে তলে সময়ের সমুদ্রের অন্ধকার ঢেউ

যে সব সত্যের দিকে মুখ রেখে আজো যাকে বলি আমরা
আরাধিত, এই সেই তিমির হন্তারক আলো—
সেই চেতনারও 'পর দেখিয়াছি বারবার শূন্যতার
তির্যক, বর্শার ফলার মতো নক্ষত্রের আঁধির ভিতরে
তিমির বিলাসী সব মানুষ-কীটেরা খেলা করে—সংক্রান্তির লগ্ন চেয়ে
মহাউত্তরায়ণের সীমান্ত রেখায়…
যদিও কোথাও আজো নব ধ্রুব আছে, এর-ও অন্ধকার আছে জেনে
তার চোখ কোনো দিন স্থির হয় নাই, অবিরাম পেয়ে পেয়ে পর্যটনের ঢের
অপার বিস্ময়

পৃথিবীর এই সব মহামূঢ় শিকারীর মতো তিমির হননে অগ্রসর—
আবিশ্ব বিপর্যয় ও ব্যর্থতার ঘোষণায় সূচিত মূল্যরা—বারবার ভেঙে ভেঙে
চুরমার হয়ে গেছে,
নিজের আদল আর মুখোশ হারিয়ে ফেলে অদ্ভুত সুন্দর হতে—
সূর্যের অন্ধকারে তুমুল জটিল এই পৃথিবীর মতো ;
যেখানের চেতনায় স্থাবর নৈরাজ্যে আত্মবিনাশের মতো মানুষের ভাষা
অযথার্থ বিলোপের গুহার গভীরে শঙ্কিত হতে হতে স্থির হয়ে যায় ;—

আর অম্লান আনে নাটকের তৃতীয় অংকের প্রথম আলোর
জ্যোতির্ময়,
যার মুখ পানে চেয়ে নড়ে ওঠে মহাবিশ্ব প্রগাঢ় আশ্বাসে
অস্ত কোনো মহাতিমিরায়ণের সূচনার বোধে।

কেননা আমরা গান শুনব

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে আমরা গান শুনব। প্রৌঢ় বৃক্ষেরা
বিমর্ষ, শুভ্রতা হারিয়ে পাহাড় বিষণ্ণ, বাতাস মুমূর্ষুর শ্বাস ;

কয়েকটি সুন্দর হরিণ, স্বর্গীয় পাখি এবং একটি কোমল বৃক্ষশিশু
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ;

দূরে শববাহকের ধ্বনি,
শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের মিছিলের মতো বাতাস

কয়েকটি মৃত হরিণ, নিহত পাখি এবং একটি ছিন্নমূল বৃক্ষশিশুর
শিয়রে আমরা বসে আছি
কেননা সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে আমরা গান শুনব।

স্ট্রাইকের পর

কালিদাস দত্ত

সুব্রত চৌধুরী লিস্টটা তৈরি করে উঠে দাঁড়াল। লিস্টের ওপর শেষবার দ্রুত চোখ বুলোতে বুলোতে কলিং বেল টিপল। বেয়ারা এল না। "বেয়ারা" বলে চেঁচিয়ে উঠবার পূর্ব মুহূর্তে মনে পড়ল বেয়ারা নেই, আসবে না। "ইডিয়ট্‌স্। ওয়েট, আ' উইল টিচ্ য়্যু এ গুড লেসন্"—বিড় বিড় করে আওড়াল—"শুয়োরের বাচ্চা"।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিস্টটা সেন্ট্রির হাতে দিল, "এটা গেটে টাঙিয়ে দাও, জলদি।"

মাথাটা ঝিমঝিম্ করছিল। চারদিন চার রাত ঘুম নেই, প্রায়-নেই আর কি। বন্দী হয়ে আছে এই কামরায়—অফিস বিল্ডিং-এ। স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়েছে, এখন বাঁচলে হয়। টয়লেট রুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল, আয়নায় তাকাল। চেহারাটা শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে আরও গাঢ় হয়ে কালি জমেছে, অত্যাচারের মাত্রা একটু বেশি হয়েছে। শরীর তো! চুলে চিরুনি বুলিয়ে বাসি নেকটাইটা ঠিক করল।

এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গাঙ্গুলি আর একটা শুয়োরের বাচ্চা, ওর বাবাও শুয়োরের বাচ্চা ছিল—অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরী তার 'বস্' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করল। কাল রাতে স্পেশাল গার্ডের এসকর্টে গাঙ্গুলি বাড়ি গিয়েছিল। কি? না, ভয়ঙ্কর জরুরি দরকার: চৌধুরি, আমি ভোর হবার আগেই চলে আসব। তুমি একটা ডিসচার্জ লিস্ট তৈরি করো। দেখো, আমি যাচ্ছি, কেউ যেন না জানে। মিসেস গাঙ্গুলি ভয়ঙ্কর অসুস্থ, তিনবার টেলিফোন করেছে।

ভোরের নাম করে আজ বেলা দশটায় এসেছে। কী? না, এই বুড়ো বয়েস সে নতুন বিয়ে করেছে, আমি ব্যাচেলর। কিন্তু আমার ইয়ে তোমার চাইতে কিছু কম নয়। আমিও চার দিন চার রাত কিনতাকে দেখিনি, ছুঁই নি। ভাগ্যিস মিসেস সান্ন্যাল হাতের কাছে ছিল। বিপদ্‌সিন্ত মিসেস

সান্যাল। কুৎসিৎ। ওকে সুবার্বান অফিসে ট্রান্সফার করব। পঁচিশ পার হয়নি, এরই মধ্যে তিনটে বিইয়েছে।

গাঙ্গুলির চেম্বারে এসে বলল, "স্যর, আমি যাচ্ছি।"

গাঙ্গুলি খাচ্ছিল। বললে, "খুব দেরি কোরো না। অবশ্য, একটু ঘুম দরকার। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ফিরো। একজন একজন করে ডেকে স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে, বণ্ড সই করাতে হবে। ওরা গেটের বাইরে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটের মধ্যেই ফিরছো তাহলে, কেমন?"

"দুটোর মধ্যেই ফিরব! যাচ্ছি, স্যর।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরাল। বস্ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তটা দ্বিতীয়বার স্মরণ করল, তারপর ফটকের দিকে এগোল।

"এই, মিঃ চৌধুরী।"

অফিস বিল্ডিংটা নিঝুম, নিস্তব্ধ। বাইরে ছশো সাতশো মেয়ে পুরুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জটলা করছে, চেঁচাচ্ছে। গেটে সদ্য টাঙানো লিস্টটা একে একে দেখছে, বাইরের এক ঝাঁক হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, খিস্তি করছে। একটি রোগা, অ্যানিমিক, ফ্যাকাশে মেয়ে কাঁদছে। ওরা সবাই ভাবছে, আমরা হেরে গেছি, আমাদের এবার কেটে কুচি কুচি করা হবে। পরস্পর পরস্পরকে গাল দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, স্বার্থপরের মতো কেউ কেউ পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে—কেন না ডিসচার্জ লিস্টে নাম নেই—ফিরে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছে বিজয়ী ভঙ্গিতে। শালা, কখন ভেতরে ঢুকতে দেবে কে জানে। ব্যাটা সেন্ট্রি রাইফেল উঁচিয়ে আছে, যেন ওর বাপের জমিদারী।

"এই, মিঃ চৌধুরী রে—"

ওরা মিঃ চৌধুরীকে দেখল, খিস্তি করার ইচ্ছে সত্ত্বেও করতে পারল না, একজন পাশের লোক শুনতে না পায় এমন অস্ফুট স্বরে গালাগালি দিয়ে চার-পাশে ভয়ে ভয়ে তাকাল। স্বার্থপর একজন সবার সামনেই হাত তুলে নমস্কার করল, চৌধুরী দেখল না, পাশ থেকে কে যেন হাতে থুতু লাগিয়ে স্বার্থপরটার মাথায় সজোরে চাঁটি মেরে চট্ করে হাতটা গুটিয়ে নিল, স্বার্থপর বাপ তুলে গালাগাল দিয়ে চতুর্দিকে খুঁজেও 'চাঁটিমার'কে দেখতে পেল না। কিছু জনের মধ্যে অহেতুক নীরবতা এবং কিছু জনের মুখে চোখে উদ্বেগের কালো ভয়ঙ্কর ছাপ—এর মধ্য দিয়ে চৌধুরী কোনো দিকে না তাকিয়ে স্পেশাল গার্ড

দেওয়া মোটরে উঠে ভাবল, বিনতার বাড়ি যাব। যাবই। ফিরে এসে এই স্কাউণ্ড্রেলদের শিক্ষা দেব। ন্যাংটো করে চাবুক মারব, কত ধানে কত চাল হয় টের পাওয়াব। এখন বিনতার ওখানে। বিষ্টি পড়ছে, ওরা ভিজুক, এর পর রোদ উঠলে রোদে পুড়বে, মাল সব তৈরি হয়ে থাকবে, আমি ছাল ছাড়াব আর কাবাব বানাব। দাঁড়াও। তাতানো শিকে নরম মাংস এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে জ্বলবে, ভাজা ভাজা হবে। এখন বিনতার বাড়ি।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দেবার সময় অবশ্য টালার কথাই বলল, কারণ ড্রাইভার বাড়ি চেনে, অফিসের গাড়িতে অন্যত্র গেলে সন্দেহ হবে, দরকার নেই, গাড়িতে বুড়ি ছুঁয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বিনতার বাড়ি আসা যাবে, এখন টালা।

"চৌধুরী একবার তাকাল না পর্যন্ত—ব্যাটার গাট্‌স্‌ আছে।"

"তেল হয়েছে।"

"হবারই কথা, এমন জানলে আমিও—"

"চোপরাও শা—। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।"

"মিস্‌ সেন, আপনি কাঁদবেন না। এত লোক ডিসচার্জড কখনো হয়? ভয় দেখাচ্ছে। আমরা হেরে গেছি কিনা?"

"হেরেছি মানে? আপাতত যুদ্ধ বন্ধ। আবার হবে।"

"আমার খুব ভয় করছে অমরদা। আমাদের যে আর কেউ নেই। বুড়ো বাবা, কচি কচি ভাইবোন—"

"এই তো আমরা আছি, এত জন আছে। ভয় কি সবিতা?"

"রোকো। এখানে, ওই দোকানটার সামনে একটু দাঁড়াও।"

সুব্রত চৌধুরী নামল, দোকানে ঢুকল, বললে, "ক্যামেরাটা হয়েছে? অ্যাদ্দিন আসা হয়নি, ব্যস্ত ছিলুম।"

"হ্যাঁ, স্যর। কবে হয়ে গেছে, ভাবলুম—"

দোকানের ছোকরা স্বত্বাধিকারী আলমারি থেকে ক্যামেরাটা বের করল, তোয়ালে দিয়ে মুছে, লেদার কেসে ভরতে ভরতে বলল, "শাটার-টা একেবারে জখম হয়ে গিয়েছিল, বদলাতেই হল। ভালো হয়েছে, একেবারে নতুনই হয়ে গেল। এত দামী রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা যাকে তাকে দেবেন না স্যর। প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আর কি। না, কুড়ি নয়, পঁচিশই দেবেন, কুড়ির

মনো পাখা গেল না। আপনি দেখবেন কেমন কাজ দেয়, একটু এদিক ওদিক বুঝলে এখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন—"

ঠোঁটের সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে আসছিল। অনেক কষ্টে তাকিয়ে আর একটা দশ টাকার নোট বের করল চৌধুরী, ক্যানেভাটা নিল। পঁচিশ টাকা, তা হোক, লাখ টাকার কাজে লাগবে। বিনতার একটা ফটো তুলব। "দু রোল ফিল্মও দিয়ে দেবেন।" দুটো নোটই বের করল চৌধুরী।

"আবার আসবেন, স্যর। কোথায় ডেভেলপ করান?"

"নিজেই করি। অনেক দিনের কালচার।"

"তবে তো কথাই নেই। তবু দরকার হলে আসবেন। নিন।"

চেঞ্জ নিল, দেখল না, পকেটে রাখল মুঠো করে। "আসব।"

পাশের দোকান থেকে এক টিন সিগারেট কিনে মোটরে উঠল। বলল, "চলো, সোজা টালা।"

মোটরের দরজায় জোরে ধাক্কা দিল। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চৌধুরী বলল, "পাঁচটার সময় এসে নিয়ে যাবে ড্রাইভার।"

ভোরের নাম করে গাঙ্গুলি বেলা দশটায় এসেছে, আমিও দুটোর বলে পাঁচটায় যাব। অক্ষগুলো ততক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তৈরি হোক। চৌধুরী ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে বিনতার কথা মনে পড়ে গেল, বলল, "থাক, তোমাকে আর আসতে হবে না ড্রাইভার। আমি ট্যাক্সি করেই যাব।" এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

"জী সাব।"

সেন্টি সমেত মোটর উল্টোমুখো হয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল।

সুব্রত চৌধুরীর ইচ্ছে হল, ঐ যে দূরে ট্যাক্সিটা আসছে ওইটে করেই বিনতার বাড়ি যায়। ভাবতে ভাবতে সে বাড়িতে ঢুকল, যদিও ভাবল, এ বাড়িতে ঢুকে কি লাভ, এখানেও তো ওরা, মানে ওদের একজন আছে।

"একি, এমন শুকিয়ে গেছিস?"

"এখনই ফিরব, ফিরতেই হবে।"

"সে কি? স্নান কর, খা, একটু জিরো। চেহারা কী হয়েছে!"

"খাব না, অফিসেই খাব, স্নানও অফিসে সেরেছি। শুধু একটু দেখা করে গেলাম। বাপু অফেন করেছে?"

"না, যায় নি। এখন যাচ্ছে। তুই বোস, এখানেই অল্প একটু কিছু নিয়ে আসি। এখুনি বেরুবি বলছিস? বাবা, কী লাটসাহেবের চাকরি তোর। একটু জিরোবার ফুরসৎ নেই।"

মা বেরিয়ে গেলেন। সুব্রত চৌধুরী টিপয়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সেটিতে হেলান দিল। ফিল্মের একটা রোল বের করে ক্যামেরায় 'লোড্' করল। বিনতার জন্য ওর মনটা ছটফট করছিল। একটু কিছু মুখে ছুঁইয়েই উঠতে হবে। বিনতাকে একটা টেলিফোন দিতে বলব, চৌধুরী ভাবল।

"একি, এসব কি? এসব আমি এখন খাব না।"

চৌধুরীর মন ছটফট করছিল বিনতার জন্য। খেতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট। ও ঠিক করে রেখেছিল, বিনতাকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাবে। মায়ের প্রাণ, একেবারে মাছ ভাত নিয়ে হাজির। কি মনে করে প্লেটে হাত ধুয়ে চৌধুরী টিপয়ের ওপর রাখা ভাতের থালায় হাত দিল। চাট্টি খেয়ে নেওয়া যাক, গায়ে বল পাচ্ছি না, চৌধুরী ভাবল, খেলে বল পাব। ক্ষতি আছে না?

"গুয়ার্মনিয়াম তো তোর বন্ধু। একটু ফোন করে ব'লস, রাণু তোর বোন, মায়ের পেটের বোন। রাণু নাকি এখনও বলে নি, কী বোকা মেয়ে।"

"কেন?"

"এই তো মাসখানেকের চাকরি। থাকবে?"

"স্ট্রাইক করার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল? ওর স্ট্রাইকের বন্ধুরা চাকরি রাখতে পারছে না? তাদের মরুক। তাছাড়া ওর চাকরি যাওয়াই উচিত। আমি চাই না আমার বোন সামান্য কেরানীর চাকরি করে। তাতে আমার প্রেস্টিজ থাকে না। ভিন্ন অফিসে হলেই বা কি, জানাজানি হতে কতক্ষণ? চাকরি ওর যাওয়াই ভালো, একটু শিক্ষাও হবে।"

"তুমি তা হলে বাপু ডেকে বলে দাও। ওই তো রাণু বেরোচ্ছে। রাণু, শুনে যা তোর দাদা কি বলছে—"

রাণু বেরোচ্ছিল। এল। দাদাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। অনিচ্ছুক ঘোড়ার মতো।

সুব্রত চৌধুরী হেসে বলল, "তা হলে, রাণু, চাকরি রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরতে হচ্ছে? স্ট্রাইকের বন্ধুরা চাকরি টেঁকাতে পারবে না,

কেমন? কিন্তু, সুব্রামনিয়ামকে আমি জানাচ্ছি না যে সুব্রত চৌধুরীর বাড়িতে একজন মোটাবুদ্ধির স্ট্রাইকার আছে।"

অপমানে, রাগে রাণুর মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, "আমি তো মিঃ সুব্রামনিয়ামকে অনুরোধ করার জন্য কাউকে ধরি নি। চাকরি গেলে আমার যাবে। একটা মাস্টারি অন্তত জুটবে, সে বিদ্যে বাবাই দিয়ে গেছেন। যারা স্ট্রাইকার আমি তাদের শ্রদ্ধা করি, এখনও করি। যারা করে নি, তাদের আমি ঘৃণা করি, এখনও করি, সব সময়ই করব।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চৌধুরী। চিৎকার করে কি বলতে গিয়ে বিষম খেল, আরও ক্রুদ্ধ হল, বলল, "সে রকম ঘৃণিত লোকের বাড়িতে থাকতেও ঘৃণা হওয়া উচিত, নয় কি? এ বাড়ি আমার—আমারই টাকায় তৈরি। তোমার বাবার নয়।"

"ছি, ছি খোকা—"

"থামো। তোমারই জন্য—"

"আগেই যেতাম, এই চারদিন ধরে সেই কথাই ভাবছি। শুধু তোমাদের মাথা কাটা যাবে বলে আদ্দিন যাই নি। এবার যাব। আজই আমার জিনিসপত্তর নিয়ে আমি হোস্টেলে চলে যাব।"

"তুই কি পাগল হলি রাণু?"

"তুমি চুপ করো মা, তুমিই আমার সমস্ত সম্ভ্রমটুকু নষ্ট করেছ।"

রাণু বেরিয়ে গেল। সুব্রত চৌধুরী রাগে হাত ছোঁড়াল।

"তুই কিছু বললি না, বাধা দিলি না?"

"যাবে কোথায়? তুমি ক্ষেপেছ, চাকরি থাকলে তবে তো হোস্টেলে যাবে। চাকরিই থাকবে না।"

আঃ, এই তো মা, এই তো বোন। এতদিন যাদের জন্য তুমি কী না করেছ, আজ অপমান করার সময় তারা এতটুকু ভাবে না। আজ তাদের রুচির সঙ্গে আমার রুচি মেলে না, তাদের নীতিবোধ উচিতবোধ আমাকে ঘৃণা করে। আমিই যাকে বানালুম, সেই আজ আমায় চোখ রাঙায়। না, রাণুকে আমি বানাই নি। ওই একই হল, আশ্রয় তো দিয়েছি। তাছাড়া কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো। আমি মনে মনে ভাবছি, ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। স্যাটুস্ অল।

"মাঈজী নহী-ঁই।"

"কোথায় গেছে?"

"পোস্নী।"

"একাই?"

"জী নেহি। বদ্রীদাস মাহারকো সাথ।"

"বেশ্যা।"

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল এখানে একটু জিরিয়ে যাবে, বিনতাকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাবে। স্নায়ুগুলোর ওপর চাপ চলেছে, একটু রিল্যাকস্‌ড্‌ হয়ে নেবে। বিনতার একটা ফটো তুলবে ভেবেছিল, আর তুলেছে। চৌধুরী ভাবল, বিনতা গৃহস্থ বেশ্যা, হাফ্‌ গেরস্থ, কিন্তু সে যে এত নীচ অ্যাদ্দিন জানতুম না। ছি ছি বিনতা, তোমার ওই হাসি, আদর, মমতা, সহানুভূতি—সবই তাহলে বানানো? সুব্রত চৌধুরীর কান্না পেল। শেষে বদ্রিদাস…

তুমি ফিরে এস, তারপর তোমাকে দেখব। তোমাকে জখম করব। চৌধুরী রুমালে চোখ মুছল। নিজেকে অসহায় শিশুর মতো মনে হল। কেউ কারো নয়। টাকা দিয়ে কাউকে পুরো কেনা যায় না—ইত্যাকার দার্শনিক-তত্ত্বে তার মনটা প্রথমে ভারী পরে ক্রুদ্ধ হল।

"এই, চৌধুরী ফিরল রে—"

"বাব্বাঃ, কি গটমট করে চলছে। রেগে টং ব্যাটা"—

সুব্রত চৌধুরী কোনোদিকে তাকাল না। কোনোদিন তাকায় না, কেন না বস্‌ অফিসার। দোতলায় উঠে গাঙ্গুলির ঘরে গেল। গাঙ্গুলি বললে, "বাঃ, এরই মধ্যে? ছুটোও বাগেনি দেখছি। আই মাস্ট সে সো ছাট ইউ গেট দ্য লিফ্‌ট সুন। এই ছাখো, সেন্ট্রাল থেকে সেই ইনস্ট্রাকশন এসেছে। নিজের ডিসক্রিশন অনুযায়ী সমস্ত ইনডিভিজুয়াল কেস ডীল করবে। তুমিই এখন সুপ্রীম অথারিটি। আমি এই লিস্টটার ইন্টারভিউ নিচ্ছি, তুমি এই লিস্টটা নাও। রিংলিডারদের নাম জানার চেষ্টা করবে এবং এমন দু চারটি কথা বলবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন স্ট্রাইক করার প্রবৃত্তি না হয়। ওদের সাধ মিটিয়ে দিতে হবে, মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়োতে হবে। অ্যাণ্ড হোয়েন দ্যা

কাইণ্ড এ হার্ডনাট, ক্র্যাক ইট কথলেসলি। আই ম্যাস্ট্ সে, তুমি পারবে, ওল্ট্ য়্যু?

"আ'-উইল শ্যুর। পারব। আমাকেই সব লিস্ট দিন, আমিই এবার ইন্টারভিউ নিচ্ছি। আপনি রেস্ট নিন স্যর। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে। য়্যু শুড টেক রেস্ট।"

"একা পারবে?"

"এ আর এমন কি? আপনার আণ্ডারে অনেকদিন আছি, শিখেছি।"

"রাইট। আমার একটু বাড়িও যাওয়া দরকার। আচ্ছা নাও। শুধু মিস চক্রবর্তী, ওই যে রিসেপশনের মিস্ কমলা চক্রবর্তী, শুধু তার ইন্টারভিউটা আমি নেব। ওকে ডাকিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

"আচ্ছা।"

বানচোৎ। মনে মনে উচ্চারণ করল সুব্রত চৌধুরী। তারপর নিজের চেম্বারে চলে এল।

"কান ধরুন।"

ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সুব্রত চৌধুরী ভাবল, যে, এই শুয়োরের বাচ্চারা স্ট্রাইক করেছিল। তুমিই এখন সুপ্রীম অথরিটি—ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এত দিন, এই দশ বছর, এই শুয়োরের দল যা খুশি তাই করেছে। পুঁচকে ছেলে আর পুঁটকে মেয়েরা নাক উঁচিয়ে চলে গেছে, ওদের চুলও ছোঁয়া যায় নি। কারণ, সেণ্ট্রাল বোর্ড ছিল সুপ্রীম অথরিটি, বিচার ওই পর্যন্ত গড়াত। আজ এই হাজার হাজার স্ট্রাইকারের বিচার সেণ্ট্রাল করতে পারছে না, সম্ভব না। তাই আমাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে। শ্যামল সেন, অমিতাভ সান্যাল, মঞ্জু ব্যানার্জি, বিশাখা সেনগুপ্তার মাংসে আজ শিককাবাব বানাব। এফোঁড়, ওফোঁড় করে নরম মাংসে গরম শিক গুঁজব। তারপর গরমে, ঈষৎ ক্রমশ-উষ্ণ গরমে নাড়াচাড়া দিয়ে তাতাব। চেয়ে চেয়ে দেখব, কেমন ঝলসে, লাল হয়ে, রস গড়িয়ে, তারপর শুকোতে, টানটান হতে শুরু করে। কমলা চক্রবর্তী—ওঃ, ওই কমলা, শুয়োরের বাচ্চা গাঙ্গুলির ঠিক চোখ পড়েছে জানতুম। কমলা চক্রবর্তীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরীর ঘরনী হতে পারলে ওর চোদ্দ পুরুষের স্বর্গে স্থান হত। আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না। বজ্জাত ছাড়া আমি বিয়ে করব

না। খানকি মাগী। স্বজাতি গাঙ্গুলি তোকে বিয়ে করেছে? তার বিছানায় শুতে, তার বাচ্চাকে পেটে ধরে ডাস্টবিনে ফেলতে ধর্মে, রুচিতে বাধেনি? তোমার ইন্টারভিউ আমার হাতে পড়ার দরকার ছিল। তোমার স্বজাতি গাঙ্গুলি তোমাকে আজীবন, এই বিয়ের পরেও আটকে রাখছে। সেইটেতেই বেশি সুখ, না? চৌধুরীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। অবশ্য, তুমি আজ জানলে দুঃখিতই হবে মিস কমলা চক্রবর্তী, যে, আমিও তোমায় বিয়ে করতুম না। আমার 'বস্' যা করছে, তোমাকে নিয়ে আমিও সেইটুকুই করতুম। তারপর কৃষ্ণা ভৌমিক—

"কান ধরুন।"

"আমি, আমি আপনার বাবার বয়সী, আমাকে—"

"শাট্ আপ্। তুই আমার বাবার ইয়ের বয়সী। কান ধরো—"

খোঁচা খোঁচা তিন চারদিনের আকামানো দাড়ি, সবই প্রায় পাকা, দুর্ভাবনায় চোখ বসা, মাথায় চিরুনী পড়েনি, জামা কাপড় ময়লা, বোধ হয়, যা পরেছিলেন সেই ভাবেই এসেছেন, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় কৃপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চোখের মণিতে ঘষে-চড়ে-যাওয়া-হাতে যেমন ভাবে রক্ত বিন্দু বিন্দু ফুটে ওঠে তেমনি অশ্রুতে ভরে গেল। অপমানে তাঁর মুখ লাল হল, তারপর ভয়ে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কানে হাত দিলেন কৃপানন্দবাবু। এতক্ষণে চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর আকামানো দাড়িতে।

"তা হলে এখনো আপনি বলবেন না, কার উস্কানিতে স্ট্রাইক করেছেন?"

কৃপানন্দবাবু শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে কণ্ঠার কাছে শিউরে উঠছে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন। চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। দেব?

"বেশ। এবার যেই আমি বলব এক, আপনি বসবেন, দুই বললে উঠবেন। আমি দশ বার এক দুই বলব।"

রকিং চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পাছাটা দোলাচ্ছে সুব্রত চৌধুরী। সাপের মতো চোখ দিয়ে উপভোগ করছে কৃপানন্দবাবুর যন্ত্রণা। ভালো লাগছে। বেশ একটা তৃপ্তি। অফিসার হওয়ায় বেশ সুখ আছে। এরপর কৃপানন্দ তোমাকে দিয়ে তোমার মেয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাব। দেখে মনে হচ্ছে তুমি অরাজী হবে না।

নাকের পাশে, চোখে দুচার ফোঁটা থুতু ছিটকে লেগেছিল। একটা বিচ্ছিরি পচা পচা ঘ্রাণ। স্ট্রাইকের দুর্ভাবনায় নিশ্চয়ই তিনদিন দাঁতে বুরুশ ছোঁয়ায়নি। অসৃষ্টি। মুখ মুছল সুব্রত চৌধুরী। রুমালে আর একবার ভালো করে মুখ মুছল। বিনতার বাড়ি যাবার আগে রুমালে দামী সেণ্ট ঢেলেছিল। ভাগ্যিস সেণ্টটা ঢেলেছিল রুমালে, নইলে বমি হয়ে যেত।

"উঁহু, হাত নামাবেন না। ধরে থাকুন। বেশ দেখাচ্ছে এখন আপনাকে। ইস্কুলের নিচু ক্লাসের ছোট্ট নটি বয়টি। এইবার আমি এক বলছি। রেডি, এ—ক—"

কৃপানন্দবাবু দাঁড়িয়েই রইলেন। শুধু একটু কেঁপে উঠলেন। অসহায় চোখে সুব্রত চৌধুরীর চোখের দিকে তাকালেন। সুব্রত চৌধুরী দৃষ্টি সরিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ারের হাতল থেকে নামল।

"তা হলে মিঃ মুখার্জি, চাকরিটা খোয়াতে তোমার আপত্তি নেই—?"

কৃপানন্দবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসলেন। দুপায়ের ওপর ভর রাখতে পারলেন না, টলে মাটিতে পাছা ঠেকিয়ে বসে পড়লেন, কান থেকে হাত খুলে গেল, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"রাইট্‌। স্ট্রাইক পাইক এ শুড্‌ বয়। এদিকে সরে আসুন। আসুন। ও। টেবিলের কাচের ওপর ওখানে কি দেখতে পাচ্ছেন, ভালো করে হেঁট হয়ে দেখুন। আচ্ছা, এবার কান থেকে হাতটা নামাতে পারেন। চশমাটা পরেই দেখুন। বার করুন চশমা—"

কৃপানন্দবাবু চশমা বের করে পরলেন। টেবিলের ওপর ঝুঁকে দেখলেন। তারপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কি দেখলেন ওটা? বলুন?"

ভাঙা, ধরা, বসা, শুকনো গলায় প্রায় আওয়াজ বেরুল না। কৃপানন্দবাবু বলার চেষ্টা করলেন, "জলের মতো যেন কি।"

"জল নয়। ওটা থুতু। সীতা মুখার্জি আপনার কে হয়? জনমদুখিনী সীতা?" বিশেষণটা প্রয়োগ করতে পেরে উল্লাস বোধ করল চৌধুরী।

"আমার মেয়ে।"

"কদ্দিন চাকরি করছে এখানে?"

"বছর তিনেক।"

"তার চাকরিটা গেছে। আপনারটাও বোধহয় যাবে। আমি অবশ্য রাখবারই চেষ্টা করব। আপনার চরিত্র এবং আপনার মেয়ের চরিত্র হেভেন অ্যাণ্ড হেল তফাৎ। অমন মেয়ে আপনার কি করে হল? অত্যন্ত পাজি মেয়ে। মুখের ওপর থুতু ছুঁড়ে সে চাকরিটা খুইয়েছে, আপনারটাও প্রায় খতম করে গেছে।"

কৃপানন্দবাবু মাথা নিচু করে রইলেন।

"ওই থুতুটা চেটে তুলে নিলে আপনার চাকরি থাকবে। এই আমার হাতে বণ্ড। বণ্ডটা আপনাকে দেব, চাটুন। ঘেন্নার কি আছে, ও তো আপনারই মেয়ে, ধরতে গেলে আপনার মুখেরই থুতু। আপনার থুতুতেই তৈরি।"

সুব্রত চৌধুরী আনন্দে পা দোলাচ্ছে। সীতা মুখার্জিকে প্রায় নিরামিষ প্রস্তাবই একটা দিয়েছিল। সীতা মুখার্জির নাগাল আর পাওয়া যাবে না। তার বাপ এখনও হাতের মুঠোয় আছে। লিস্টে সীতা মুখার্জির পর অন্য লোকের নাম ছিল। কেউটের বাচ্চাটা বাপকে বুঝিয়ে হাত করার আগেই সুব্রত চৌধুরী কৃপানন্দবাবুকে ডাকিয়েছে।

"আপনার মেয়ের এটুকু শিক্ষা থাকা উচিত ছিল যে টেবিলটা থুতু ফেলবার জায়গা নয়। আশা করি আপনি বাড়ি গিয়ে মেয়েকে কিছুটা সভ্যতা-ভদ্রতার তালিম দেবেন। আঃ, দেরি করবেন না। আপনাকে আমি জোর করছি না। হয় ওটা চেটে সাফ করুন—এই বণ্ড পেপার নিন, নয় ঘর ছেড়ে চলে যান, আপনার নামের পাশে আমি ঢেঁড়া টেনে দি।"

তুমি একদিন বলেছিলে তিরিশ বছর কেরানীর কাজ করছ। ইঞ্জিনীয়ারিং আর কেরানীর কাজ এক নয়। সাবুদের সামনে বলেছিলে। আশা করি, কেরানী হওয়ার জন্য আজ তোমার অনুতাপ হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার হতে পারলে—অবশ্য তোমার জন্যই তোমার ইঞ্জিনীয়ার হওয়ায় বাধ সেধেছে—কেমন সবাইকে মুঠোর মধ্যে পেতে, আরাম হত, আনন্দ হত। কৃপানন্দবাবু ঝুঁকছে না? হ্যাঁ, ঝুঁকছে। তা হলে দেখাচ্ছ রাজী। উপায় কি?

সুব্রত চৌধুরী কোমরে ঝোলানো ক্যামেরাটা ঠিক করে নিল।

"শুভ"—সঙ্গে সঙ্গে 'ক্লিক্' করে একটু শব্দ হল। কৃপানন্দবাবু চমকে মাথা তুললেন। ঘরের চারপাশে তাকালেন। তাঁর কেমন ভয় হচ্ছে,

তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই কেউ ঘটনাটা দেখেছে, যদিও তিনি জানেন ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। সুব্রত চৌধুরী বও পেপারটা তাঁর হাতে দিল, "কালকে ভর্তি করে আনবেন। চাকরিটা যাতে থাকে দেখব।"

চাকরিটা রাখতে হবে কৃপানন্দবাবুর, কারণ তা হলেই সীতা মুখার্জিকে একদিন শায়েস্তা করার সুযোগটা থেকে যাবে।

"ভয় নেই, আপনার মেয়ে সীতা মুখার্জি ছাড়া ঘটনাটা আর কেউ জানবে না। সীতা মুখার্জির থুতু সীতা মুখার্জির পূজনীয় পিতৃদেব চাটছে এই ফটো দেখে আশা করি তার একটু শিক্ষা হবে। বাকিটা আপনি দিয়ে দেবেন। ডেভেলপ করিয়ে ফটোর একটা কপি আমি যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।"

মৃত ব্যক্তির মতো কৃপানন্দবাবু তাকালেন সুব্রত চৌধুরীর দিকে, তিনি ঘটনাগুলো সঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। কিছু তাঁর মাথায় ঢুকছে না। তিনি রেগে যেতে, অভিশাপ দিতে, কিছু একটা করতে ভুলে গেছেন। তাঁর মাথার মধ্যে শুধু একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে, সীতার চাকরি নেই, বিরাট একটা সংসার মাথার ওপর, রিটায়ার করার আর মাত্র কয়েক বছর বাকি। তিনি পরাজিত, এই মুহূর্তে কিছুই তাঁর করার নেই সই করা ছাড়া।

"যান।"

পেছন ফিরতে গিয়ে কৃপানন্দবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে চাপা স্বরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সমস্ত পিঠটা জোয়ারের স্রোতের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আঃ, কিছু করার নেই।

"ডোণ্ট ক্রিয়েট এ সীন। উঠুন। বাইরে আপনার বন্ধুরা আছে। তারা শুনলে আশা করি আপনার সম্মান বাড়বে না। উঠুন। অযথা সময় নষ্ট করবেন না। গেট আপ।"

কৃপানন্দবাবু উঠলেন, জামার হাতায় চোখ মুছলেন, মাথা নিচু করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। সুব্রত চৌধুরীকে নয়, নিজেকেই তিনি বারংবার অভিশাপ দিলেন।

"তা হলে মিস্ বন্ধু ব্যানার্জি, তুমি মাথা নিচু করে ফের এলে? তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আর রাস্তায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে পারলে না? তুমি

আসবে আমি জানতুম, কারণ তোমার বাড়ির খবর, তোমার রুগ্ন বাবা, কাচ্চাবাচ্চা ভাইবোনের কথা জানিয়ে একটা লিফটের জন্ত তুমিই আমাকে একবার মিনতি করেছিলে। লিফট তোমার হতো। কেন হয়নি, তা তুমি জানো। এখন তোমার চাকরিটা থাকবে কিনা ভাবছি। উঁহু, কেঁদ না, কেঁদে কোনো লাভ নেই। সুব্রত চৌধুরীকে তুমি চেনো। বড়োই খারাপ লোক। তোমার ভাগ্যের দোষে এখন তারই হাতে তোমার চাকরি, আর তুমি নির্বোধ নও, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, অ্যাভারেজ মেয়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী, সুন্দরীও। আমার একটা প্রস্তাব আছে, কেউ জানতে পারবে না, আশা করি, তোমার আপত্তি হবে না।"

মঞ্জু ব্যানার্জি টেবিলের কোণায় হাত রেখে টাল সামলাল। সুব্রত চৌধুরী বুড়ো কবিরাজের চোখ নিয়ে রোগিনীর দিকে তাকাল। না, সীতা মুখার্জি নয়।

"উঁহু, বোসো না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়েই থাকো।"

দাঁড় করিয়ে রেখে তোমাকে ক্লান্ত, অবসন্ন করব। তোমার মনোবল তাতে ভাঙবে। তারপর, তোমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেওয়াই সহজ। সাপুড়ের মতো সুব্রত চৌধুরী মঞ্জু ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে আছে। ঘামে মুখ, কপাল, ব্লাউজের হাতা, চিবুক, গলা ভিজে গেছে। কপালে, গালে, কতগুলো চুল ঘামে লেপ্টে আছে। কাঁপছে। অজ্ঞান হয়ে না যায়।

"তা হলে তুমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে রাজি?"

"না, না—"মঞ্জু ব্যানার্জি শিউরে উঠল, "না, দয়া করে আমার চাকরিটা নষ্ট করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি—"

"জানতুম, তুমি এ কথা বলবে, কারণ তুমি নির্বোধ নও। কিন্তু পায়ে—না, অত নিচে তোমাকে নামতে হবে না।"

"কি চান, কি চান আপনি আমার কাছে?"

"আমি?" সুব্রত চৌধুরী হাসল, "না, আমি কিছুই চাই না। এই বিভাগ, যেখানে তুমি চাকরি করো, সে তোমার কাছে কিছু অবশ্যই চায়। সে চায় সেই বিভাগকে তুমি খুশি করবে। আর তুমি জানো, কাগজেও আজ দেখেছো, বিভাগের সর্বেসর্বা প্রতিভূ এখন আমরা, আমি। বিভাগকে খুশি করার অর্থ এখন আমাকেই খুশি করা, নয় কি?"

মধু ব্যানার্জি সুব্রত চৌধুরীর চোখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। সুব্রত চৌধুরী রকিং চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পাছা দোলাচ্ছে। ক্যামেরাটা নাড়াচাড়া করছে, মৃদু হাসছে। একদিন এই মধু ব্যানার্জি, তার মনে পড়ল, নাক ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল। বলেছিল, ফের যদি আপনি আমাকে এমন কথা বলেন, আমি সকলকে জানাব। তখন সেণ্ট্রাল ছিল সবার ওপর, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। সুবিধে মতো জোট বেঁধে যা খুশি তাই বলে, তুমি, তোমরা, সবাই পার পেয়েছ। তুমি, তোমার ঐ বন্ধুরা সবাই কৃমির কীটের মতো, অতি নগণ্য সামান্য কর্মচারী। তোমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলা অপমানজনক, মানহানি-কর, কেননা আমি, চৌধুরী, মানে আমরা, যাদের—অর্থ এবং মেয়েই পরম ও চূড়ান্ত দর্শন, তারা অপ্রকাশ্যে অন্ধকারেই ওটা সারতে চাই। আর ঈশ্বরের কী কুরুচি—তোমরা এই কীটেরা মেয়েমানুষ। সেই অসার দম্ভে তখন ফণা তুলেছ। কিন্তু আজ? আজ আমিই অথরিটি। আজ তুমি একথা কাউকে জানাতে পারবে না, জানালেও কেউ শুনবে না, তোমাদের জোট এখন ভেঙে গেছে। আর সেণ্ট্রাল? হা হা, তোমার নামে একটি রিপোর্টেই তোমার চাকরি নষ্ট হবে, কারণ, তোমরা আইন অমান্য করে বে-আইনী স্ট্রাইক করেছ। আদালতও তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

"বলো, তোমার অফিসকে তুমি খুশি করবে?"

"কি ভাবে, বলুন"—আবার কাঁপছে মধু ব্যানার্জি। আমরা হেরে গেছি। পরাজিতের ওপর বিজয়ীর জিঘাংসা। সব যুগেই হয়েছে, আজও হচ্ছে। ঈশ্বর সাক্ষী, সুব্রত চৌধুরী, একদিন তুমিও হারবে, তুমি, তোমরা, তোমাকে এই অত্যাচারের অধিকার যারা দিয়েছে—তারা, সবাই, তোমাদের সবাই। এই কথাগুলি ভেবেও মধুর সুখ হল না। সে হাসতে পারল না। শুধু একটা করুণ ভঙ্গি করল, যার অর্থ, আজ আমাকে দয়া করুন।

"দ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড গার্ল" সুব্রত চৌধুরী চেয়ারের হাতল থেকে নেমে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। হাসছে অর্থপূর্ণ চোখে, "জানতুম, তুমি রাজি হবে, কারণ তোমার বুদ্ধি আছে, গোঁয়ার্তুমির কোনো মানে হয় না। তোমাকে আমি যেমন কিছু দিচ্ছি, চাকরিটা দিচ্ছি, তোমাকে খুশি করছি, তেমনি তুমি আমাকে করবে—রেসিপ্রোকাল, দিবে আর নিবে মেলাবে মিলবে, বিজনেস্। সবই বলব। ধীরে ধীরে বলব, তাড়ায় কিছু নেই। এই নাও, তোমার বণ্ড পেপার। সই করে, ফিলআপ করে, কাল ফেরৎ দিয়ে যাবে। তার আগে,

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার একটা ফটো নেব। এটা খুব ভাল ক্যামেরা, আজই সারিয়ে এনেছি, অন্ধকারেও ছবি ওঠে, কেউ জানবে না। তোমার ছবি নিতে চাইছি, কারণ তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে। নেব ?"

একটা বেড়াল ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করছে। থাবা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উলটিয়ে পালটিয়ে দেখছে।

"নিন—"

এইবার চরম মুহূর্ত। সীতা মুখার্জির ঘটনাটা মনে পড়ল। সুব্রত চৌধুরী ঘেমে উঠল। ভাগ্যিস মঞ্জু ব্যানার্জি মাটির দিকে চোখ করে আছে, দেখতে পাবে না। মঞ্জু ব্যানার্জি অবশ্য সীতা মুখার্জি নয়, কারণ তা হলে এর আগেই থুতুটা ছিটকে এসে চোখে, ঠোঁটের কোণে, নাকের পাশে লাগত, বাকিটা টেবিলে পড়ত। তবু পা তিনেক পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখল, ক্যামেরাটা তুলল। বললে, "মিস্ ব্যানার্জি, তোমার সাধারণ ফটো আমার কাছে ডজন কয়েক আছে, মানে, তোমার অজ্ঞাতসারেই আমি তুলেছি। এখন যদি কিছু মনে না করো, যদি দয়া করে অনুমতি দাও, তোমার খালি গায়ের একটা ছবি নেব।"

"না, না, পারব না, আমি পারব না"—চকিতে মঞ্জু ব্যানার্জি ঘুরে দাঁড়াল। বাহুর ভাঁজে চোখ ঢাকল। কাঁদছে। কাঁদবেই তো। রাইট। এই কান্নাটা, এই প্রতিরোধ, এর এই অনিচ্ছুক যন্ত্রণা উপভোগ্য। সুন্দর। এটা না থাকলে নারীত্ব কিছু না, তোমাকে ভালো লাগত না। তুমি ফেরাও, তাই তুমি টানো। নতুবা আমি ফেলে দিতুম নিজেই। "নাউ ওপন, আন্-বাট্ন্ প্যাট্—"

না, থুতু ছিটকে আসেনি। জানতুম আসবে না। কারণ সবাই সীতা মুখার্জি নয়। একে দিয়ে এখন যা খুশি তাই আমি করিয়ে নিতে পারি, কারণ, ওর আত্মবিশ্বাস ভেঙেছে, ভয়ে, আতঙ্কে এখন ও চূড়ান্তভাবে নিজেকে অসহায় বোধ করছে। মঞ্জু ব্যানার্জি এখন কথা শুনবে, বেশ কিছুদিন শুনবে, সব কিছুই করবে, কারণ বাঁচাটাই এখন ওর কাছে বড়ো কথা। পৌরাত্ম্য দিয়ে সীতা মুখার্জির মতো ও আত্মহত্যা করতে চায় না, বাঁচতে চায়। নইলে—

সুব্রত চৌধুরী হাসল, গলাটা মোলায়েম করল, গলায় স্নেহ ঢেলে দিয়ে বললে, "পারবে, খুব পারবে। আমি একটু সাহায্য করব ?"

এক পা এগিয়ে এল সুব্রত চৌধুরী, আতঙ্কে দু পা পেছিয়ে গেল মঞ্জু ব্যানার্জি, "না, না—দাঁড়ান—"

এক হাতে চোখ ঢাকল। কম্পিত, শিহরিত অন্য হাতের আঙুল ছুঁইয়ে, নখ বসিয়ে বোতামটা টান দিয়ে ছিঁড়ল। আঃ, ঈশ্বর।

"মুখ থেকে হাত নামাও। নামাও। উঁহু, চোখ বুঁজে থাকলে হয় না, মঞ্জু—আমার মঞ্জুরানী! তাকাও বলছি, তাকাও, লুক ইনটু মাই আইজ—ওক্-কে—এই তো। হোয়াট এ বিউটি—দি লাভলিয়েস্ট থিং অন আর্থ—।" আর দাঁত কিড়মিড় করে মনে মনে বলল, কেমন লাগছে, মঞ্জু ব্যানার্জি? সাধ মিটেছে স্ট্রাইকের? 'বস' খুশি হবে, বিভাগে আমার উন্নতি হবে। আর, এই পদ্মকলি ফটো দেখিয়ে তোমাকে চিরদিন ব্ল্যাকমেল করব।

সব শুনে বাপুর মনটা খারাপ হয়ে গেল, ঘৃণায় শরীরটা রি রি করে কেমন বমি বমি ঠেকল, কান্না পেল। নিজের হাতটা তার কামড়াতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছে হল, একটা ছুরি হাতের তালুর ওপর বসিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের করে দেয়, তা হলে বুঝি শরীর একটু শান্ত হয়, শীতল হয়। এই—এই হয়। অপদার্থ একক হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতার এই চূড়ান্ত বিকৃতিই অনিবার্য। বিকৃতি, বিকৃতি। ওদের এই সভ্যতা, সমাজ, অর্থনীতি, তার বশংবদ অনুচর—সব একটা বিকৃতি। পাকাটে ডালিম ছিল, এখন পচা, এই অফিসারগুলো সেই পচা ডালিমের এক একটা বীচি।

"তোদের সুব্রামনিয়াম কী বললে?"

"এখনও বলে নি কিছু, বগুটা সই করে আনতে বলল। ইউনিয়নের কয়েকজনকে অবশ্য বগু দেয় নি এখনও শুরু করে নি, গভীর জলের মাছ।"

"আমাদের খিদিরপুরের মিঃ সাবেকেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, চুপচাপই আছে। একটু ভয় পেয়েছে মনে হয়। তবে, যাই বলিস, ড্যালহৌসির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরীর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। ইউনিয়ন থেকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, নিউজ পেপারেও ঘটনা সব জানানো হয়েছে। তারপর আরও কি করেছে শোন—"

বলে শীলা বাপুর মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে কি বলল। পচা ডালিমের এক একটি অসার বীচি—বাপুর আবার মনে পড়ল কথাটা।

শীলা থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। বললে, "তুই দেখিস নি রাস্কেলকে। দেখলে কিন্তু সুব্রত চৌধুরীকে অমনটি মনে হয় না মোটেই, যেন কত সাধু

পুরুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। একেবারেয়ে কসাইস, ছোটলোক। ওর আণ্ডারে থাকলে চাকরিটা ছাড়তেই হত। কিন্তু যাই বলিস, চেহারাখানা ভল জুয়ান। তোর সঙ্গে যা মানাত না—!"

"আঃ, কী যে বাজে রসিকতা শিখেছিস—"

মাথটা ঘুরছিল রাণুর। বমি আসছিল, কান্না-কান্না, রাগ, হিংস্রতা—সব মিলিয়ে একটা অনুভূতি ওকে কম্পিত করছিল, বিবর্ণ করছিল।

"কিরে, কি হল?"

"এক গ্লাস জল খাওয়া, বাড়ি যাব। বাড়ি থেকে ওগুলো নিয়ে আসি।"

"আয়। সঙ্গে যাব আমি?"

"না। সুটকেসটা নিয়ে আসি, এখুনি আসব। যদ্দিন সিট না পাচ্ছি তোর সিটেই ভাগাভাগি করে থাকব। তুই-ই যখন সুপারিনটেনডেন্ট তখন—"

"আয়। হবেই একটা কিছু ব্যবস্থা। কিন্তু হঠাৎ? কারণটা তো বললি না বাড়ি ছাড়ার?"

"বলব, এসে বলব।"

সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় রাণুর দু চোখ ফেটে জল এল। মাকে জানায় নি। মা শুয়েছেন। চুপি চুপি নিজের ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঝি দেখেছে, কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি, একটু অবাক চোখে তাকিয়েছে, রাণু হেসেছে, যেন একটা সাধারণ ব্যাপার। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার চোখ উপচে জল পড়ল। এই বাড়িকে এই মুহূর্তে সে ঘৃণা করছে, আবার ছেড়ে যেতে কষ্টও হচ্ছে। মার জন্য কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, কোথায় কোন্ অজানা সমুদ্র সে এবার পাড়ি দিতে চলেছে। একটা সান্ত্বনা, সেটা সমুদ্রই, পঙ্কিল ডোবা কি পুকুর নয়।

প্যাসেজে সুব্রতর সঙ্গে দেখা। দূর থেকে দেখেই চোখ মুছেছিল রাণু। সুব্রত শিস দিতে দিতে ফিরছিল। মনটা খুশি খুশি। খুশি হবার কথাই। যুদ্ধে জয়ী বীরের মতো সে ফিরছে। ফটোটা এখুনি ডেভেলপ করতে হবে। গাঙ্গুলিকে এক কপি দেব, হেঃ হেঃ। বাকোৎ গলে যাবে। না, দেব না। হ্যাঁ দেব, না, দেব না। বিনতা। পুরী। ছুটি নেব।

"একি, কোথায়?"

"হোস্টেলে। এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। ভালোই হয়েছে, দেখা হল। সব কিছু রেখে যাচ্ছি। শুধু এই স্যুটকেসটা—আমারই কেনা—"

"অ। চাকরিটা তাহলে আছে? আশ্চর্য, কি করে থাকল?"

"বাঃ, থাকবে না কেন?" জোর করে হাসার এবার চেষ্টা করল বাপু, হাসলও, খুব খুশি, খুব আনন্দিত, বিজয়ীর মতো মুখভঙ্গি করে, মাটিতে পা ঠুকে তাল দিতে দিতে।

সুব্রত চৌধুরী ভয় পেল। সন্দিগ্ধ চোখে, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে, মুখে গর্বোদ্ধত ভাব রেখেই তাকাল বাপুর দিকে। ভয় দেখাচ্ছে? না, ভয় দেখাচ্ছে না। নিজেকে কেমন অসহায় বোধ হচ্ছে। মনে হল বলে, ছেলেমানুষী রাখো বাপু, পাগলামির একটা সীমা আছে। বলতে পারল না, অহঙ্কারে বাধছে। আঘাতেরও ভয় আছে।

"সুব্রামনিয়াম কিছু বলল না? কিছুই না?"

"কি আবার বলবে?"

তারপর চকিতে, একমুহূর্তে কি যেন মনে পড়ে গেল। বললে, "ও হ্যাঁ। শুধু একটা ফটো নিয়েছে—নেকেড, স্টার্ক নেকেড, মানে—একেবারে নগ্ন।"

থেমে, চিবিয়ে, প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে ওজন করা হিসেবী কথাগুলো শেষ করে সুব্রতর মুখের দিকে বাপু তাকাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, একটা জটিল অপারেশন শেষ করে একমুহূর্ত যেমন ডাক্তার তাকায় রোগীর মুখের দিকে। সুব্রতর মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন বাপুর মনে হল, সুব্রত পড়ে যাচ্ছে। পড়বেই। সুব্রত একদিন পড়বেই। তবু বাপুর কষ্ট হল, ওর দাদা সুব্রত, যে নিজেরই মায়ের পেটের ভাই, একই রক্ত, তবু, তাতে কত আলাদা—তা হোক, ওকে, এই ক্লম-নিঃসঙ্গ সুব্রতকে আঘাত দিতে, তারপর সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিকের স্থির অবিচল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে বাপুর বুক চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চাইল।

নিঃসঙ্গ দাদার মুখের দিকে শেষবার তাকাল বাপু। তারপর চোখের জল হাত দিয়ে সরিয়ে, শান্ত মন্দ পায়ে গেট পার হল। একটা অচেনা উদ্বেগে, নির্মম আঘাত দেওয়ার রূঢ় ব্যথায় এবং মুক্তির সুতীব্র যন্ত্রণামুখর আনন্দে বাপু কেঁপে উঠল। একটি মুহূর্ত। পরক্ষণে দ্রুত পা ফেলল। মনে হল, একটা ভুতুড়ে ছমছমে শ্মশান পার হয়ে সে জীবনের দিকে ছুটছে, যেখানে তার বন্ধুরা সবাই অপেক্ষা করছে।

একটি যুদ্ধের ইতিহাস

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

অনন্ত

অসীম

প্রথম

দ্বিতীয়

তৃতীয়

চতুর্থ

সুলতা

দণ্ডধর

মলিনা

বিচারক

মুনশী

আরও দু-একজন

এবং অসংখ্য লোক

যবনিকা সরে যাওয়ার আগে

কণ্ঠস্বর। সমন্তপঞ্চকে সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে দুই পক্ষ। এক পক্ষ ভীম, আর এক পক্ষ দুর্যোধন। সে যুদ্ধের কারণ ছিল— মহাকাব্যের কারণ। তারপর যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। কারণ হয়ে উঠেছে জটিল। যুদ্ধের পদ্ধতি? সে যেন আরও জটিল। নাই বা বললাম সে কারণের ইতিহাস। যুদ্ধের কথাটাই হোক।

যবনিকা সরে যায়

চেয়ার, টেবিল, অনন্ত

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) কে ওখানে?

অসীম। (প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকট আসে) আমি। অসীম।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) তারপর কি মনে করে?

অসীম। কথাটা তোমার ঠিক নয়।

অনন্ত। কেন? (যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই কাজ করিয়া যায়)

অসীম। কেন আবার কি। ঠিক নয়।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) তবে কোন্‌টা ঠিক?

অসীম। প্রতিবাদে যে কথাটা বলা হল সেইটে।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি তা মানি না।

অসীম। মানি না বললেই চলে কি? মানতে হয়।

অনন্ত। (মুখ তুলিয়া) মানলুম না। (পুনরায় কাজে মন দেয়)

অসীম। কেন মানবে না শুনি?

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি যে কথাটা বলেছি, সেটা আমার মত বলে।

অসীম। লোকে যে মতটা মানে সেটা বলে না।

অনন্ত। আমি কিন্তু বলি।

অসীম। (দশ টাকার নোট বাহির করিয়া) তা হলে দশটা টাকা দিই?

অনন্ত। কেন?

অসীম। তোমার ঐ মতটার দাম।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) ওটা তোমায় এমনি দিলাম। তুমি ব্যবহার করতে পারো।

অসীম। ভেবে দেখ। দামটা আমি বাড়াচ্ছি—কুড়ি…তিরিশ…পঞ্চাশ…

এপাশ-ওপাশ হইতে কয়েকজনের প্রবেশ

প্রথম। নীলাম হচ্ছে না কি ?

অসীম। হ্যাঁ। (অনন্তর কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কাজ করিয়া চলিয়াছে)

দ্বিতীয়। কিসের ?

অসীম। ওঁর একটা মত আছে, সেইটের।

তৃতীয়। মত ? জিনিসটা কি রকম ?

অসীম। শুনতেও ভালো—বলতেও ভালো।

চতুর্থ। তাই না কি ! তা হলে একটা দাম দিই ?

অসীম। দিতে পারো। (অনন্ত একমনে কাজ করিতেছে)

তৃতীয়। বিড্ কত যাচ্ছে ?

অসীম। পঞ্চাশ।

দ্বিতীয়। বেশ। আমার একটা রইল। ষাট।

প্রথম। সত্তর।

চতুর্থ। আশি।

তৃতীয়। নব্বুই।

দ্বিতীয়। একশো।

অসীম। দুশো। (অনন্ত নিজের কাজ করিতেছে)

প্রথম। তিনশো।

চতুর্থ। পাঁচশো।

তৃতীয়। সাতশো।

দ্বিতীয়। নশো।

প্রথম। হাজার।

অসীম। সুলতা বলছিল তোমার নাকি ওদেশে যাবার খুব ইচ্ছে।

অনন্ত। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?

অসীম। সুলতা টিউশানির মাইনে পায় নি। তাই ঘর ভাড়ার টাকাটা তোমার কাছে চেয়েছিল।

অনন্ত। (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?

অসীম। টাকাটা তুমি যোগাড় করতে পারো নি। তাই আর যাও নি।

অনন্ত। (প্রায় চিৎকার করিয়া) তুমি এত কথা জানলে কি করে।

অসীম। ঘর ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছি কি না, তাই।

অনন্ত । তাইতেই সে তোমাকে সব বলে দিল ?

অসীম । এক দিনে তো বলে নি । সাতদিনে বলেছে । আমার যাতায়াত তো রোজ । (অনন্ত বসিয়া আবার কাজ করিতে আরম্ভ করে)

চতুর্থ । নীলায় কি বন্ধ হয়ে গেল ?

অসীম । না না, কে বললে ? শোনো তোমার ওদেশ যাওয়ার খরচা আমি দেব ।

তৃতীয় । যাওয়ার খরচা, থাকা-খাওয়ার খরচা—দুটোই আমার ।

দ্বিতীয় । ওর ওপর ফিরে আসার খরচাও ধরে দেব ।

প্রথম । বোঝার ওপর শাকের আঁটি । ওটা তো দেবই—তার ওপর হাত-খরচা ।

চতুর্থ । ওসব তো আছেই । তাছাড়া পুরো জেট-প্লেনখানা ছেড়ে রেখে দেব । যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে ।

অসীম । ভেবে দেখ—যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে ।

অনন্ত । (কাজ করিতে করিতে) আমি বেশ্যা নই । নিজেকে বিক্রি করি না ।

অসীম । মলিনা কিন্তু করে ।

অনন্ত । (মুখ তুলিয়া) কে করে ?

অসীম । মলিনা ।

অনন্ত । (কণ্ঠস্বরে যেন শাপ দেওয়া । উঠিয়া) তুমি গোয়েন্দা—না হিতাকাঙ্ক্ষী ?

অসীম । তোমার পরিবার ? ধ্বংস তার অনিবার্য । আর তুমি ? আজ বাদে কাল শেষ হয়ে যাবে ।

অনন্ত । তুমি যেতে পার । আমি তোমাকে চিনি না ।

অসীম । চেনার তো কোনো দরকার নেই । আমি খদ্দের ।

প্রথম । ঠিক কথা । খদ্দেরকে তো না চিনলেও চলে ।

দ্বিতীয় । নিশ্চয় । সব ব্যবসাদার কি সব খদ্দেরকে চেনে ?

তৃতীয় । তবু তো বেচাকেনা চলে ।

চতুর্থ । তবু তো ব্যবসা এগোয় ।

অসীম । তাই তো বলছি—যন্ত্রমন্ত্রটা বিক্রি করে দাও, আমরা চলে যাই ।

অনন্ত । সুলতা এখন কোথায় ?

অসীম । এ-কদিন আমার ফ্ল্যাটে ছিল । এখন এখানে ।

সুলতার প্রবেশ

সুলতা। (অলীমকে) বাঃ বেশ লোক যা হোক! এই আসছি বলে ঢুকলে—আর বেরবার নাম নেই। কেমন আছ অনন্ত?

অনন্ত। তুমি কি এদের সঙ্গে এসেছ।

সুলতা। হাঁ৷ পরিচিত বন্ধুবান্ধব লোক। বললেন, চল ঘুরে আসি।

অনন্ত। কত দিনের পরিচয়?

সুলতা। এই তো—দিন সাতেক।

অনন্ত। আমার চিঠি পেয়েছিলে?

সুলতা। তোমার চিঠি যখন হাতে এল তখন কোটির এই ফেস্-পাউডারটা মুখে লাগিয়ে দেখছি কেমন দেখায়।

অনন্ত। ও, চিঠি পৌঁছবার আগেই এদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

সুলতা। হাঁ৷, ততক্ষণে চার মাসের বাড়ি ভাড়া মিটে গেছে। ভালো হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার পথে অনেক দিনের পছন্দ করা কপালী শাড়ি কিনে এনেছি। নিউ এম্পায়ারে যাব ছবি দেখতে। তৈরি হচ্ছি—এক হাতে কোটির ফেস পাউডার—এমন সময় আর এক হাতে এল তোমার চিঠি, আমাদের সেই পুরনো বাড়ি ঘুরে।

অনন্ত। চিঠিটা তুমি পড় নি সুলতা?

সুলতা। পড়েছিলাম অনন্ত।

অনন্ত। তবে?

সুলতা। শুনলে তুমি দুঃখ পাবে অনন্ত।

অনন্ত। বলো না শুনি।

সুলতা। পড়েছিলাম, কিন্তু কিছু মনে হয় নি।

অনন্ত। কিন্তু কেমন করে জানলে একথাটা শুনে আমার দুঃখ হবে?

সুলতা। দুঃখ তোমার হয়নি অনন্ত?

অনন্ত। হয়েছে, কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

সুলতা। সত্যিই তো, আমি কি করে জানলাম?

অনন্ত। তুমি আবার আমার চিঠিটা পড়ে দেখো সুলতা।

সুলতা। কিন্তু চিঠিটা তো হারিয়ে গেছে।

অনন্ত। চিঠিটা আমার মুখস্থ আছে—বলব সুলতা?

অসীম। বাজে কথায় কাজ কি। মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা চলে যাই।

অনন্ত। টাকা আমি যোগাড় করেছিলাম সুলতা। এই দেখ টাকা। কাজটুক শেষ করেই নিয়ে যেতাম।

সুলতা। জানলে অনন্ত—ছোট বেলায় আমার চীনে লণ্ঠন কেনার খুব শখ ছিল।

প্রথম। চীনে লণ্ঠন?

সুলতা। হাঁ, চীনে লণ্ঠন। কেমন যেন মনে হত চীনে লণ্ঠনের আলোয় সব বদলে যায়। সব কিছু সুন্দর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়। সত্যি হয় নাকি?

সুলতা। একবার যেন হয়েছিল। খুব ছোটবেলায়—

তৃতীয়। তাই নাকি? কি হয়েছিল?

সুলতা। নকুড় মিস্ত্রীর ছেলেকে চীনে লণ্ঠনের আলোয় দেখেছিলাম।

চতুর্থ। কি রকম মনে হল?

সুলতা। মনে হল—কেমন যেন রাজপুত্র—রূপকথার রাজপুত্র।

অসীম। তারপর একদিন সত্যিই চীনে লণ্ঠন কিনলে, তাই না।

সুলতা। হাঁ, একদিন চীনে লণ্ঠন কিনে ঘর সাজালাম।

অনন্ত। কিন্তু ছোটবেলার সে আলো আর আসে নি।

সুলতা। না, সত্যিই আসে নি অনন্ত। তারা সব কেমন যেন আরও তারা দেখাতে লাগল—আরও বিশ্রী।

অনন্ত। আমিও তো তাই বলছি সুলতা। ও চীনে লণ্ঠনের—

অসীম। তোমার এ বলার দাম কত?

প্রথম। একশো?

দ্বিতীয়। দুশো?

তৃতীয়। তিনশো?

চতুর্থ। চারশো?

অনন্ত। বলেছি তো তোমাদের আমি চিনি না।

সুলতা। কিন্তু সত্যি অনন্ত, তোমার ও বলার আর কোনো দাম নেই।

অনন্ত। কি বলছ সুলতা! এই তো সেদিন—

সুলতা। সেদিন পর্যন্ত তো দাম ছিল অনন্ত। কিন্তু তারপর—

অনন্ত। হ্যাঁ—তারপর সুলতা…?

অসীম। তারপর দিন সাতেক আগে হঠাৎ বাবটা হারিয়ে গেল।

সুলতা। হ্যাঁ—ঠিক সাতদিন আগে—

অনন্ত। কিন্তু সুলতা—আমি চিঠিতে লিখেছিলাম—

সুলতা। তখনও চিঠির কথা আসে নি অনন্ত—তোমার কথাই আছে। বাড়িওলা সবে তাগাদা দিয়ে গেছে—তোমাকে খবর পাঠিয়েছি—এমন সময়—

অসীম। এমন সময় চীনে লণ্ঠনের আলোয় সব যেন কেমন বদলে গেল।

প্রথম। একশো চীনে লণ্ঠনের দাম কত?

দ্বিতীয়। কত আর হবে—হাজার—

তৃতীয়। তাহলে আমাদের ব্যবসাটা—

চতুর্থ। ঠিক। ব্যবসাটা আমাদের চীনে লণ্ঠন দিয়ে সাজিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

অনন্ত। সুলতা…!

সুলতা। সত্যি বলছি অনন্ত—বিশ্বাস করো। ছোটবেলার সেই চীনে লণ্ঠনের আলোটা হঠাৎ যেন ফিরে এসে সব কিছুকে পালটে দিয়ে গেল।

অনন্ত। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো সুলতা। আমি এদের তাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

সুলতা। কিন্তু, তুমি তো চীনে লণ্ঠন নিয়ে আসবে না অনন্ত।

অনন্ত। না সুলতা, আমাদের পথ সূর্যের আলোর পথ। সে পথে তো চীনে লণ্ঠনের দরকার নেই।

সুলতা। কিন্তু অনন্ত, বাড়িওলা বাড়ি থেকে বার করে দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। বললে জল বন্ধ করে দেব, আলো বন্ধ করে দেব। তোমাকে চিঠি লিখে একা ভাবছি। হঠাৎ তোমার ঐ সূর্যের আলোর পথে বাবাকে দেখলাম। মরবার আগে পর্যন্ত পাওনাদারের তাগাদা পেছনে নিয়ে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে বাবা অফিস করেছেন। মা অভাবের জ্বালায় বিশ্রী মুখ করে বিশ্রী কথাবার্তা বলে গেছেন। আর আমি? আমি নাকি ফোটা ফুলের মতো জন্মেছিলাম। কিন্তু সেই ফোটা ফুলের চেহারা নিয়ে দিনের পর দিন তোমার ঐ সূর্যের পথে ক্লেদাক্ত ঘর্মাক্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।

অসীম। তাই তো চাঁদে লণ্ঠনের আলো নিয়ে এলাম।

প্রথম। একশো—

দ্বিতীয়। দুশো—

তৃতীয়। তিনশো—

চতুর্থ। চারশো চাঁদে লণ্ঠনের আলো।

সুলতা। আর জানলে অনন্ত? সে আলোয় রীতি, মত, পথ, আমার দাম ধরা দিন, কালি-পড়া রাত, আর সেই সঙ্গে তুমি, সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনন্ত। কিন্তু সুলতা—আমি তো ভাবতেও পারি নি—সকল আলোর আলোয় এমনি করে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্রথম। তবে? কি তুমি ভেবেছিলে শুনি?

দ্বিতীয়। তুমি কি ভেবেছিলে রাতের পর রাত সুলতা একা কাটিয়ে দেবে?

তৃতীয়। তুমি কি ভেবেছিলে বিছানায় সুলতার পাশে শোবার মতো লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই?

চতুর্থ। তুমি জানতে না অসীম আছে? জানতে না তুমি, অসীম না থাকলে আমরা আছি?

অসীম। তুমি কি ভেবেছিলে স্বর্গ থেকে নেমে আসা সুলতা এখনও মর্ত্যের মাটিতে পা দেয় নি?

অনন্ত। আমি এটাকে মস্ত শহর বলেই জানতাম। কিন্তু এ তো দেখছি জঙ্গল।

প্রথম। গতিক কিন্তু সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ—আমারও কেমন মনে হচ্ছে—অনন্ত যেন পালাবার মতলব করছে।

তৃতীয়। পালালেই হলো। পালিয়ে একবার দেখুক না।

চতুর্থ। আমি আছি কি করতে? চোট করে দেব না।

অসীম। কি দরকার চোট করে দেবার। মস্তামঠটা বিক্রি করে দাও—আমরা সবাই চলে যাই।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ। (একসঙ্গে) কি আছে? বিক্রি করে দাও না? আমরা সবাই চলে যাই।

অনন্ত। আশ্চর্য সুলতা! আমি তো এতদিনেও কিছু জানতে পারি নি। এরা তো দেখছি শান্তদিনে সব কিছু জেনে ফেলেছে।

সুলতা। জানবে না কেন? অসীমকে যে আমি সব বললাম।

অনন্ত। আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলনি। অন্তত এই সব ভাবনার কথা।

সুলতা। তোমার সঙ্গে আমার শেষ যেদিন দেখা হয়েছে, সেদিনও তো বলার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছুই নি। বাড়িওলা যখন তাগাদা দিয়ে চলে গেল, ভাবনা আরম্ভ হল তখন। তারপর এল অসীম। মনে হল এই হয়তো সুযোগ। ঘাম-ঝরা দিন, আর চোখে-কালি-পড়া রাতের এবার হয়তো শেষ।

অসীম। সুলতা বুদ্ধিমতীর মতো ভেবেছে অনন্ত। তুমিও বুদ্ধিমানের মতো ভাবতে আরম্ভ করো। আমাদের বুদ্ধি একটা নেবে অনন্ত?

দ্বিতীয়। আমাদের সঙ্গে একটু বাইরে যাবে? যাবে?

তৃতীয়। ভালো মাল···দু পেগ টেনে আসবে?

চতুর্থ। মাথা দেখবে একেবারে সাফ হয়ে গেছে? আসবে আমাদের সঙ্গে?

অনন্ত। এরা তো তাড়ালেও যাবে না সুলতা। চলো আমরাই যাই।

সুলতা। এই সাতদিনের পরও একথা বলতে পারছ অনন্ত!

অনন্ত। কেন পারব না। আমি তো ও-সাতদিনের কথাটা বুঝি!

অসীম। বোঝ বলেই তো বলছি। মতামতটা বিক্রি করে দাও!

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ। (একসঙ্গে) আমরা হিসেব মিটিয়ে চলে যাই।

অনন্ত। আজ আটদিনের দিন আমরা নতুন করে দিন আরম্ভ করব সুলতা।

সুলতা। চলো অসীম, আমরা এখান থেকে যাই। এ লোকটা মদ না খেয়েও মাতাল।

অনন্ত। কিন্তু তোমার ও-ঘাম-ঝরা দিনের কথা আমি বুঝি সুলতা। বিশ্বাস করো—তোমার ও-চোখে-কালি-পড়া রাতের অনুভব আমার অন্তরে।

সুলতা। কিন্তু তোমার অনুভবকে আমার তো বইবার ক্ষমতা নেই অনন্ত। তোমরা আসবে না অসীম?

অসীম। শুনলে তো সুলতার কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

প্রথম ও দ্বিতীয়। (একসঙ্গে) ঠিক কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ। (একসঙ্গে) সঙ্গে সঙ্গে মতামতটাও বিক্রি হয়ে যাবে।

দণ্ডধরের প্রবেশ

দণ্ডধর। (প্রবেশ করিতে করিতে) কিসের ব্যবসা ? কিসের বেচাকেনা ? (প্রবেশ করিয়া অসীমকে দেখিয়া) এ কি, হুজুর ?

অসীম। হ্যাঁ দণ্ডধর, আমি।

দণ্ডধর। গরীবের ব্যবসায় আপনি হুজুর ?

অসীম। হ্যাঁ দণ্ডধর। কিছু কিনতে এলাম।

দণ্ডধর। কি বলছেন হুজুর! আপনি এলেন কিনতে আমার ব্যবসায় ? (অনন্তকে দেখাইয়া) বলেছেন এঁকে ?

অসীম। বলেছিলাম। উনি বেচতে রাজি নন।

দণ্ডধর। কি এমন জিনিস অনন্তবাবু যে হুজুরকেও বেচতে রাজি নন ?

অসীম। ওঁর একটা মত আছে—আমরা সেটা কিনতে চেয়েছি।

দণ্ডধর। কিন্তু অনন্তবাবু, আপনি বোধহয় জানেন না, একটু আগে আমার মতটা আমি ওঁদের বেচে দিয়েছি।

অনন্ত। খেতে আমরা দুটি প্রাণী সুলতা। যা হোক করে আমাদের চলে যাবে। মলিনা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তবুও—

সুলতা। ঐ যা হোক করে কথাটাতেই আমার আপত্তি অনন্ত।

অসীম। একটা কথা তুমি বার বার ভুলে যাচ্ছ অনন্ত। সাতদিন সাতরাত সুলতা আমার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে।
কিন্তু তার আগের তিন বছর ? তখন আমি আর সুলতা ছিলাম, তুমি ছিলে না। তিন বছরের কাছে সাতদিন সাতরাত কতটুকু সময় অসীম ?

অসীম। দামটা আমি ডবল করে দিচ্ছি অনন্ত।

অনন্ত। আমি তো বলেছি। তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে চলে যেতে পারো। আমি তোমাদের চিনি না।

অসীম। বেশ তাই হোক। তবে বাজারটা একবার যাচাই করে দেখলে পারতে অনন্ত।

দণ্ডধর। আপনি তো আচ্ছা গাধা অনন্তবাবু!

প্রথম। দেশে তোমার বুড়ো বাপ-মা আছে অনন্ত।

দ্বিতীয়। তোমার বোনের নাম মলিনা।

তৃতীয়। সুলতাকে তুমি ভালোবাস অনন্ত।

চতুর্থ। ওদেশে যাবার ইচ্ছে—সেটাও খুব একটা ছোট কথা নয়।

অনন্ত। না না না, তবুও নয়। কিছুতেই নয়। আমি তোমাদের স্বীকার করি না—আমি তোমাদের চিনি না।

হলধর। আজ থেকে আপনার চাকরি নেই অনন্তবাবু।

প্রথম। দেখ অনন্ত—আজ থেকে তুমি বেকার।

দ্বিতীয়। তোমার রুজি-রোজগার চলে গেল অনন্ত।

তৃতীয়। ভেবে দেখ অনন্ত—তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেল।

চতুর্থ। অনন্ত তুমি বেকার···অনন্ত তোমার রুজি-রোজগার নেই···অনন্ত তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেছে।

অসীম। তাই তো বলছি অনন্ত, তোমার মতামতটা বেচে দাও। আমরা চলে যাই—সব যেমন ছিল তেমন হোক।

অনন্ত। (প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আমি তা হলে যাচ্ছি সুলতা। তুমি যদি চাও আমার সঙ্গে আসতে পারো।

সুলতা। কথাটা তো কবার বললে অনন্ত।

অনন্ত। বেশ, তবে তাই হোক।

অসীম। অনন্ত—

অনন্ত। বলেছি তো অসীম, তোমার আমার মধ্যে পরিচয় নেই।

অসীম। কেন বলো তো?

অনন্ত। জঙ্গলের জানোয়ার আর স্বাধীন মানুষ—পরস্পরের মধ্যে কি পরিচয় আছে অসীম।

অসীম। স্বাধীন মানুষটি কি তুমি নাকি?

অনন্ত। নিশ্চয়। আমি, আমার আশ-পাশের লোক, আমাদের আদর্শ, সব মিলিয়ে নিশ্চয় আমরা স্বাধীন। (প্রস্থান)

অসীম। তবু শুনে রাখো অনন্ত। সুলতাকে দরকার হলে আমার ফ্ল্যাটে পাবে। মলিনাকেও দরকার হলে আমার আপিসের খাসকামরায় পাবে। আর আমাকে দরকার হলে বড় রাস্তায় ব্যবসায় পাবে। (ততক্ষণে অনন্ত চলিয়া গিয়াছে)

অন্ধকার

কণ্ঠস্বর। সমস্ত শহরের সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ। দুই মহাবীর গদা হাতে নিয়ে দুটি বড় বৃষের মতো ভীষণ গর্জন করতে করতে আক্রমণ করলেন

পরস্পরকে। সবার দুর্দিনে অন্তরীক্ষ ও ভূগর্ভ, মর্ত্যভূমি ও মহাসলিল একত্রিত হলো। দেব, দৈত্য, দানব, নর, রাক্ষস ও যক্ষ, ত্রিভুবনের যাবতীয় অধিবাসী সমস্তপক্ষকে নিজেদের দর্শকরূপে উপস্থিত করলেন।

আলো আসার আগে নানা কণ্ঠের স্বর

: কি দর যাচ্ছে ?

: কোন্‌টার দর বলব বলো। এক এক জিনিস এক এক রকম।

: সব সব বলে যাও শুনি।

: বক্তৃতার পঁচিশ, লিখে পঞ্চাশ, বই করে একশো, আর দল করে বেঁধে-ছেঁদে অন্য দেশে পাঠালে হাজার।

: দর কমাও দর কমাও, তোমাদের প্রতিপক্ষরা এমনি দিচ্ছে।

: এমনি দিচ্ছে ? হঠাৎ ?

: হঠাৎ তো নয়। তারা বরাবর এমনিই দিয়ে আসছে।

: কিন্তু কেন ?

: তারা বলে ও-জিনিস বেচবার নয়, দেবার। ওটা নাকি সাধারণের সামগ্রী। তাই তো বলছি—দর কমাও, দর কমাও।

আলো আসে। বড় রাস্তার ব্যবসা

অসীম। এক নম্বরে কত গেছে ?

প্রথম। চারশো পঁচিশ।

অসীম। দু নম্বরে ?

দ্বিতীয়। চারশো পঞ্চাশ।

অসীম। তিন নম্বরে ?

তৃতীয়। চারশো পঁচাত্তর।

অসীম। চার নম্বরে ?

চতুর্থ। চারশো।

অসীম। কম কেন ?

চতুর্থ। কখনো কম কখনো বেশি। ব্যবসায় তো এইটেই নিয়ম।

: অনেক দেখা করতে চাইছেন।

অসীম। ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। তুমি কি এখন খাসকামরায় আসবে অসীম? আমি কি তৈরি হয়ে থাকব?

অসীম। একটু বাদে যাব। অনন্ত এসেছে।

অনন্তর প্রবেশ

মলিনা। অনন্ত! (অনন্ত কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা অসীমের কাছে এগিয়ে আসে)

অসীম। তারপর অনন্ত, কি মনে করে?

অনন্ত। মলিনাকে নিয়ে যেতে এলাম।

মলিনা। কিন্তু আমি তো যাব না অনন্ত। আমি এখানে বেশ আছি।

অনন্ত। মলিনা এখানে কি করে অসীম?

অসীম। কেন? আমার খাসকামরার খাস চাকুরে।

অনন্ত। তার মানে দিনে মলিনা আর রাতে সুলতা?

অসীম। তোমার যেমন ইচ্ছে মানে করে নিতে পারো।

অনন্ত। তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে নাও মলিনা।

মলিনা। তোমায় তো বললাম অনন্ত—আমি যাব না।

অনন্ত। মলিনাকে কি তুমি বিয়ে করবে অসীম?

অসীম। কিছু তো ঠিক করি নি। কদিন যাক। তারপর হয় মলিনা, না হয় সুলতা। কিংবা…হয়তো দুজনের কেউই নয়।

মলিনা। শুনলাম, তোমার নাকি চাকরি গেছে অনন্ত।

অনন্ত। তাতে কি এসে গেল। তোমার চাকরি তো রয়েছে।

মলিনা। সত্যি অনন্ত। অনেকদিন বাদে ভালো কাজ পেয়েছি। খাসকামরার খাসচাকুরে। ভালো খাওয়া, ভালো থাকা…জানলে অনন্ত…দেশে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাচ্ছি।

অনন্ত। জানি। তোমার টাকার ওপর অসীমের টাকা। দেশে এখন বেশ ভালো টাকাই যাচ্ছে।

মলিনা। আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ অনন্ত।

অনন্ত। জিনিস বিক্রি করলে দালালে কমিশন কাটে। দেখছি কমিশনের ছাপ মুখের ওপর পড়েছে কিনা।

মলিনা। আমি তো কিছু বিক্রি করি নি অনন্ত। আমি যুবতী। যৌবনের ধর্ম পালন করছি।

অনন্ত। নিজেকে তুমি মিথ্যে বোঝাচ্ছ মলিনা। তোমার যৌবন তুমি বিক্রি করছ।

মলিনা। এতদিন তো দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে এলাম অনন্ত। কিছু লাভ হলো কি।

অনন্ত। তাই বলে এই বেচা-কেনার হাটে নামবে?

মলিনা। সেটাই তো স্বাভাবিক। বেচা-কেনার কাল। ভালো দাম পাচ্ছি, বেচছি। আমি খুব সুখে আছি অনন্ত। তুমি যাও।

প্রথম। আমরাও তো সেই কথাই বার বার করে বলছি।

দ্বিতীয়। বলছি তো—তোমার মতামতটাও তুমি বেচে দাও।

তৃতীয়। বেচে দাও—দেখবে সুখের আর অবধি নেই।

চতুর্থ। বেচে দাও—দেখবে সুলতা, মলিনা সব তোমার কাছে ফিরে এসেছে।

অনন্ত। দেশে মার সঙ্গে দেখা করেছিলাম অসীম। দেখলাম, সেখানেও তোমার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত।

অসীম। কেন—মা কিছু বললেন?

অনন্ত। বললেন—অসীম আমার কেউ নয়—তবু যেন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি।

অসীম। তোমার জামাকাপড়গুলো বদলে ফেল অনন্ত। বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে গেছে। (কলিং বেল টিপিতেই একজন লোক জামাকাপড় লইয়া আসে)

অনন্ত। (জামাকাপড় লইয়া অন্তরালে চলিয়া যায়। অন্তরাল হইতে) কি ভাবছ বলব অসীম?

অসীম। কি বলো তো?

অনন্ত। জামাকাপড় বদলে আমাকে সমান করে নিলে—তাই না?

অসীম। যদি বলি, তাই? খুব ভুল হবে কি?

অনন্ত। কিন্তু সমান করে নেওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন?

অসীম। সমান সমান না হলে লড়ায়ে মজা হয় না।

অনন্ত। (বাহিরে আসিয়া) সত্যিকারের সমান করে নিয়ে লড়াই করতে পারবে অসীম?

অসীম। হুকুম করেই দেখ।

অনন্ত। তামিলটা কে করছে।

অসীম। কেন আমি—তোমার বান্দা।

অনন্ত। ঠাট্টা করছ ?

অসীম। হুকুমটা করেই দেখ।

অনন্ত। তাহলে সত্যিকারের সমান হয়ে নিই। তারপর নতুন পর্বাকে লড়াই। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

অসীম। যা তোমার অভিরুচি।

অনন্ত। তাহলে হুকুমই একটা করছি—

অসীম। বললাম তো এক্ষুণি তামিল হবে।

অনন্ত। তোমার ব্যবসাটা এখন থেকে আমার।

অসীম। বেশ তাই হলো।

অনন্ত। (চারজনকে দেখাইয়া) এদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক অসীম ?

অসীম। এদের আলাদা ব্যবসা। এদের ব্যবসার সঙ্গে আমার ব্যবসা মিলে এই বড় ব্যবসা।

অনন্ত। আজ থেকে এদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম। মনে রেখ আমি কিং এণ্ড কিং—

দ্বিতীয়। আমি সমুলকা এণ্ড গোমূলকা—

তৃতীয়। আর আমি হরচন্দ্র এণ্ড সন্—

চতুর্থ। আর আমি কে জানো তো ? ব্রাদার্স লিমিটেড।

অসীম। তবু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অনন্ত। তোমার ব্যবসার কর্মচারী কত অসীম ?

অসীম। ছশো।

অনন্ত। তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ?

অসীম। যা সর্বত্র হয়ে থাকে। গোলোযোগের।

অন্তরালে

কমরেডস—লড়াই আমাদের শুরু। আপনারা প্রত্যেকে ভেবে দেখুন কমরেডস—ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। অথচ মাইনে যা পাই তাতে কোনোরকমে বাঁচাও সম্ভব

নয়—ভালোভাবে বাঁচা তো দূরের কথা। কমরেডস—আপনারা আপনাদের ব্যক্তির কথা ভেবে দেখুন—ভেবে দেখুন আপনাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা। অশিক্ষা-অনাদর-আবর্জনা তাদের জীবনের নিত্য উপকরণ। সভ্যজগতে বাস করেও সভ্যতার শরিক হবার জন্য ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারে নি। তাই কমরেডস—আমাদের মজুরি বাড়ানোর দাবি, আমাদের পুজো বোনাসের দাবি। দাবি আমাদের ন্যায়যুক্ত হবেই—কমরেডস—হার আমরা মানতেই পারি না।...ইন কিলাব জিন্দাবাদ...ইন কিলাব জিন্দাবাদ...আমাদের দাবি মানতে হবে...আমাদের দাবি মানতে হবে...

অনন্ত। তোমার সঙ্গে ওদের আয়ের তফাৎ কত অসীম?

অসীম। অনেক।

অনন্ত। আজ থেকে তফাৎটা বাদ দিয়ে দাও।

অসীম। তাই দিলাম অনন্ত। (কলিং বেল টিপিলে একজনের প্রবেশ) আজ থেকে এই ব্যবসার সমস্ত আয় সবায়ের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়ে যাবে। (লোকটির প্রস্থান)

অন্তরালে

আমরা পেয়েছি কমরেডস। কিন্তু শুধু এ পাওয়ায় বিশ্বাস নেই। ধর্মঘটের নোটিশ আমরা তুলে নিচ্ছি—কিন্তু দাবি হিসেবে এই পাওনাকে আদায় করে নেওয়ার কর্তব্য আমাদের রইল কমরেডস... ইন কিলাব জিন্দাবাদ ...ইন কিলাব...

প্রথম ও দ্বিতীয়। (একসঙ্গে) এ রকম চুক্তি তুমি করতে পারো না অসীম—

অসীম। আমি তো করি নি—মালিক করেছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ। তোমার অনেক জোচ্চুরির হিসেব এখন আমাদের হাতে।

অসীম। সে হিসেবের বোঝাপড়া এখন মালিকের হাতে।

চারজন। (একসঙ্গে) আমরা বিশ্বাস-ভঙ্গের মামলা দায়ের করব।

অসীম। করতে পারো তোমাদের যা ইচ্ছে। মালিকের হুকুম তামিল করা ছাড়া এখন আর আমার কোনো কাজ নেই।

অনন্ত। সুলতাকে ডাকো অসীম।

অসীম। সুলতা—

সুলতা । ডাকছিলে অসীম ?

অসীম । আমি তো ডাকি নি—মালিক ডেকেছেন।

সুলতা । কে মালিক ? অনন্ত ?

অসীম । হ্যাঁ সুলতা।

অনন্ত । এখন আমাকে বিয়ে করবে সুলতা ?

সুলতা । নিশ্চয় করব। বিয়েতে তো আমার আপত্তি নেই অনন্ত। যব আমার মালিক হলেই হলো।

অনন্ত । এখন আমার সঙ্গে ফিরে যাবে মলিনা ?

মলিনা । না অনন্ত—সেটা আর হয় না। নিজেকে বিক্রি করেছি—কিন্তু কোথায় যেন অসীমকেই ভালোবেসেছি।

অনন্ত । দুটো বিয়ের যোগাড় করো অসীম।

অসীম । কার কার অনন্ত ?

অনন্ত । একটা তোমার আর মলিনার, আর একটা আমার আর সুলতার।

অসীম । বেশ তো—সামনেই আদালত—চলো যাওয়া যাক।

সামনেই আদালত

বিচারক । আজ কটা মামলা।

মুনশী । তিনটে হুজুর।

বিচারক । কি কি ?

মুনশী । দুটো বিয়ের, একটা বিশ্বাসভঙ্গের।

বিচারক । বিশ্বাসভঙ্গটাই আগে হোক। শেষে বিয়ে দেওয়া যাবে।

মুনশী । বিশ্বাসভঙ্গের মামলা হাজির ?

চারজন । (একসঙ্গে) হাজির হুজুর।

বিচারক । কিসের নালিশ তোমাদের ?

চারজন । (একসঙ্গে) বিশ্বাসভঙ্গের হুজুর—

বিচারক । নালিশ কার নামে ?

চারজন । (একসঙ্গে) প্রথমে ভেবেছিলাম অসীমের নামে, কিন্তু এখন দেখছি অনন্তর নামে।

বিচারক । নালিশের আবার আগে-পরে আছে নাকি ?

চারজন । (একসঙ্গে) প্রথমে মালিক ছিল অসীম হুজুর, কিন্তু এখন অনন্ত।

বিচারক । চুক্তিটা ভেঙেছে কে ?

চারজন । (একসঙ্গে) অনন্ত।

বিচারক। কি করেছ তুমি ?

অনন্ত । তেমন কিছু তো করি নি।

বিচারক। (অসীমকে) তুমি জানো ও কি করেছে ?

অসীম । ব্যবসার সমস্ত আয় সকলের মধ্যে সমান করে ভাগ করে দিয়েছে।

বিচারক। এতে কোন্ চুক্তিটা ভঙ্গ হচ্ছে ?

চারজন । (একসঙ্গে) আজ্ঞে সোনার কন্ট্র এণ্ড হারার প্রফিটের চুক্তিটা।

বিচারক। সর্বনাশ! এ চুক্তি তো জাতির মেরুদণ্ড! আসামী অনন্তরাম— তোমার আজীবন কারাদণ্ড। (কলম ভাঙিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মুনশীর ইঙ্গিতে দুইপাশ হইতে দুইজন পুলিস অনন্তকে লইয়া গেল)

মুনশী আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। হুজুর অনার ফিরে এসেই বিয়েটা দিয়ে দেবেন।

অসীম বিয়ে? বিয়ে তো আর হবে না।

মুনশী বা রে! আমার মিষ্টিটা—

অসীম এই টাকায় কিনে খেও। (চারজনকে) কি রকম হল ?

চারজন । (একসঙ্গে) এমনটি কখনও হয় নি।

অসীম । ব্যবসার কি খবর ?

চারজন । (একসঙ্গে) রেল কি চাকা নেহি চলে গা—

অসীম । মানে ?

চারজন । (একসঙ্গে) মানে আবার কি—ধর্মঘট।

অসীম । চলো তাহলে ফেরা যাক।

চারজন । (একসঙ্গে) চলো—

সুলতা । আমি কি তোমার সঙ্গেই যাব অসীম ?

অসীম । নিশ্চয়!

সুলতা । কিন্তু আমার দিনের আলোর অনন্ত অসীম—

অসীম । তার কথা তো শুনলে সুলতা—

সুলতা । কিন্তু আমার অনন্তর কথা আবার মনে পড়ছে অসীম তোমার সঙ্গে যাওয়া তো আমার হলো না। (প্রস্থান)

অসীম । সুলতা—

মলিনা । আর আমি অসীম ?

অসীম। তোমাকে তো নিতে পারব না মলিনা।

মলিনা। কেন অসীম?

অসীম। ঐ যে তুমি বললে—বিক্রিও করেছ—ভালোও বেসেছ।

মলিনা। তাহলে আমার দামটা মিটিয়ে দাও অসীম।

অসীম। নিশ্চয়। কটা দাম পাওনা আছে তোমার?

মলিনা। খাসচাকুরে থাকাকালীন চারটের।

অসীম। এই নাও।

বড় রাস্তায় ব্যবসা

অসীম। কই, এবার বোতল বার করো।

প্রথম ও দ্বিতীয়। তা না হয় করছি—কিন্তু ওদিকে—

অসীম। ওদিকে? ওদিকে আবার কি?

তৃতীয় ও চতুর্থ। ঐ যে বললাম—রেলকা চাকা নেহি চলেগী—

অসীম। মানে?

চারজন। (একসঙ্গে) মানে—ধর্মঘট—

অসীম। ধর্মঘট! যত সব ক্লীবের দল! (টেবিলে আঘাত করিয়া বোতল ভাঙে। পান করিয়া) লড়ায়ে আমার জিত।

এমন সময় মেঘ গর্জনের ন্যায়

ইন কিলাব—

জিন্দাবাদ—

অনন্ত রায়ের—

মুক্তি চাই—

ইন কিলাব—

জিন্দাবাদ—

অসীম। কি চাই তোমাদের?

মলিনা। অনন্তরায়ের মুক্তি।

অসীম। কিন্তু মলিনা, তুমি?

মলিনা। শুধু আমি নই অসীম, সুলতাও আছে।

অসীম। সুলতা তুমি?

সুলতা। শুধু আমি নই অসীম—আমার সঙ্গে এরাও আছে।

ঃ মলিনা বিক্রি করেও ভালোবাসতে পারে। তাইতো মলিনা আমাদের সঙ্গে। চাঁদের লণ্ঠনের আলোয় তোমার শয্যা মুলতার আশ্রয়—তাই সূর্যালোকের পথে সে আমাদের পতাকাবাহী।

অসীম। কিন্তু অনন্তরামের মুক্তি? সে মুক্তির মালিক তো আমি নই।

ঃ তবু সে মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে। ও বিচারক তোমার—ও বিচারকক্ষ তোমার। ও বিচার তোমারই করা—ও রায় দেওয়াও তোমার। তাই প্রাণ দিয়েও ও মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে।

ঃ ইন কিলাব—

ঃ জিন্দাবাদ—

ঃ অনন্তরামের—

ঃ মুক্তি চাই—

ঃ ইন কিলাব—

ঃ জিন্দাবাদ—

(অসংখ্য লোকের মিছিল চারজনের সঙ্গে অসীমকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিয়া দেয়। তারপর ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলের প্রস্থান। সঙ্গের চার জনের কোনো চিহ্ন নাই। মঞ্চে অসীম একা। যুদ্ধ-ক্লান্ত পরাভূত অসীম)

আলো কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠস্বর। আর সেই বিশাল প্রান্তরে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী যুদ্ধান্তে ভগ্নোরু হয়ে পড়ে রইলেন দুর্যোধন। কোথায় আজ তাঁর মিত্রেরা? কোথায় আজ তাঁর স্বজনবর্গ? কোথায় তাঁর রাজ্য ও ধনসম্পদ? কঠিন প্রান্তরভূমি আজ তাঁর শয্যা, অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার আকাশ আজ তাঁর চন্দ্রাতপ, হিংস্র শ্বাপদের দল তাঁর পরিচারক।

যবনিকা

শতবার্ষিকী বৎসরে আবেদন

যিনি সর্বদেশের মানুষের মহান বন্ধু, স্বাধীনতা ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রপথিক—সেই মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের স্বদেশবাসী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার জন্য আমরা, ভারতবর্ষের লেখক শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা, আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তিউৎসবে রবীন্দ্রমেলায় সমবেত হয়েছি। যে মানুষ নিজের জোরে ও বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করেছেন, হৃদয় দিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানুষ সর্বজগৎ-কে মুগ্ধ করেছেন, সকল মহাদেশপরিব্যাপ্ত সেই মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁর রচনায় প্রতিধ্বনিত। মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি কোনোদিন। তাঁর সেই বিশ্বাসে উদ্দীপিত আমরা এখানে সমবেত হয়ে সমস্ত মানুষের উদ্দেশেই জানাই আমাদের অভিনন্দন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের জনগণ, আমরা আপনাদেরই অংশ, আপনারা আমাদের। আপনারাই আমাদের প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার মহান উৎস।

আজ থেকে একশ বছর পূর্বে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই শহরে সমবেত হয়ে আমরা আপনাদের—সমস্ত দেশের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণকে অভিবাদন করি। সৃষ্টি ও মানবপ্রকৃতির পথে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসাবে আপনাদের জানাই অভিনন্দন। শিল্প ও বিজ্ঞানের সহকর্মিগণ, আসুন আমরা শান্তি ও স্বাধীনতার ব্রতে নতুন করে আমাদের নিয়োজিত করি। কবির কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি—শান্তি এবং স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই শিল্প পায় কৈবল্য আর মানুষের ঐতিহ্য হয় নিরাপদ। আমরা ঘোষণা করি মানব উত্তরাধিকারের এই সংগ্রাম, মানবিক আদর্শপূর্তির এই যুদ্ধ, এই যুদ্ধই আমাদের যুদ্ধ, আমাদের একমাত্র যুদ্ধ, এই যুদ্ধই বরণীয় যুদ্ধ।

আফ্রিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং জনগণের উদ্দেশে

'ছায়ামুক্তা' মহাদেশের বন্ধু, আমরা, এই নগরী থেকে আমাদের মৈত্রীপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আফ্রিকার বন্ধুগণ, আধুনিক যুগের আলোর পথযাত্রী আপনাদের অভ্যুত্থানে আমরা উল্লসিত। ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে মুক্তিসংগ্রামে আপনারা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, নতুন পৃথিবী রচনায় আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব, অপেক্ষা করে আছি আপনাদের জন্তে, সভ্যজগতে যে আনন্দ, উন্মাদনা এবং যৌবনোচ্ছল সজীবতা আপনারা এনে দেবেন, তার জন্তে। আপনাদের স্বচ্ছন্দ মহৎ অবদান ছাড়া এই সভ্যতা খণ্ডিত।

এশিয়ার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের অভিনন্দিত করি এশিয়ার মহান দূত রবীন্দ্রনাথের নামে। আপনাদের শিল্পের ঐতিহ্য সভ্যতার বিকাশকে পরিপুষ্ট করেছে। আপনাদের রয়েছে মর্মলোকবিজয়ী ইতিহাস। আসুন, মানুষ এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে আমরা আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনি, মানুষ এবং তার ভবিষ্যতে রাখি অনন্ত আস্থা। আসুন, সেই ভবিষ্যৎ আমরা নির্মাণ করি যা অতীতের এশিয়ার মতো মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর।

লাতিন আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের ভাগ্য নতুন করে রচনা করার লগ্ন সমাসন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা ও জাগতিক নতুন পৃথিবী নতুন নিয়তির ইঙ্গিত দান করবে, নতুনতর মানবেতিহাসের সম্ভাবনাকে করবে সুনিশ্চিত। সেই সঙ্গে আপনাদের এই ইতিহাসরচনার আনন্দ, গৌরব ও মহান দায়িত্বভার আমরাও গ্রহণ করছি।

ইওরোপ এবং উত্তর আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আধুনিক ইতিহাস এবং মুক্তি ও সাম্য, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার বার্তাবহ আধুনিক মানবতাবাদের জয়পতাকা উত্তোলনের গৌরব আপনাদের রয়েছে। এই শক্তি নিয়ে আপনারা পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির সঙ্গে আরও এগিয়ে চলুন, এই আবেদন করি। আমাদের মহান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় স্বপ্ন তাহলেই সার্থক হবে।

সর্বোপরি পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবী, কর্মী এবং জনগণ, আপনাদের প্রতি আবার আমাদের আবেদন এই, যে-রূপ মন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু সম্বল, সেই মন্ত্রই হোক আমাদের পথের দিশারী। আসুন, মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের গুরুদেবের এই মানসিকতায় প্রণোদিত হয়ে আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবাহী বর্তমানের জন্য, শিল্পীর ব্রত পালনের জন্য এবং যুদ্ধহীন মুক্ত শান্তির পৃথিবীর জন্য আত্মনিয়োগ করি।

শান্তি, শান্তি, চিরশান্তি।

পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব ও মেলায় সমাপ্তি অধিবেশনে (১২ই নভেম্বর ১৯৬১) সারা বিশ্বের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণের প্রতি এই আবেদনটি গৃহীত হয়। মূল ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছেন শিবশম্ভু পাল। —সম্পাদক

দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ॥ বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সাড়ে ছয় টাকা ॥

পত্রলেখার বাবা ॥ সতীনাথ ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চার টাকা ॥

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর। ত্রিবেণী প্রকাশন। চার টাকা ॥

আলোচ্য তিনটি বইয়ের মধ্যে প্রথমটি উপন্যাস, দ্বিতীয়টি ছোটগল্পের সমষ্টি ও তৃতীয়টি স্মৃতিকথা। কিন্তু স্মৃতিকথা হলেও শেষের বইটিকে প্রায় কথাসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কেননা এই বইটির বিশিষ্ট রস প্রায় পুরোপুরি কথাসাহিত্যের।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে আরও একটি সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি বইকেই বলা যেতে পারে পোর্ট্রেট-গ্যালারি। নানা জাতীয় লোকের ভিড়ে এই তিনটি বই ঠাসা—অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইটি।

বিশুবাবুর বইটিতে মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু তারা প্রায় সকলে একই ছাঁচে ঢালা। প্রথমত এরা সকলেই যুবক-যুবতী; দ্বিতীয়ত দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করে নানা দুঃসাহসিক কাজে শুধু লিপ্ত নয় লিপ্তপ্রায়। তৃতীয়ত, বিচিত্র বিপদের সম্মুখীন হলেও কোনো-এক অদৃশ্য জাদুকরের আশীর্বাদে বিপদের স্পর্শ এরা সর্বদা এড়িয়ে চলে। এর পর বোধহয় এ কথা বলা বাহুল্য যে, যেহেতু এরা যুবক-যুবতী অতএব এদের পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ কিঞ্চিৎ প্রবল। কিন্তু তবু এদের মিলন হয় না অর্থাৎ উপন্যাসটির পরিসরের মধ্যে। এই পরিসর নিতান্ত সামান্য নয়। সলপাইকায় ছাপা ডিমাই সাইজের চারশো তিন পাতা। আরো মাত্র দু-চার পাতা বাড়লে যে মিলন হত লেখক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা যদিও সশস্ত্র পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ থেকে এরা অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পায় তবু শেষপর্যন্ত এইসব ঝামেলা বরদাস্ত করবার মতো শক্তি বা প্রবৃত্তি এদের কারও নেই। অতএব শেষপর্যন্ত এইসব দুঃসাহসিক

যুবক-যুবতীর নেতার বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে স্বদেশ উদ্ধারের প্রশস্ততম উপায় জাহাজে চড়ে বিদেশে পলায়ন; এবং জলপথে নায়কনায়িকার মিলন। এর ব্যতিক্রম দু-একটি আছে, তা অতীব শাস্ত্রীয় এবং সে শাস্ত্র হল কামশাস্ত্র।

বইটির নামকরণে লেখক বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন—আর কোথাও নয়।

'পত্রলেখার বাবা' ও আরও আটটি গল্প নিয়ে দ্বিতীয় বইটি রচিত। এই নয়টি গল্পে এমন-সব নরনারীর সাক্ষাৎ মেলে যারা এই পৃথিবীরই লোক বলে মনে হলেও মাঝে মাঝে যেন একটু সন্দেহ হয় কেননা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এদের খাপখাওয়ানো একটু শক্ত। বাস্তব জগতের বাইরে না হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে এদের জীবনযাত্রা। সতীনাথবাবু জাগরীর জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এরপর মনে হয় যেন আরও কিছুদূর এগোলে তাঁকে ভিড়তে হবে সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন যাঁরা—তাঁদেরই দলে। কেননা বাংলা কথাসাহিত্যের পুরোনো ধারা নিঃসন্দেহে ফুরিয়ে এসেছে—আর তাই তাগিদ এসেছে নতুন পথের সন্ধানের, যার ফলে হচ্ছে কিছু সৃষ্টি আর কিছু অপসৃষ্টি। এই তাগিদে সৎ ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরা যদি তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করেন তাতে ক্ষতি কী?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন অন্তত একটি উপন্যাস প্রায় প্রত্যেক লোকেই লিখতে পারে। 'সান্নিধ্য' উপন্যাস নয় স্মৃতিকথা। কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে সেই মালমশলা নিয়ে একটি রীতিমত উপন্যাস লেখা যেতে পারত মনে হয়। বহুদিন আগে এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই রাখালচন্দ্র সেন 'সহযাত্রী' বলে একটি গল্প লিখে আমাদের চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন—এরকম গল্প আর কখনো পড়ি নি—বাংলাসাহিত্যের সত্যকারের নতুন সৃষ্টি। অনেকেরই মনে হয়েছিল এটি গল্প নয় সত্যিকারের কাহিনী।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি করের 'সান্নিধ্য' পড়ে বার বার মনে পড়েছে সেই 'সহযাত্রী' গল্পটির কথা।

লেখক প্রখ্যাত শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষার জন্যে আড্ডা গেড়েছিলেন প্যারিস শহরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে। সে-সময়ে তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল নানাদিগ্‌দেশাৎ আগত বিচিত্র সব নরনারী। তাদের মধ্যে কেউ-বা

এসেছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধের থেকে পালিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে, কেউ-বা পূর্ব-ইওরোপ থেকে প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যালয়ের আকর্ষণে।

এদের মধ্যে অনেকেই ছিল তরুণ-তরুণী। সুতরাং মন দেওয়া-নেওয়ার অবকাশ ছিল প্রচুর। এই টানাপোড়েনের মাঝখানে থেকে লেখক এদের নাড়ীর স্পন্দন যা অনুভব করেছিলেন বইটিতে দিয়েছেন তারই বিবরণ। এই বিবরণ শুধু মর্মস্পর্শী নয়, অনেক জায়গায় হয়েছে মর্মান্তিক। কেননা পরিবেশ ছিল শুধু রোমান্স নয় ট্র্যাজেডির উপযোগী।

এইরকম কাহিনীতে পলিটিক্স এসে পড়া অনিবার্য। এবং তা এসে পড়লে কোনো খাঁটি লেখক নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে। এমন কথা কিছু আছে এই বইটিতে যা 'পরিচয়'-এর অনেক পাঠক-পাঠিকার কাছে অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর লাগতে পারে।

চিন্তামণিবাবু যে খাঁটি কথাশিল্পী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-রকম বই কি তিনি আর একটিও লিখতে পারবেন?

হিরণকুমার সান্যাল

রাণীপালঙ্ক ॥ বিজন ভট্টাচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। আড়াই টাকা।

রাজনৈতিক ভূগোলের বিচারে অবশেষে বাঙলাদেশ দুটি ভাগে বিভক্ত হল, এবং ঢাকা-নবাবগঞ্জের মঙ্গলাকাশিয়া যোগেশ্বরকে এসে উঠতে হল কলকাতার কোনো এক উদ্বাস্তু কলোনীতে। সঙ্গে এইল গ্রামসম্পর্কের লোকজন, নিজের সংসার ও অখণ্ড বাঙলার পাড়-গঞ্জিয়ার খোলা মেজাজ।...কিন্তু নিজেকে যোগেশ্বর মেলাতে পারে না এই নতুন কলোনী জীবনের অহেতুক, আরোপিত দারিদ্র্যে। আর তাই গঙ্গার নাম তার মুখে আসে না, বলে—কালীদহ। বলে, "কালীদহ-ই তো, গঙ্গা তো কয় না মুখে। সেই কালীদহেই না ডুবাইয়া আইলাম যেবাক স্বপ্ন সাধ।"...তথাপি রাত্রের কলোনীর উপর তাড়াটে গুণ্ডার পাশবিক আক্রমণে, এবং দিনমানে শহর কলকাতার শরণার্থীদের ডাকে ক্রমে ছত্রভঙ্গ-হয়ে-যাওয়া উপনিবেশের মানুষ-গুলোকে সে আবার জড়ো করে, জুড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। আশার কথা শোনায়। কিন্তু শান্ত জীবনের কথা শোনবার কান তখন আর নেই তাদের। ক্ষতবিক্ষত হতে হতে একদিন তারা 'গেরিলা' হবে স্থির

করেছে, অর্থাৎ গেরিলাযুদ্ধে একবার মেরে দেখবে বাঁচার এই লড়াই জেতা যায় কি না। আর অবশিষ্ট একটা অংশ আপোসে উচুমহলের চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করেছে।—এই দুইদিকের দোলাচলে অভিজাত কাঠের কারিগর বৃদ্ধ যোগীবর সূত্রধর চিন্তিত হয়ে পড়ে। এবং আকস্মিকভাবে, একদিন, প্রায় সরাসরি ঐ অসুস্থ অক্ষম শরীরেই বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে। আপোসে সে রাজি নয়। কাজ সে পায়, এক কাঠের কারখানায়। কিন্তু তার ভিতরকার শিল্পীর সূক্ষ্মতা এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নির্মমভাবে আহত হয়। যোগীবর তবু সংসারে সুস্থতা আনবার চেষ্টায় অমানুষিক পরিশ্রম করে যায়। অতঃপর অসুখে পড়ে সে। এবং মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নের মতো ভেসে আসে তার নিজের প্রথমজীবনের অপরূপ সৃষ্টি 'রানীপালঙ্ক'-র স্মৃতি, আচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর দিয়ে বয়ে যায় সেই একতারা গ্রামের নদী—যার ঢেউয়ে নৌকায় "গোটা একটা ঝাড়লণ্ঠ'নর" মতো আলোয়-আলো ঐ রানীপালঙ্ক সে উপহার পাঠিয়েছিল "বড় রায় জগৎকিশোরের মেয়ের বিবাহবাসরে।" লেখকের বর্ণনায়—"উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে চলকাতে চলকাতে, নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে সেই স্বর্ণ অতীত।" যোগীবরের স্ত্রী সৌরভী এই চোখের ভাষা আন্দাজে বুঝতে পারে, "মেঘনা আর পদ্মার বুকে পাহাড়ের মতো কালো কালো গয়নার নৌকোগুলো যখন আকাশ-গঙ্গা থেকে মর্ত্যের নদীর বুকে নেমে আসে, তখন এমনি করেই দেখতে হয় সেই নৌকো।" রানীপালঙ্কের কারিগর মৃত্যুশয্যায় শেষবারের মতো "তৈরি হয়ে নিল" সমৃদ্ধ যৌবনকালের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। আরো বড়ো ঢেউয়ের থেকে বাঁচবার জন্য বোধকরি জীবনের মাঝে "তৈরি হয়ে নিল" ঢাকা-নবাবনগরের কাঠের যাদুকর যোগীবর সূত্রধর।

প্রসঙ্গত জানানো দরকার, 'রানীপালঙ্ক'-র যাবতীয় সংলাপ লিখিত হয়েছে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায়, অর্থাৎ ওখানকার মাটি-নদীর সকল সৌরভ সহজেই গ্রন্থটিকে পূর্ববঙ্গের মাধুর্যে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে (এবং সেদিক থেকে আমরা তাঁর 'নবান্ন'-র স্বাদ আবার পেলাম)। কিন্তু, যারা 'গেরিলা' হবে বলেছিল, তাদের কথা আর জানা গেল না কেন? অবশ্য পরিবর্তে, আমরা যোগীবরের ক্রমপরিণতি অনুধাবন করলাম, তবু দুঃখের দাহনে নিরুপায়ভাবে পুড়ে মরাটাই কি সত্য? তদুপরি, 'রানীপালঙ্ক' একটি আধা-যন্ত্রণা-বিলাস জাতীয় আচ্ছন্নতা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেছে,

যেটি অন্তত এই গ্রন্থে কাম্য ছিল কি? এবং নানা স্থানে 'নাট্যকার' বিজন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এই উপন্যাসের আঙ্গিক শাকল্য কিছু কিছু খণ্ডিত হয়েছে মনে হল (যদিও ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শানিত গৃহবিবাদটির নাটকীয়তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবিকল। ঐ দৃশ্যটির মর্মান্তিক তীক্ষ্ণ বাস্তবতা এখনো যেন চোখে লেগে আছে)।

বক্তব্যের প্রয়োজনে উপন্যাসটির কোনো-কোনো স্থূলতা তবু অক্লেশে অগ্রাহ্য করা যায়। কেননা, 'রানীপালঙ্ক'-এ সময়োচিত mass literature-এর সবল লক্ষণগুলি আংশিকভাবে বর্তমান, মনে করি। এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি, একতারা গ্রামের ঐ সুদূর করুণ "লাউমাচটিকে" আমরা চিনি।

বিজনবাবুর এই উপন্যাস প্রচেষ্টায় ও বিষয়মহিমায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অতলান্ত ॥ ব্রজেন মজুমদার। দেড় টাকা ॥

রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির ওপর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে অবলম্বন করেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের দীর্ঘ পটভূমিকা থেকে নাটকীয় একটি মুহূর্তকে বেছে 'নয়ে স্বল্প পরিসরে নাট্যরূপায়ণ কদাচিত দেখা গেছে। কথোপকথনের ভঙ্গিতে রবীন্দ্র জীবন কাহিনী বর্ণনার প্রয়াস যে একেবারে হয় নি, তা বলা যায় না কিন্তু সেগুলি নাটক নয়।

'অতলান্ত' নাটকের স্বল্প পরিসরে পাঞ্জাবের তথা ভারতীয় উপনিবেশ ভূমিতে ইংরেজ সরকারের দুর্দমনীয় ও অনাচারের কলঙ্ক-চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই কলঙ্ক-চিত্রের বীভৎসতার চেয়েও বাংলাদেশের রাজনৈতিক কলঙ্কের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলাই বা বলি কেন, তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিকের মানস পটভূমি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় নাট্যিক মুহূর্ত যদি কিছু থাকে, তাহলে 'অতলান্ত' নাটকের এটিই কেন্দ্রীয় ও চরম মুহূর্ত।

ইংরেজের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে সঙ্গে করে বিনা অনুমতিতে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন বলে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, এন্ড্রুজকে দিয়ে এই সংবাদ তিনি প্রেরণ করলেন। কিন্তু গান্ধীজী এন্ড্রুজের মারফৎ জানিয়েছেন যে তিনি এখন ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চান না।

গান্ধীজীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সকল আশা চুরমার হয়ে গেল। একপরে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন বাংলাদেশের দেশহিতৈষী নেতাদের সাহায্যে পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক সভা আহ্বান করবেন, এই উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে সংবাদ পাঠালেন। চিত্তরঞ্জনও এখন সভা ডাকতে নারাজ, মুখে আপত্তি জানালেন যে সভাপতি হবার মতো কেউ নেই। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ জানালেন সভাপতির জন্যই যদি সভা ডাকা না যায়, তাহলে তিনি নিজেই সভাপতি হবেন। "এ কিন্তু সব আপনার দায়িত্বে, আমাদের কিছু নেই এতে" এই বলে দেশবন্ধু বেরিয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক লীলার ও মানসিক সংকটের দ্বন্দ্বে পড়েই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা অত্যুচ্চ শীর্ষতায় আরোহণ করেছে। যৌবনে একদা গান রচনা করেছিলেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে", সেই বাণীকেই শিরোধার্য করে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ অতন্দ্র রাত্রির ভয়ংকর আশাবৃদ্ধিতা সহ্য করে, ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন ইংরেজের ব্যবহারের ও নীতির তীব্র ভৎসনা করে বজ্রগম্ভীর স্বরে জানালেন মানব-সত্যের পরিত্রাণকায় এ অন্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মানবপ্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মহনীয়তা চমৎকার উদ্ভাসিত হয়েছে।

নাটকের এই কেন্দ্রীয় মুহূর্ত শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছে। এর পূর্বে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাসকতা, নাচে গানে নাটকের মাধ্যমে তাঁর আনন্দসত্তার প্রকাশ হয়েছে। এর ফলে পূর্বাংশ অত্যন্ত স্লথ মন্থর অন্য চরিত্রগুলিও যথাযথ ব্যক্ত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের বাগভঙ্গি ও রীতিকে যথাযথ ধরবার চেষ্টা করেছেন, তবে 'সাধে'র ব্যবহার বেমানান। আর অনেক চরিত্র এখনও জীবিত, তাঁদের সঙ্গে আমরা পরিচিত, নাটকে তাঁদের উপস্থাপনা নাট্যরসের অন্তরায় ঘটায় যখনই নাটকের ও বাস্তবের মানুষের তুলনা করি। এবং রবীন্দ্রনাথও এত কাছের মানুষ যে তাঁকে নিয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি কল্পনা করতে বাধে। ফলে নাট্য-রূপায়ণের দিক থেকে বাধা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ 'অতলান্ত'-র অতলান্ততা পাঠের আস্বাদনে, নাট্যশিল্পের যাথার্থ্যে নয়। তবু, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এই মহান পুরুষের মানবিক অনুভূতি সর্বযুক্ত মানব-হৃদয়ে অনন্ত সত্তার সংবেদনা সৃষ্টি করবে।

বাসন্তিক রায়

প্রসঙ্গক্রমে

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার নব-জাগরণের চরিত্র সম্বন্ধে 'পরিচয়'-এ যে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়েছে—তা দেখে আনন্দিত হলাম। মনে পড়ছে ১৯৪৯-এ কতকটা এ ধরনের বিষয় নিয়েই আলোচনা চলেছিল—নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা' এ-ব্যাপারে উজ্জ্বল স্মারক। আজ রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে আবার সেই আলোচনা উঠেছে—তাই সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে সাধারণভাবে কিছু ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছি।

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি, বাংলার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। কথাটির সত্যতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। সত্যিই বাংলার নবজাগরণ হয়েছে বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায়। কিন্তু কথা হল—"আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়েমি"—"অতি দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের স্থবিরতার প্রতিলিপি", উনিশ শতকে তার যে আমূল রূপান্তর দেখা গেল, তা কি শুধুমাত্র শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থাৎ ভাবজগতে? বাংলার নবজাগরণকে আমরা বলে থাকি পুরোপুরি উপরিতলের ব্যাপার—'বাবুকাল্‌চার'। যে বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায় নবজাগরণ হল একটি পরাধীন উপনিবেশে—তা "মাটি থেকে রসগ্রহণ নয়, আকাশের সূর্যালোকের দিকে দুবাহু মেলে দেওয়া?"—একথা মেনে 'নিয়েই শ্রীসুশোভন সরকার বা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। কিন্তু একথা মানতে আমার আপত্তি আছে। মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে "যেমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের অভিমত সেই ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণার ওপরে নির্ভর করে না, ঠিক তেমনি একটি রূপান্তরের যুগকে আমরা সেই যুগের নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করতে পারি না। পক্ষান্তরে, এই চেতনাকেই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের স্ববিরোধের আলোকে, উৎপাদনের সামাজিক শক্তি সমূহ এবং উৎপাদনের সম্পর্ক সমূহের মধ্যে প্রচলিত সংঘাতের আলোকে।"

আমরা ঠিক এর উল্টো পথেই চলেছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শ্রেণী-চরিত্র ও তার চরিত্রের দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র ইতিহাসবিদদের মেজাজে পণ্ডিতী বুলি ও প্রাচ্যাভিমানের বশ নিয়ে তর্কাতর্কি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা নয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মার্কসের ১৮৫৩ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মার্কস দেখেছিলেন ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে কলকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হয়ে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে, যারা ইওরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত, সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন। নিঃসন্দেহে এঁরাই হলেন বাংলার নবজাগরণের প্রতিভূবৃন্দ। এবং এই কথাটির কিছু পরেই মার্কস লিখেছেন, "সেদিন দূরে নয় যখন রেলপথ ও বাষ্পীয়পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা রূপকথার দেশটা এইভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কস অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। করতেন লেনিনও। অনতিদূর ভবিষ্যতে এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির যে পুনরুজ্জীবন ঘটবে—এ বিশ্বাস তাঁদের দুজনেরই ছিল। কিন্তু এই "পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্তর্ভুক্তি"র অর্থ কী?

আমরা জানি, ইতিহাসে বুর্জোয়াসি কী বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছে। তারা পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকেও সভ্যতায়, অর্থাৎ বুর্জোয়া স্বভাব, আওতায় টেনে আনে, এক কথায় নিজের ছায়া (ইমেজ)-এই তারা একটি জগৎ গড়ে তোলে। জাতির বিচ্ছিন্নতা ও আত্মনির্ভরতার জায়গায় আসে বিশ্বের সকল জাতির পরস্পর নির্ভরতা। ভারতে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা পুরাতন এশীয় সামন্তবাদের জায়গায় আনল নতুন পুঁজিবাদ—যার জন্মস্থান ইওরোপ। আর ভারতে ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কঠিন আঘাত হেনে, ভারতকে তার অতীত ঐতিহ্য এবং তার সমস্ত অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক করে দিল। শিল্পের কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত করে, পূর্বতম বংশগত সম্পর্ক বা গৌরবের বদলে কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রচলন করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকেই পাল্টে দিল ব্রিটিশ বুর্জোয়াসি।

আমার তো মনে হয়, এই হল বাংলার নবজাগরণের যথার্থ পশ্চাৎভূমি। এই ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রামমোহন দেখেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া ভারতীয়

পরাধীনের আত্ম ভাবা সম্ভব নয়। বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। জন স্টুয়ার্ট মিলের বুক 'সিসটেম অফ লজিক' সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য পুস্তক করেছিলেন তিনি। বোঝেন নি কে?

কিন্তু পরাধীনতার পাশে থেকে মন কী তৃপ্ত হয়? বরং নিজেদের গ্রহণ শক্তি দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে বিচরণ করে মন শুধু অতৃপ্তিতেই ভরে ওঠে। পশ্চিমের এত আছে, আমাদের কী কিছুই নেই? রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?"

এ-আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু যেখানে "আমরাই বা কীসে কম?" এ-ভাব এসেছে—সেখানেই হয়েছে মুস্কিল। পরাধীনতার অধীনে থেকে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী অনেকের কাছে মহান বলে ঠেকেছে। ঠেকেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছেও। এবং চিরপ্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথও অনেক সময় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। ভারতবর্ষের আত্মীকরণ শক্তিকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বের ত্রাণকর্তার জন্ম হবে—এ বিশ্বাসকে প্রতিক্রিয়াশীল বলছি না। স্বদেশী যুগের হাওয়ায় তিনি যখন ভেসে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি "আমাদের সব ভালো, ইংরেজদের সব খারাপ" ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু তাই চূড়ান্ত নয়। "উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাই নি", এ যেমন তাঁর স্বীকৃতি তেমনি বৃদ্ধ বয়সে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে তিনি বলেছিলেন, "গদ গদ সেন্টিমেন্টালিজম্ এ ভারাক্রান্ত সে আবহাওয়া ক্রমে আবিল হয়ে উঠল, বিতৃষ্ণা এল মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠছেন—খাঁটি যো নয়, যেন খাঁটি, কেঁদে ভাসায় আর কী। অসহ্য হয়ে উঠল আমার। কিছুতেই মিলতে পারলুম না। একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সবল চরিত্র আমাদের দেশে একেবারে বিরল। সে সময়ে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, যখন দেখলুম কত মৌখিক কত স্বার্থ এসব গদগদ বক্তৃতা"—বস্তুত যে শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের হলো, সেই শিক্ষাই তাঁকে একদিন প্রাচ্যাভিমানের বিরুদ্ধে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল—"অন্তরের গভীরতায় অনেকদিন থেকে আছে ইউরোপের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা, তার পরিবর্তে কোনো মূল্য না পাওয়াতেই একেবারে উল্টো দিকে দৌড় মেরেছে। বসে বসে, ওর

বিদ্যে ভালো না, বুদ্ধি ভালো না, চরিত্র ভালো না—আমাদের যা কিছু সবই ওদের চেয়ে অনেক ভালো। সাংখ্য দর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্য থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্র মাত্র হয়ে রয়েছে।" রবীন্দ্রনাথও একদিন উল্টো দিকে দৌড় মেরেছিলেন, কিন্তু সে এক বিশেষ পর্বে—দেশের ভাবালু আবহাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত তিনি ওভাবে কোনো দিনই আর চিরন্তন আদর্শকে যুগোপযুগী করে তোলার চেষ্টা করেন নি, বরং partisan রূপেই লিখেছেন "বর্তমান যুগে ইউরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় ইউরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্ত জাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। ইউরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, ইউরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাঙলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।" (সাহিত্যের পথে)

এত বড় কথা যে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, তা কী শুধু প্রলাপ? তাঁর পায়ের তলায় কি ছিল না শক্ত মাটি? ছিল। জার্মান সাহিত্যের যখন স্বর্ণযুগ, তখন—এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন—জার্মানির অবস্থা "ছিল পূতিগন্ধময় ক্লান্তিজনক অবক্ষয়ী। কিন্তু তখনই জন্মেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন গ্যয়টে ও শীলার, ক্যাণ্ট ও ফিক্‌টে, এবং শেষতঃ হেগেল।" ভারতে যখন সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ছে, ধনতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে বিকৃতভাবে, একপেশে হয়ে—তখন সাহিত্যে শিল্পে যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাঙালী মনের তাকে শুধুমাত্র পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব বলা সঙ্গত নয়। এর ভিতরে রয়েছে পুরাতন সামন্ততন্ত্রীয় ছাপ এবং সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান ধনতন্ত্রীয় চিহ্ন। গ্যয়টে বা শীলারের নাটক কী আমরা অবক্ষয়ী সাহিত্য, সুতরাং উপযুক্ত ভিত্তিভূমি নেই, বলে উড়িয়ে দিতে পারি? তা কখনই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবেই উনিশ শতকের নবজাগরণ বিচারে আমাদের দেখতে হবে—বিকৃত ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। তাই হবে যথার্থ নবজাগরণের চিত্র।

একটি প্রস্তাব

শম্ভুনাথ দাস

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমাপ্ত প্রায়। এক বছর ধরে নানা গুণীজন নানা দিক থেকে কবি সম্বন্ধে নানাকথা বলেছেন। রবীন্দ্রচর্চায় সূত্রপাত আগে থাকতে শুরু হলেও এই বছর কবি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে কবির বাণী সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে পৌঁছেছে। আলোচনায় কবির বাণী নানাভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কবির উদ্ধৃতি সঠিকভাবেই হোক এটা সবারই কাম্য এবং একান্ত প্রয়োজন। কবির মুখে সামান্যতম শব্দের অপপ্রয়োগ অন্যায়। বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্যক্তির উপর সমাজের লোকের আস্থা আছে, তাঁদের রচনায় এই ধরণের বিচ্যুতি নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। উদাহরণ-স্বরূপ বাঙলার অন্যতম বিদগ্ধ সমালোচক গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' সংকলনটির কথা বর্তমানে আলোচ্য। এর মধ্যে চিন্মোহন সেহানবিশ-এর 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান রচনা আছে। কবির জীবনে আন্তর্জাতিক চিন্তার শুরু থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবর্তনের মাধ্যমে এর ক্রমবিবর্তন ধারার সঠিক পরিচয় সার্থকভাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু রচনাটির মধ্যে কবির মুখে এমন কতকগুলি শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার সন্ধান আমরা কোথাও পাইনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েট সাফল্য সম্বন্ধে কবির অন্তিম উক্তি "ওরাই পারবে, দানবকে ঠেকাতে পারবে।" (পৃঃ ২৩৬) চিন্মোহনবাবু বিশ্বভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রশান্তবাবুর প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশান্তবাবুর উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

"" রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] ছিল গভীর আস্থা" যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা: "রাশিয়ার খবর বলো"। বললুম "একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে," মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।"" "বি ভা: ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৫০। পৃঃ ১৬৩) অর্থাৎ কবির মুখে "ওরাই পারবে" টুকুই আছে। এরপর "দানবকে ঠেকাতে পারবে" এই বাড়তি শব্দগুলো কেন চিন্মোহন বাবু বসিয়ে দিলেন?

নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ'-এ এই দিনের ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণিত করেছেন।" "৩০শে জুলাই [১৯৪১]...আমরা ঘরে ঢুকে সামনে যেতেই বললেন "কিহে প্রশান্ত আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা কি ?" উনি বললেন—একটু যেন খবর ভালো। আজকের কাগজ পড়ে তো মনে হচ্ছে যে, রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে। অত তাড়াতাড়ি আর এগোতে পারছে না। শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বললেন, "পারবে, পারবে, ওরাই পারবে। ভারি অহঙ্কার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং, গোয়েরিং এখন দেখুক গোয়েরিং কী হয়। দুর্মরময়া।"" (দেশ ১২ই মার্চ, ১৯৬০। পৃঃ ৪৫১।৫২)

ইলিয়া এরেনবুর্গের কাছে প্রশান্তবাবু কবির এই একই কথাই বলেছেন··· "I knew the Russians will stop them···" (On Tagore—Ilya Ehrenburg in In Homage to Tagore pp. 74)

দেখা যাচ্ছে কোথাও "দানবকে ঠেকাতে পারবে" কথাগুলো নেই। উদ্ধৃতি কথার মধ্যে কবির মুখে এই ধরণের শব্দ বসানোর কারণ কি ? চিন্মোহনবাবুর রচনাটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন হীরেন্দ্র মুখার্জি এবং সম্পাদনা করেছেন সুশোভন সরকার। এঁদেরও কি দৃষ্টি এদিকে পড়েনি ?

দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ (১৯২৬) কবির জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা, এসম্বন্ধে আলোচনা খুবই কম। কবির ভ্রমণসঙ্গীরা এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করে সেই অধ্যায়টি কিছুতেই জনসমক্ষে আনতে চান না। এই প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য আছে। তার আগে এই ভ্রমণকালে ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কবিকে সচেতন করিয়ে দেন বিশেষ অন্তরঙ্গ শিল্পী রোমাঁ রোলাঁ। তাঁর একখানা চিঠি থেকে চিন্মোহনবাবু কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেটাও যথাযথ হয়নি এবং কোথা থেকে তিনি এটা সংগ্রহ করেছেন সেটাও ঠিক বুঝলাম না। চিন্মোহনবাবুর উদ্ধৃতি "···I am more solicitous of your glory than of your repose. I did not like it that the monsters should be able to abuse your name in history....The future will show you that I have acted as a vigilant and faithful guardian—"(pp. 226)।

রোঁলার চিঠিগুলি বিশ্বভারতী থেকে Rolland and Tagore বইতে

প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৫ সনে। এর আগে Alex Aronson তাঁর 'Rabindranath through western eyes' বই-এর মধ্যে ঐ চিঠিখানা নিজে অনুবাদ করে 'unpublished letter' বলে প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪৩ সনে। উদ্ধৃতিটি এইভাবেই পাওয়া যাচ্ছে…"However, I had no other interest in my mind but your glory, which I value more than your rest. I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history…the future (the present already) will show you that I have acted as your faithful and vigilant guide." (Page no 67 of Rolland and Tagore, page 78 of Rabindranath through western eyes—by Alex Aronson এবং রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৮)। চিন্মোহনবাবু উক্ত উদ্ধৃতি কোথায় পেলেন? 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিঠি পৃষ্ঠা ৪৫'-এর কোনো অর্থ বুঝলাম না। হীরেনবাবু চিন্মোহনবাবুর বই থেকে তাঁর 'Himself a true poem' বইতে এই ভুল উদ্ধৃতিটাই দিয়েছেন (দ্রঃ pp 121)। চিন্মোহনবাবুর রচনাটিও ইংরাজিতে পুস্তিকাকারে বেরিয়েছে, 'Tagore and the world' নামে। এই ধরণের ভুল উদ্ধৃতি কবি সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তি আনবে। তাই আশা করি চিন্মোহনবাবু তথা সম্পাদক গোপাল হালদার মহাশয় এবিষয়ে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করে ভ্রম সংশোধনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করবেন।

দুই

চিন্মোহনবাবুর রচনায় কবির ইতালী ভ্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কবির আন্তর্জাতিক চিন্তার একটা মোড় এই ইতালী ভ্রমণকালেই ঘুরে যায়। ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে—রোঁমা রঁলার সহায়তায়—কবি প্রথম উপলব্ধি করেন। কিন্তু কবির সেই ভ্রমণকথা, সেই উৎকণ্ঠিত দিনগুলির বিবরণ এখনও কেন প্রকাশ করা হল না? এবিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া দরকার এবং বিশ্বভারতী তথা প্রশান্তবাবুর নীরবতা ভঙ্গ করার প্রয়োজন আছে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ-এর 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে জানতে পারি—"আমরা ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন য়ুরোপে ঘুরেছিলাম, তখন দেশে এবং বিদেশে কবিকে নিয়ে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালি গিয়েছিলেন বলে শুধু নয়, তিনি ইতালি থেকে বেরিয়ে গিয়ে

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বলে। বিদেশে বিক্ষোভ হয়েছিল তিনি মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য, আর স্বদেশে বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি আতিথ্য ভোগ করার পরে মুসোলিনীর নিন্দা করে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে।"

"আমার স্বামী জানতেন এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের গুরুত্ব কতখানি, তাই তিনি আর রথীবাবু—বিশ্বভারতীর যুগ্মকর্মসচিব—খুব পরিশ্রম হলেও প্রতিদিনকার বৃত্তান্ত যতটাসম্ভব ধরে রেখে প্রত্যেক সপ্তাহের ডাকে বিশ্বভারতীর বুলেটিনে ছাপাবার জন্যে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। লিখতেন বেশীর ভাগই আমার স্বামী (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) আর রথীবাবু টাইপ করতেন।"

"কিছুদিন পরে রথীবাবু শারীরিক কারণে কবির কাছ থেকে অনেকদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন আমরা দুজনে মিলে কত পরিশ্রম করে সেসব লেখা দেশে পাঠিয়েছিলাম তা কেন ছাপা হয়নি জানি না। বিশ্বভারতী পরিচালনার ভার তখন যাদের হাতে ছিল, একথার জবাব তারাই শুধু দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা এক বছর পরে দেশে ফিরে শুনলাম, সে সব কাগজপত্র বিশ্বভারতীর আপিস ঘর থেকেই কোথায় হারিয়ে গেছে।"

"প্রশান্তচন্দ্র সে সব লেখার কোন কপি করে রাখার সময় পায়নি। ...আমি ঘুরতে ঘুরতে যে সব চিঠিপত্র সেই সময় আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে লিখেছিলাম আমার স্বামী সেগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে, তার উপর ভর করে আবার একটা ছবি দাঁড় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তখনও তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব। তাই বিশ্বভারতীর আপিসের দেরাজের মধ্যেই এই গোছাকারে সাজানো আমার চিঠিপত্রের ফাইলটা রেখেছিলেন—সময় পেলে লেখাটা আরম্ভ করবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলেন সেই ফাইলটাও কোথায় অন্তর্ধান করেছে।...এই চিঠিগুলোও যে কেমন করে হারিয়ে গিয়েছিল সে একটা রহস্য।...হঠাৎ একদিন প্রবাসী খুলে দেখলাম তিনি [রবীন্দ্রনাথ] শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন যে, ১৯২৬ সালে যুরোপে ভ্রমণ কালে যারা তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেছিলেন......তারা এই বৃত্তান্তটা কোথাও প্রকাশ না করে কাউকে জানতে দিল না।...এর অল্পদিন পরেই রথীবাবু জানালেন যে বিশ্বভারতীর গুদামঘর থেকে বহু কাগজ-

পত্রের দিকে সেই টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্তটা পাওয়া গেছে।"
(দেশ ১৩৬৬, পৃঃ ৯২১।৯২৩)

কবির European Tour-এর এই হল অবস্থা। কবির এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের গুরুত্ব প্রশান্তবাবু, রথীবাবু, নির্মলকুমারীদেবী সবাই উপলব্ধি করেছিলেন, বহু সহকারে প্রতিদিনকার বিবরণ টাইপ করে পাঠানোও হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্তও প্রকাশিত হল না কেন? প্রথমে এই "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" হারিয়ে যাওয়া, পরে নির্মলকুমারীর চিঠিপত্রের সাহায্যে লেখার চেষ্টা এবং সেই চিঠিগুলোও বিশ্বভারতীর আপিস থেকে অন্তর্ধান হওয়া, অবশেষে প্রশান্তবাবু জানাচ্ছেন "...২১০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে রয়েছি, একদিন টেলিফোনে অপরিচিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার কাছে লেখা কবির চিঠি আমার কাছে আছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি তা প্রকাশ করতে পারি'...পরে বরাহনগরে আমার কাগজপত্র খোঁজ করে দেখলুম যে আমার কাছে লেখা কবির অনেকগুলি চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না।" (দেশ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬০)

এইসব দেখে মনে হয় এর পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে; এবং বিশ্বভারতীর কর্তাব্যক্তিরাই এর সঙ্গে জড়িত। প্রশান্তবাবু, নির্মলকুমারী এ বিষয়ে কেন কিছু লিখছেন না? তাঁরা শুধু বিভিন্ন চিঠিপত্র হারিয়ে যাওয়ার রহস্যজনক খবরই পরিবেশন করছেন। টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্তটা যখন পাওয়া গেল, তা এখনও প্রকাশিত হল না কেন? তাঁদের কি কোনো দায়িত্ব নেই?

আরও আশ্চর্যের বিষয় কবির সেই সময়কার ভ্রমণ বৃত্তান্ত যা অংশতঃ প্রকাশিত হয়েছে এবং কেউ কেউ সেই "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে অসঙ্গতি এবং উদ্ধৃতি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার উল্লেখের মধ্যে মারাত্মক গোলমাল দেখা যায়। যেমন ১৯৫৩ সনে প্রকাশিত Alex Brown-এর 'Rabindranath through Western eyes' বইটিতে সেই সময়কার ঘটনার যে বিবরণ এবং উদ্ধৃতি আছে সেইগুলো সবই P. C. Mohalanabis-এর Notes থেকে নেওয়া। উক্ত বইয়ের ৭২ পাতায় "that Mussolini had saved Italy from utter ruin" উদ্ধৃতি নেওয়া "From a conversation between Rabindranath and Romain Rolland at Villenevve on .6th

June, 1926; as recorded by P. C. Mohalanobis." আবার ৭০ পাতায় "I have been told that this is what actually happened: Mussolini has succeeded in bringiog back law and order for the people. Now they are prosperous……and I was told that all this was due to the forceful personality of Mussolini." (Ibid) ৭৫ পাতায় "While I had been talking to the Duce my guide and interpreter (Professor Formichi) got extremely nervous from time to time so that I did not get an opportunity of having a quiet talk with the Duce." (Ibid).

মাত্র দু বছর পরে ১৯৪৫ সনে—একই Alex Aronson, Krishna Kripalani-র যুগ্ম সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে 'Rolland and Tagore' নামে একখানা বই বেরোয় এবং সেখানে 25th June 1926-এর Conversationটার কিছু শব্দের অদলবদল করা হয়েছে। যেমন law and order for the people-এর স্থলে to the people (P. 91 of Rolland and Tagore), I was told-এর স্থলে I was assured. (P. 91) আর ৭৫ পাতার উক্তিটা এইভাবে পাওয়া যাচ্ছে "while I had been talking with the Duke, from time to time he got extremely nervous so that I did ইত্যাদি (P. 91, 92)। সব থেকে আশ্চর্য Rolland and Tagore বইয়ের "conversation as reproduced here is taken from the records of Rabindranath Tagore's European Tours as preserved in the archives of the Rabindra Bhavan, Santiniketan. We do not know who took down the notes of these conversations at that time. They are obviously incomplete and seem to have been taken down rather hurriedly" (P. XVI).

একই Aronson 1948 সনে জানাচ্ছেন Conversation P. C. Mohalanobis-এর Notes থেকে নেওয়া কিন্তু 1945 সনে সম্পাদক হিসাবে Aronson জানেন না "who took down the notes of these conversations." নির্মলকুমারীর লেখা থেকে জানি প্রতিদিনকার বিবরণ টাইপ করে পাঠানো হত এবং "টাইপকরা বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্ত" "কাগজের তাড়ার নিচে পাওয়া গেছে" এবং কোনো কপি না রেখেই এই বিবরণ

তারা পাঠিয়েছিলেন। Rolland-এর সঙ্গে Conversations-এর সময় মহলা-নবীশ ভিন্ন অন্য কেউ কি ছিল? প্রশান্তবাবু [illegible] [illegible] 'কবিকথা'য় জানাচ্ছেন "১৯২৬ সালে মুসোলিনীর নিমন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছিলেন।...এবার ভিলনিউভিতে দেখা হল রোঁমা রোঁলার আর দুহামেলের সঙ্গে। পরে দেখা হল মাদাম সালভাদোরি (Madam Salvadori) মাদাম সালভামিনি (Madam Salvamini) আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ (Angelica Balbanoff) এই রকম সব লোকের সঙ্গে যাঁরা ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কবি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কি করা যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বারবার লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা ওঁকে ভিলনিউভ থেকে জুরিখ, সেখান থেকে ইন্সব্রুক তারপর ভিয়েনা আর সেখান থেকে প্যারিস নিয়ে গেলাম।...তারপরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন তখন শান্ত হলেন।" ..
(পৃষ্ঠা ১৬১, ১৬২)

তাই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক P. C. Mohalonobis-ই Conversation-এর Notes নিয়েছিলেন এবং "টাইপকরা বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্তে"র মধ্য থেকেই Aronson তাঁর বই-এ কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তথা প্রশান্তবাবু জানাবেন কি দুবছর বাদে এই ধরনের বিভ্রান্তির পিছনে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য আছে? আর টাইপকরা ভ্রমণবৃত্তান্ত "seem to have been taken down rather hurriedly" হয় কি করে? 'Rolland and Tagore' বই-এর conversations অংশের আরম্ভ যেমন হঠাৎ, শেষও তেমনি হঠাৎ। Hurriedly-র দোহাই দিয়ে বিশ্বভারতী কি Census করে কবির রচনা প্রচার করছেন? Aronson-এর বই-এ উদ্ধৃত P. C. Mohalonobis-এর notes-গুলো কোথায় গেল?

Rolland-এর ১১ই নভেম্বর ১৯২৬ সালের এক পত্রে জানতে পারি "Circumstances have forced us to devote a large part of our conversations to discussing contemporary and depressing subjects—that unfortunate Italy"...(Rolland and Tagore

P. 64) [illegible] [illegible] আলোচনাপ্রসঙ্গে "One topic which constantly recurred was the growth of international understanding and amity. Rolland who was much disturbed by the reports which had been broadcasted all over world about the poet's supposed change of view about Fascism, told him about seriousness of the situation." (Annual Report 1927-28. The President's tour in Europe 1926 V. B. d. April 1928). কিন্তু এই সময়কার দুটি conversation-এর মধ্যে একটার "Unfortunate Italy" বা "Seriousness of the situation"-এর কোনো উল্লেখ নেই, অন্যটি হঠাৎ শুরু হঠাৎ শেষ। তাই "hurriedly"-এর দোহাই দিয়ে "large part of our conversation"-এর "large part" এবং "constanty recurred"-এর অংশটুকু census করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কী প্রকাশ করলেন ?

অবশেষে কবির বিবৃতিটি Manchester Guardian-এ প্রকাশিত হয়। সেটা প্রশান্তবাবু বলছেন অসুস্থ কবিকে প্যারিসে আনা হল, "তারপর লেখাটা শেষ করে Manchester Guardian-এ পাঠিয়ে দিলেন।" অর্থাৎ প্যারিস থেকেই লেখাটা পাঠানো হয়। "আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বারবার লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না।" Annual report-এ দেখি Switzerland-এ থাকার সময় "immediately started writing about his experiences in Italy in the form of a letter to a friend in India. Rolland however did not think that the above letter was an adequate condemnation of the Fascist movement and the poet decided to delay its publication." এর পর Austria অবস্থান কালে "He could not wait any longer and gave full expression to his sentiments in the form of a letter to C.F. Andrews which was sent to India. This letter was published in Manchester Guardian early in August 1926." (Vide V. B. d. 1928 April)

তা হলে চিঠিটা কোথা থেকে কোথায় পাঠানো হল। প্যারিস থেকে না অস্ট্রিয়া থেকে ? সোজা Manchester Guardian-এ না to C.F. Andrews-

in India-তে ?" প্রশান্তবাবু "কবিকথা'য় লিখেছেন "ইতালি সম্বন্ধে আমার নিজেকে যাচাই করবো" এবং "ফ্যাসিজম টাইপ করেও যায় ছেপে উঠলো না।" এটা "In the form of a letter" না অন্য কোনো লেখা ?

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতবাবু জানাচ্ছেন "রঁলার নিকট হইতে তিনি ফ্যাসিস্ট ইতালির স্বরূপ জানিতে পারেন।……কিন্তু কবি তখনো খোলাখুলি ভাবে ইতালি সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না। ভারতে তাঁহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র দেন তাহাতে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলেন তিনি মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কার্যকলাপ ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই।" …এবং ১০ই জুলাই ভিয়েনা যান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর "তিনি তাহার কণ্ঠস্বরের সমস্ত শক্তিদ্বারা ফ্যাসিজমকে ধিক্কার দিয়া এক দীর্ঘপত্র এনড্রুজকে লেখেন। সেই পত্রখানি আগস্টমাসের গোড়ায় Manchester Guardian-এ প্রকাশিত হয়।" (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১২১, ১২৩)

C.F. Andrews-কে লিখিত পত্রের সংবাদই আমরা জানি কিন্তু প্রভাত-বাবু কথিত "অত্যন্ত সাধারণভাবে লেখা" "ভারতে তাহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র দেন", সেই চিঠিখানা কাকে লেখা এবং কোথাও কি প্রকাশিত হয়েছে ?

এই সমস্ত নানা কারণে কবির ইতালি ভ্রমণকে রহস্যজনক করে তুলেছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং কবির সেই সময়কার ভ্রমণসঙ্গীরা। "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" প্রকাশিত না হওয়ার পেছনে যে একটা গভীর চক্রান্ত আছে সেটা অনুমেয়। এটা প্রকাশিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কবি মৃত্যুর দু মাস আগেও বলেছেন "এখন তাঁদের এই সংগ্রহীত বিবরণের (European Tour) যথোচিত ব্যবহার হতে কোনো বাধা ঘটবে না" (২১শে জুন '৪১)। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কি "বাধা" অপসারণ করে বিবরণটি প্রকাশ করবেন যাতে করে "যথোচিত ব্যবহার" করা সম্ভব হয় ?

রবীন্দ্রচর্চার পথে এই বাধাকে অপসারণ করার জন্য পরিচয়-এর সম্পাদকের ও পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন। এ বিষয়ে সম্মিলিত হয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা কী অবলম্বন করা যায় চিন্তা করুন।

সংস্কৃতি সংবাদ

মুক্তির পথ

গোয়া মুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বুক থেকে ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ চিহ্নের শেষ অবশেষটুকু এতদিনে লুপ্ত হল। আমাদের লজ্জা, আমাদের গ্লানির একটি স্মারক এতদিনে চূর্ণ হল। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মহান পর্ব এতদিনে সমাপ্ত।

আজ স্মরণ করি সেই মহান দ্রষ্টাদের, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্মরণ করি সেই বরণীয় যোদ্ধাদের, ত্যাগে ও সংগ্রামে যাঁরা ইতিহাস। স্মরণ করি দেশবাসীর বিপুল প্রাণশক্তিকে, ধ্রুবনক্ষত্রের মতো যা ইতিহাসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করেছে। আর স্মরণ করি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সেই শহীদ ও সৈনিকদের।

মাত্র কয়েকঘণ্টায় পাজিমের পতন হয়েছে। সালাজারের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, অমানুষিক বর্বরতা ইতিহাসের রথচক্রে পলকে নিচূর্ণ হয়েছে। 'নাটো'চিহ্নিত অস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পড়েছে। কিন্তু রুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বৃহন্নলা অভিভাবক এই নাটোচক্র শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণই হতে পারে নি।

আর সালাজার গোঁসা করেছেন। পর্তুগালে খ্রীষ্টমাস উৎসব বাতিল হয়েছে। পশ্চিমী জগতের বিদ্বৎমণ্ডল হায় হায় রবে আচ্ছন্ন। বিশাল জমিদারীর বশংবদ নায়েব হঠাৎ বিদ্রোহ করেছে—ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইঙ্গমার্কিন মনোভাব যেন তাই। প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে এমনকি পশ্চিমী সাংবাদিকরাও লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছেন। আর স্বস্তিপরিষদের অধিবেশনে ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সোভিয়েত ভেটোতে। বড় দুঃখে পশ্চিমী গণতন্ত্র আজ আর্তনাদ তুলেছে পৃথিবীতে ন্যায়, অহিংসা, সম্প্রীতি আর রইল না। ইউ. এন. ওর অস্তিত্ব বিপন্ন। কারণ, গোয়া মুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত দেরিতে হলেও আজ গোয়ার ব্যাপারে

যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে, আমরা তাকে অভিনন্দিত করি। ছদ্মবেশী গণতন্ত্রীর দল যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করে নির্লজ্জতা ও বর্বরতার কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে—আর একবার সাম্রাজ্যবাদীচক্র তার প্রমাণ দিল। আর ঔপনিবেশিকতার অবসান, বিকশিত জীবন ও শান্তি—অগ্রগামী এই মানবসভ্যতার পক্ষে, বিশ্বমানবিক মূল্যবোধের পক্ষে, যাবতীয় প্রতিশক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়, অকুণ্ঠ, অতন্দ্র যে মহান্ দেশ ও জনগণ—পুনরপি এই সংকটকালে তাকেও বীরের বেশে দেখা গেল। আশ্চর্য যে জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত এতবড় ঘটনার সমর্থনে কলকাতার পথেঘাটে কোনো সুদৃশ্য, সমুদ্রিত পোস্টার পড়ে নি; বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে কোনো গোষ্ঠীর বিবৃতি প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত যে গোপন হস্ত এর উৎস, সে অধুনা সম্পূর্ণই আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাই জাতীয় ঘটনা তাকে বিচলিত করে না। কিংবা হয়তো সালাজারের মতো সেই অদৃশ্য হস্তও খ্রীস্টানের উৎসব পরিত্যাগ করেছে অভিমানভরে। কারণ পশ্চিমী গণতন্ত্রের নাকখাসে তার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে থাকবে। আর ভারতবর্ষের সমর্থনে চীনের দৃপ্ত বিবৃতি তাই একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য হয় নি।

প্রায় সমকালেই পর্তুগালে সালাজারবিরোধী অভ্যুত্থান নতুন ইতিহাসের যবনিকা উন্মোচন করল। আর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তিকংগ্রেসের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশাগত শতশত প্রতিনিধি গোয়ার মুক্তিতে উল্লাস প্রকাশ করে, পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ ও যুদ্ধভীতি দূর করার জন্য পুনরায় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যুদ্ধজোটের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সম্মেলনে সালাজারবিরোধী অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিকে আলিঙ্গন করে জানালেন—সালাজারই পর্তুগাল নয়।

গোয়া মুক্তির সমকালেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ভারতবর্ষে। একটি প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার ধারাবাহিক সোভিয়েত বিরোধিতা ও কোনো কোনো পরাজয়বাদীর সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতি যে বাংলাদেশের মানসিকতার কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না, তারও প্রমাণ দিয়েছেন কলকাতাবাসী নাগরিক। অপরিসীম আবেগে উদ্বুদ্ধ সেই দেশবাসী প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

মুক্ত মানবতা, বিকাশমান সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ছিল এই সম্বর্ধনার প্রেরণা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতে

পশ্চিমী ষড়যন্ত্রে বিপন্ন ভারতবর্ষের দুঃখে এই দেশটির প্রতি ভালোবাসার, কৃতজ্ঞতাও ছিল এক প্রত্যক্ষ কারণ। মুক্তি ও শান্তির আন্দোলনে প্রথমাবধি প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দেশবাসীর এই অনুরাগ ও আস্থা আজ তাই পশ্চিমী জগতকে পুনরপি চিন্তিত করেছে। প্রত্যাশিত ইঙ্গ-মার্কিন কণ্ঠে আবার নরম সুর বেরিয়েছে।

কিন্তু গোয়ার মুক্তি ও দেশবাসীর সোভিয়েত অনুরাগে ইতিহাসের যে অভিপ্রায় প্রকাশিত, শেষ পর্যন্ত তাকে ভিন্নমুখী করার সাধ্য কারোরই নেই। নানা জটিল ও অসমান পথ পরিক্রমা করতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মৈত্রীর পথই ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বকে পর্বান্তরে পৌঁছে দেবে।

বিয়োগপঞ্জী

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিচিত্র ও কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটেছে। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম নায়করূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনা ও বন্দীদশায় আদালতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে অসহযোগ তাঁর কীর্তি। পরবর্তীকালে বিদেশে ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার প্রয়াসেও তাঁর ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। নানা রাজনৈতিক অভিযানের মধ্যে একসময়ে তিনি লেনিনের সংস্পর্শে আসেন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্যত চিন্তানায়কের। এদেশে মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচারে তাঁর অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় ভূমিকা বর্তমান। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ফ্যাসিবিরোধী, পরবর্তীকালের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘের তিনি ছিলেন এক অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। অতুলনীয় কর্মশক্তির অধিকারী পণ্ডিতমহাশয় লোকচক্ষুর অন্তরালে জ্ঞান ও রসসাধনায় নিরত ছিলেন। সম্পূর্ণ মহাভারতের সটীক অনুবাদ, ক্লাসী সাহিত্যের সুষ্ঠু ভাষান্তর ও বহুবিধ মৌলিক রচনা দ্বারা তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জীবনাবসান হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-পরিচালনার বাইরে ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিও তিনি আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রসমাজ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতা বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

চলচ্চিত্রপ্রসঙ্গ

পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটি নামে নতুন একটি ফিল্ম সোসাইটি তৈরি হয়েছে। চেক কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে এঁদের উদ্যোগে 'বর্ন্ ইন নাইনটিন্‌টুয়েন্টিওয়ান' দেখানো হল। ছবিটি চেক ও জার্মান যুগ্ম উদ্যোগে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ক্ষয় আর বিনাশের মধ্যেও প্রেম এবং মানবিক মূল্যবোধের অনির্বাণতা এই চিত্রের বিষয়। এক ধরনের কবিত্ব ও সারল্যে মণ্ডিত এই চলচ্চিত্রটি বহুলাংশে মনকে স্পর্শ করে।

পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটির ঘোষিত কর্মপ্রণালীকে আমরা অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনকে ব্যাপক ও সুসংহতভাবে সম্প্রসারিত করার ব্রত এঁরা গ্রহণ করেছেন। একথা সত্য এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলন মুখ্যত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীরও অগ্রগণ্য অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সর্বস্তরে সংস্কৃতি ও উদ্দীপনার বিস্তার ব্যতীত আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব নয়। ভালো ছবি দেখানো, ছবির ভাষা বুঝতে সহায়তা করা—এই রুচিনির্মাণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি হতে পারে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্পের চাবিকাঠি আজও যাদের হাতে—তারা দেশবাসীকে স্বভাবতই মধ্যযুগীয় মানসিকতার পাঁকে ডুবিয়ে রাখতে চাইবেন। তাই প্রয়োজন হল শহরতলীতে, মফঃস্বল শহরে, গাঁয়ে, কারখানায় সৎ ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। পীপল্‌স সিনে সোসাইটি এই দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রে ব্যবসাভিত্তিকভাবে, কোথাও বা নিজস্ব উদ্যোগে এঁরা জনসাধারণকে দেশ-বিদেশের মহৎ চলচ্চিত্রাবলীর সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেবেন। অবশ্য পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটি দুটিও ইতিপূর্বে এই দায়িত্ব অল্পাধিক পরিমাণে পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তাছাড়া কলকাতা শহরেও সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ছবি

ব্যবসাগত ভিত্তিতে দেখানো হয় না। কিন্তু ক্রেক, পোলিশ ও রুশ চলচ্চিত্র উৎসব এবং আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত পূর্ব জার্মানির ছবিটি দেখে আমরা তাদের এতদ্‌বিষয়ক আধিপত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছি। কলকাতায় সম্প্রতি প্রদর্শিত চাঞ্চল্যকর 'দি ট্রুথ' ও 'দি এ্যাপার্টমেন্ট' ছবি দুটির উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ এই দুটি ছবিকে যদি মোটামুটি পশ্চিমীজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় গণ্য করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রাবলীর তুলনায় এই পশ্চিমী ছবি কত মামুলি, ফিকে। অথচ এই ছবিগুলি আজও এদেশে সাধারণভাবে অল্প পরিচিত। সম্প্রতি সিনে ক্লাব আঁদ্রে ওয়াজ্‌দার বিশ্ববিখ্যাত 'কানাল' চিত্রটির ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রদর্শনের আয়োজন করে দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ফিল্ম সোসাইটিগুলি যদি এই দায়িত্ব আরো বেশি করে গ্রহণ করেন তাহলে চলচ্চিত্র আন্দোলন যথার্থই শক্তিশালী হবে। পীপলস সিনে সোসাইটিও এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন।

তাঁদের আরও একটি প্রশংসনীয় কর্মসূচীর কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সীনে টেকনিশিয়ানস, যাঁরা প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রাণ —এই শিল্পের নানাবিধ অব্যবস্থার জন্য আজও প্রায় সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় দিন কাটাচ্ছেন। আর্থিক অসাচ্ছল্যের দরুন ও সুব্যবস্থার অভাবে ভালো বিদেশী ছবি দেখার অভিজ্ঞতা এঁদের অনেকের নেই বললেই চলে। যদিও ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাবের সংবিধানে সীনে টেকনিশিয়ানদের জন্য স্বল্প চাঁদায় সভ্যপদের ব্যবস্থা আছে, তথাপি সেই সুযোগ তাঁরা সবিশেষ গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ দেশবাসীর মনে চলচ্চিত্রবিষয়ক উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির সভ্যগ্রহণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফলে পূর্ণ চাঁদা দিয়েও অনেকে এই দুটি ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হতে পারছেন না। তাছাড়া সীনে টেকনিশিয়ানদের জন্য সভ্যসংখ্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদেরও বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

পীপলস্‌ সীনে সোসাইটি এই টেকনিশিয়ানদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যপদ সংরক্ষিত রাখছেন বলে জানা গেছে।

তাছাড়া চলচ্চিত্রোৎসাহী যাঁরা এতদিনেও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটি দুটির সভ্যপদ পান নি, তাঁরাও এখানে সমবেত হতে পারবেন।

পীপল্‌স্ সীনে সোসাইটির এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে তাঁরা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রআন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন। এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবে কার্যকরী হয় কিনা আমরা তা সাগ্রহে লক্ষ্য করব।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও সীনে ক্লাব একই দায়িত্ব গ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি অগ্রসর হন, তবেই তা সম্ভব। কারণ এই ধরনের সংগঠনগুলির সম্পর্ক কখনই প্রতিযোগিতামূলক নয়, পরস্পরের পরিপূরক। ভরসা রাখি পীপল্‌স্ সীনে সোসাইটিও তা অনুরূপ মনে রাখবেন।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি সম্প্রতি নিও রিয়ালিস্ট স্কুলের অগ্রগণ্য পরিচালক ডি সিকার একটি চলচ্চিত্র উৎসব করলেন। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি উৎসবে ডি সিকার প্রদর্শিত চারটি ছবিই এদেশে ইতিপূর্বে ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছিল অথচ ডি সিকার অন্য কয়েকটি ছবি আজও এদেশে প্রদর্শিতই হয় নি। তাই এই চলচ্চিত্র উৎসবে মন ভরে না। অবশ্য প্রতিটি ছবিই বারবার দেখা এক অভিজ্ঞতা।

সিনে ক্লাব দেখালেন ক্রেনস্ আর ফ্লাইং। এই অসামান্য রুশ চলচ্চিত্রের পরিচালক হলেন কালাতোজভ।

একই সময়ে কলকাতায় রুশচলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বোন্দারচুকের 'ফেট অফ এ ম্যান' এবং কালাতোজভের 'দি আনসেন্ট লেটার' আমরা দেখেছি। আর দেখেছি কিছু শর্টস, যার মধ্যে মে দিবসের ডকুমেন্টারি চিত্রটি দেখার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। কিন্তু সোসাইটিগুলির কাছে আমার বিনীত নিবেদন যেন তাঁরা এই ডকুমেন্টারি চিত্রটি পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

কালাতোজভকে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠতম পরিচালকদের অন্যতম বলতে কারোরই দ্বিধা হবে না। 'দি আনসেন্ট লেটার' ও 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং' দেখা বাস্তবিকই এক অভিজ্ঞতা। আর অবিস্মরণীয় শ্রীমতী সামাইলোভা— দুটি ছবিরই তিনি নায়িকা। 'দি আনসেন্ট লেটার'-এর শেষাংশটি বাড়তি। 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং'-এর একদম শেষে বলাকার উপস্থাপনা খানিকটা যান্ত্রিকতাদোষে দুষ্ট। তা ছাড়া এ দুটি ছবির সাফল্য সীমাহীন। দুটি ছবিতেই ফোটোগ্রাফী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যায়। চরিত্রের মানস-

প্রবাহ বর্ণনায় এই ফোটোগ্রাফী ও কম্পোজিশন পরিচালকের অসীম কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছে। দুটি ছবিতেই প্রেমের দৃশ্য কবিতা হয়ে গেছে।

'কানাল', 'এ্যাশেস এ্যাণ্ড ডায়মণ্ড্', 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং' এবং 'বর্ন্ ইন নাইন্টিনটুয়েন্টিওয়ান'—এই ছবিগুলি একটি প্রবন্ধের বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে কিভাবে নাড়া দিয়েছে, বাস্তবতা ও কল্পনার সুষ্ঠু বিন্যাসে চলচ্চিত্র কিভাবে জীবনশিল্প হয়ে ওঠে—আশা করব যোগ্যতর সমালোচক সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী হোয়সিঙ্গারের প্রত্যার্পণের দাবি

১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর মিত্রপক্ষীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল, জার্মান যুদ্ধাপরাধীরা যে-সব দেশে তাদের ঘৃণ্য অপরাধমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত করেছে, সেই সেই দেশে তাদের বিচারের জন্যে ও শাস্তির জন্যে পাঠানো হবে।

১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট তা বলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তি এবং ১৯৪৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ও ১৯৪৭ সালের ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা এই ঘোষণা পুনরায় সমর্থিত হয়।

উক্ত চুক্তি ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষিত হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও ভূতপূর্ব জেনারেল এবং বর্তমানে 'ন্যাটো'র সামরিক নেতা আডলফ হোয়সিঙ্গারকে বিচারের জন্যে সোভিয়েত সরকারের হাতে প্রত্যার্পণের দাবি জানিয়ে গত ১২ই ডিসেম্বর সোভিয়েত গভর্নমেন্ট মার্কিন গভর্ণমেন্টের কাছে এক নোট পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে মস্কোয় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সোভিয়েত মন্ত্রণালয়ের বার্তা বিভাগ সোভিয়েত ও বৈদেশিক সাংবাদিকদের ঐ নোটের ও আডল্ফ হোয়সিঙ্গারের অপরাধ সম্পর্কিত বহু দলিলের অনুলিপি দেন। বিগত ২২শে ডিসেম্বর কলকাতার সোভিয়েত কনসলেটে জেনারেলের

ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইংরেজী অনুবাদসহ উক্ত দলিলগুলির আলোক-চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়। ঐ সব দলিল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে হোয়সিঙ্গারের নেতৃত্বে তার অধীনস্থ বিভাগ 'বারবারোসা' 'সী লায়ন' 'শার্ক' 'অ্যাটিলা' 'মারিটা' 'টানেনবার্গ' নামে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইৎজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা রচনা করে। এবং হোয়সিঙ্গার তার বিভাগের প্রধান কর্তা হিসেবে এক নির্দেশনামা রচনা করে যে সাময়িকভাবে অধিকৃত এই সমস্ত দেশের এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসের বিভীষিকা কায়েম করতে হবে, জনসাধারণের উপরে নির্মম নির্যাতন চালাতে হবে। শুধু ঐ দলিলগুলির ভিতর দিয়েই নয়, হোয়সিঙ্গারের ভূমিকাসংক্রান্ত বহু ঘটনা কাণ্ড প্রত্যক্ষ করবার জন্যে হিটলারের দপ্তরখানা থেকে উদ্ধার করা একটি মূল চলচ্চিত্রও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়।

হোয়সিঙ্গার ছিল হিটলারের কুখ্যাত "ব্লিৎসক্রিগ"-এর এক পরম উৎসাহী সমর্থক। সোভিয়েত-এর উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা রচনায় ও তাকে কার্যে পরিণত করার দিক থেকে সে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক ইউক্রেন ও বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে নিশ্চিহ্ন করে দেবার হিটলারের পরিকল্পনা এই হোয়সিঙ্গারই পেশ করে। নাৎসীবাহিনীর দ্বারা সাময়িকভাবে অধিকৃত সোভিয়েত-এর এলাকাগুলির জনসাধারণের প্রতি বর্বরতম অত্যাচার চালাবার, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ধৃত সদস্যদের বিনাবিচারে গুলি করে হত্যা করার, প্রতিরোধ-আন্দোলনের গেরিলা-যোদ্ধাদের উপর নিষ্ঠুরতম অত্যাচার চালাবার প্রস্তাব ও নির্দেশ তারই। ১৯৪২-৪৪ সালে কের্চ শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের ও বেসামরিক নাগরিকদের বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয় হোয়সিঙ্গারের নির্দেশে। হিটলারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন এই হোয়সিঙ্গারকে হিটলারের পক্ষ থেকে নির্দেশ ও হুকুম দেবার অধিকারও দেয়া হয়েছিল।

নুরেমবুর্গ বিচারের সময়ে হোয়সিঙ্গার ছিল আমেরিকানদের হাতে। যদিও তখন তাকে যুদ্ধাপরাধে দায়ি করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে হোয়সিঙ্গারকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কৃপাপুষ্ট এই যুদ্ধাপরাধী

যুদ্ধাপরাধীকে যখন অতলান্তিক সামরিক চুক্তিসংস্থার সর্বোচ্চ স্থায়ী সামরিক (পরিকল্পনা) কমিটির সভাপতি হিসেবে দেখতে পাই তখন বিশ্বশান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে আমেরিকান শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই একে গ্রহণ করা ছাড়া বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিকামী জনগণের গত্যন্তর নেই।

সত্য গুপ্ত

দাম: পঁচাত্তর নয়া পয়সা